KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৫৪ সুকিয়া স্ট্রীট কলিকাতা-০৬
Collection : KLMLGK	Publisher : নীহার চক্রবর্তী
Title : চতুরঙ্গ	Size : 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৫৪/১ ৫৪/২ ৫৪/৩ ৫৪/৪	Year of Publication : বর্ষা ১৪০০ শরৎ ১৪০০ হেমন্ত ১৪০০ শীত ১৪০০
	Condition : Brittle Good
Editor : রাজশেখর বসু	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫৪ সংখ্যা ১ বর্ষা ১৪০০

৭৮ বছর আগে শৈলবালা ঘোষজায়া তাঁর 'সেখ আন্দু' উপন্যাসে হিন্দুনায়িকার বিপরীতে মুসলমান যুবককে নায়ক করে মুক্তবুদ্ধি এবং সাহসের যে নজির সৃষ্টি করেছিলেন তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব নির্ধারণ করেছেন শিবনারায়ণ রায়। 'লজ্জা' উপন্যাসটির আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি মূল্যায়ন করেছেন তসলিমা নাসরিনের 'আবেগঋদ্ধ বিবেকিতা'-র।

'একদিকে সমাজ জীবন আর অন্যদিকে শিল্পিত জীবনের মধ্যবর্তী সংযোগ' নির্ধারণ প্রয়াসে রবীন্দ্রজীবনী সম্পর্কে আমাদের বোধে নতুনতর মাত্রা যুক্ত করেছেন শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'শিল্প থেকে জীবন' সন্দর্ভে।

হিন্দুত্ববাদীদের 'ভারতীয়ত্ব' প্রচারের জবাবে অধ্যাপক দেবদাস জোয়ারদারের নিবন্ধ 'হিন্দুত্ব, ভারতীয়ত্ব এবং রবীন্দ্রনাথ'।

ধর্মব্যবসায়ী কিংবা রাজনীতিব্যবসায়ী গুরুদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের অজস্র লেখায় পুঞ্জীভূত রয়েছে যে ধিক্কার তারই পরিচয় ড. পিনাকী ভাদুড়ীর 'আমার গুরুর আসন কাছে' শীর্ষক প্রবন্ধে।

গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে ড. বিজিতকুমার দত্ত-র আলোচনা।

বাংলা নাটকের চল্লিশ এবং পঞ্চাশ দশক সম্পর্কে ড. সৌমেন সেনের অভিমত।

বিশ্বের অন্যতম পুরোধা মৃৎবিজ্ঞানী সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক রচনা 'মাটি'। এবার মাটির অপমৃত্যুর কথা।

ফ্রন্টিয়ার সম্পাদক তিমির বসু তাঁর 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ আবার ফিরে আসছে?' প্রতিবেদনে দেখিয়েছেন নবরূপে কোল্ড ওয়ার প্রায় অনিবার্য।

বিক্রয় নিষিদ্ধ

Hindustan Wires Limited

Registered Office

3A, Shakespeare Sarani, Calcutta-700 016

Phone : 242-6745 (3 lines)
242-6746
242-6747

Telegram : WIREFIELD

Factory

B. T. Road, Sukchar, 24 Parganas

Phone : 58-1947, 58-1934

Manufacturers of

Stainless Steel Wires, Alloy Steel Wires, High Tensile Galvanised Steel Wires for ACSR to IS : 398 and High Tensile Wire for Prestressed Concrete to IS : 1785

And

Many other specialised High Carbon & Mild Steel Wires such as High Tensile, Spring Steel, Tyre Bead, Cable Armouring, Cycle Spoke, Umbrella Card & Gill Pin Wires and G. I., Annealed, Ball Bearing, Electrode Core Wires etc.

In Technical Collaboration with

MESSRS KOBE STEEL WORKS LIMITED &
MESSRS SINKO WIRE COMPANY LIMITED
JAPAN

বর্ষ ৫৪ সংখ্যা ১

বর্ষা ১৪০০

শিল্প থেকে জীবন শঙ্খ ঘোষ ১
হিন্দুত্ব, ভারতীয়ত্ব এবং রবীন্দ্রনাথ দেবদাস জোয়ারদার ৮
আমার গুরুর আসন কাছে পিনাকী ভাদুড়ী ১৬
শৈলবালা ঘোষজায়া ও 'শেখ আন্দু' শিবনারায়ণ রায় ৩২

কবিতা

ডেভিড বলল অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ২৪
শুভাশিস, তোমাকে খুঁজছি আমি মহাদেব সাহা ২৫
স্ফিংস বিরাম মুখোপাধ্যায় ২৬
আমি বকুল নই রাজলক্ষ্মী দেবী ২৭
স্যুইসাইড হিল-এর রাত্রি এবং অনুশীলা বেণু দত্ত রায় ২৮
ত্বক ও ধড় পৃথক করা সম্পর্কে কিছু ভাবনা আনন্দ ঘোষ হাজরা ২৯
ফুলের ভিতর ঢাকল আঁখি জল অসীম রেজ ৩০
ইতিহাস সুজিৎ ঘোষ ৩১

গল্প

জ্যোৎস্নায় পার্লামেণ্ট সাধন চট্টোপাধ্যায় ৩২
এখন রোদ্দুর শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায় ৪৮

ধারাবাহিক রচনা

মাটি সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় ৫৫

গ্রন্থ সমালোচনা

শিবনারায়ণ রায় ৬৩ বিজিতকুমার দত্ত ৬৭ সৌমেন সেন ৬৯
কান্তি গুপ্ত ৭৩ নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ৭৫ কমলেশ সেন ৭৯
শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় ৮১ আলাউদ্দীন আহমদ ৮৬
নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ৮৯ কান্তি গুপ্ত ৯৩ সৌমিত্র লাহিড়ী ৯৪

আন্তর্জাতিক

ঠাণ্ডা যুদ্ধ আবার ফিরে আসছে ? তিমির বসু ৯৭

মতামত

ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র বনাম সংঘ পরিবার সনাতন মিত্র ১০০

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক পি এম বাক্‌চি অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৬
থেকে মুদ্রিত এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩
থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত

অফিস ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ কলি-১৩ দূরভাষ ২৭ ৬৩২৭

শিল্প পরিকল্পনা রণেনআয়ন দত্ত

নির্বাহী সম্পাদক আবদুর রউফ

শিল্প থেকে জীবন

শঙ্খ ঘোষ

'শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ' বইটির মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের গান-শোনার কিছু খবর জানিয়েছিলেন শ্রীমতী রাণী চন্দ। একটার পর একটা গান শুনতে শুনতে অবনীন্দ্রনাথ না কি বলে উঠতেন একসময়ে : 'তোমরা সব রবিকার জীবনী খুঁজছ, রবিকার গানই তো তাঁর জীবনী।...গানের মধ্যে রবিকার সারা জীবন ধরা আছে। সুর ও কথার অন্তরে তাঁর জীবন্ত ছবি ওইখানেই পাবে।' আবার অনেকদিন পর, প্রায় একইরকম ভাবে সেই গানের কথা বলেছেন শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী, 'আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ'-এর মধ্যে এই সেদিন তিনি লিখেছেন যে রবীন্দ্রনাথের 'গানগুলিকে তারিখ অনুযায়ী সাজাইলে এগুলি হইতেই তাঁহার মানসিক জীবনী লেখা যায়।'

প্রায় একইরকম কথা। কিন্তু 'জীবনী' বলতে ঠিক একইরকম ভাবনা কি ছিল তাঁদের মনে? 'আরো আঘাত সইবে আমার' কিংবা 'আরো আরো প্রভু আরো আরো' লাইনগুলি শুনতে শুনতে, 'মোর দুঃখ যে রাঙা শতদল, আজি ঘিরিল তোমার পদতল' শুনতে শুনতে অবনীন্দ্রনাথ বলতেন 'না, না, ওটা না। ওটা বাদ দাও, অন্য গান পড়ো। রবিকা পারতেন বলতে, তাঁর সেই বুক ছিল। আমি পারি না। আমি বলি, অনেক তো হল, এবার আমায় তুলে ধরো, তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো।' এইরকমের প্রতিক্রিয়ায় 'জীবনী'র কথা যেভাবে ভাবতে পারতেন অবনীন্দ্রনাথ ('তাঁর সেই বুক ছিল'), তার থেকে খানিকটা হয়তো আলাদাই হবে নীরদচন্দ্রের ভাবনা। রবীন্দ্রনাথের কোনো-একটা গান বিশ্লেষণ করেই নীরদচন্দ্র অনায়াসে বুঝে নিতে পারেন তাঁর ব্যক্তিজীবনের ঘটনাবৃত্ত, বুঝতে পারেন যে কোনো-এক সময়ে 'শাতোব্রিঁয়' যেমন ফ্রান্স হইতে বাংলাদেশ পর্যন্ত আসিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তেমনই বাংলাদেশ হইতে ইংলণ্ডে গিয়া পৌঁছিলেন'।

কোন্ গানে আছে রবীন্দ্রনাথের ইংলণ্ডে পৌঁছবার এই মানস-ইতিহাস? নীরদচন্দ্রের বিবেচনায় সে হলো 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী'। গানটি রচনার পিছনে যে-অভিজ্ঞতার কথা 'জীবনস্মৃতি'র মধ্যে লেখা আছে সেটা ভোলেননি নীরদচন্দ্র, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বলা সেই 'রহস্যসিন্ধু'র অনুভবকে বিশেষ নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়নি তাঁর, কেননা গানের ভাষা 'একমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা হইতে আসিতে পারে'। আর সেইজন্যেই রবীন্দ্রনাথের এই 'বিদেশিনী'কে যদি কেউ 'নীলনয়না স্বর্ণকুন্তলা কন্যা' মনে না করে অন্যকিছু ভাবে, তবে বুঝতে হবে 'সে জীবনে কখনও নারীমূর্তি চোখে দেখে নাই, নিজের দেহে নারীর দেহের স্পর্শ পায় নাই।' বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশ্ববিমোহিনী কোনো অপরূপ মূর্তি নয়, বিশেষ কোনো নারীমূর্তির স্মৃতিতেই যে ওই গানটি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তা বুঝতে পারেন নীরদচন্দ্র। এমন-কী তিনি প্রায় নির্দিষ্ট করেও দিতে পারেন এই স্মৃতির স্থানকালপাত্র। ১৮৯০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বরে 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে তাঁর বিশ্বাস 'ইংরাজ মেয়েদের মতো সুন্দরী পৃথিবীতে নেই। নবনীর মতো সুকোমল শুভ্র রঙের উপর একখানি পাতলা টুকটুকে ঠোঁট, সুগঠিত নাসিকা, এবং দীর্ঘপল্লববিশিষ্ট নির্মল নীল নেত্র—

দেখে পথকষ্ট দূর হয়ে যায়।' এরই কথা ভেবে না কি লেখা হয়েছিল 'আমি আকাশে পাতিয়া কান / শুনেছি শুনেছি তোমারি গান'। ১৮৯৫ সালে লেখা গানটির এইসব ভাষা থেকে নীরদচন্দ্র বুঝে নিতে পারেন ১৮৯০ সালের ওই জীবন-ঘটনাটুকু।

বিশেষ এই গানটির ব্যাখ্যা নিয়ে অবশ্য আমাদের সমস্যা নয়। সমস্যা হলো, গানটির সঙ্গে যেভাবে লেখকজীবনের কোনো ঘটনাকে যুক্ত করে দেখা অনিবার্য বলে বোধ হলো এখানে, তার যথাযোগ্যতা কতটা। গানের ভাষা কখনো জ্ঞানেন্দ্রিয় নিরপেক্ষ হতে পারে না বলে নীরদচন্দ্রের মনে হয়েছে, যদিও তিনি মানেন যে 'গানের ভাব শেষ পর্যন্ত লোকোত্তর' হতেও পারে। মনের ইতিহাস আছে তবে কোথায়? গানের ভাষায় না গানের ভাবে? ভাবটাকে যদি একেবারে অবজ্ঞা না করি, তাহলে এ-গানের উপলব্ধি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বিবরণটাকে এতদূর এড়িয়ে যাব কেমন করে? অন্য এক প্রসঙ্গে নীরদচন্দ্র নিজেই বলেছেন যে তিনি মোটেই বিশ্বাস করেন না 'কোনো লেখকের সমস্ত রচনাই তাহার জীবনের ঘটনা বা অভিজ্ঞতার সহিত যুক্ত হইয়া থাকে'। তা যদি হয়, তাহলে যে-কোনো রচনা থেকেই সরলরেখার টানে কোনো জীবনঘটনার আবিষ্কার তো নিরর্থক হয়ে পড়ে। কবির তো নয়ই, কোনো মানুষেরই জীবন শুধু তার ঘটনার জীবন নয়, ব্যক্ত-অব্যক্ত অনেক অনুভবেরও জীবন জড়ানো আছে তার সঙ্গে। তাই আমাদের বুঝতেই হয় যে শিল্পস্রষ্টার এমন অনেক মুহূর্ত আমরা পেতে পারি, যার উৎসে আছে অনেক জটিল ঢেউ, লোক-লোকোত্তরের নানা মিশ্র অভিজ্ঞতা, একাধিক মানসিক স্তরের বুনন। তখন, সেইরকমের কোনো রচনা থেকে রচনাকালীন প্রত্যক্ষ জীবনটাকে ছুঁতে পারা হয়তো একটু শক্তই হয়ে ওঠে।

২

শিল্প থেকে শিল্পীর ব্যক্তিজীবনে পৌঁছবার একটা সরল পথও যে কখনো কখনো পাওয়া যায়, সেটাও অবশ্য মিথ্যে নয়। 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে' 'তোর আপন-জনে ছাড়বে তোরে' 'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক' বা 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি' গানগুলি যে-আবেগে লেখা হচ্ছিল ১৯০৫ সালে, তার সঙ্গে সমকালীন রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের যোগ বুঝতে আমাদের অসুবিধে হয় না। হয় না যে, সে কেবল এ-গানগুলির ভাষার জন্যে নয়। হয় না এইজন্য যে ভিন্ন তথ্যসূত্রে আমাদের জানবার সুযোগ আছে কীভাবে কোন্ দরকারে একের পর এক ওই গানগুলি লেখা হচ্ছিল। তেমনি একটা সূত্র আমরা তৈরি করে নিতে পারি একেবারে বিপরীত ধরণের অন্যকিছু লেখা থেকেও। 'পুষ্পাঞ্জলি'র পাতুলিপিতে পাওয়া 'কেন এলি রে, ভালোবাসিলি, ভালো-বাসা পেলি নে' 'যে ফুল ঝরে সেই তো ঝরে' বা 'ওকে কেন কাঁদালি! ও যে কেঁদে চলে যায়'-এর মতো রচনাগুলি থেকে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুশ্মৃতিকে সহজেই ছুঁতে পারা যায়। দেশোদ্দীপনা বা মৃত্যুবেদনার কিছু কিছু মুহূর্ত এইভাবে রচনার উপরে তার প্রত্যক্ষ চিহ্ন রেখে যেতে পারে।

কিন্তু তার থেকে আমরা ধরে নিতে পারি না যে উদ্দীপনার গান বা কবিতার পিছনে সব সময়েই এ-রকম কোনো উদ্দীপক মুহূর্ত কাজ করে যায়, ধরে নিতে পারি না যে বিচ্ছেদ বেদনার মুহূর্তগুলি সবসময়েই সঙ্গে নিয়ে আসে কোন ব্যথাতুর কবিতা। সেটা ধরে নিলে আমরা আর বুঝতে পারি না কীভাবে শমীর মৃত্যুর পর সেই মাসেই একজন লিখতে পারেন যে 'নিবিড় সুধায়' ভরে উঠেছে সমস্ত জীবন, লিখতে পারেন

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোকে ভূলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।
দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মূরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ,
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।

রচনাকালের বিষয়ে কিছু জানা না থাকলে আমরা হয়তো ভাবতে পারতাম যে সুপ্রসন্ন কোনো উদ্‌ভাসের সময়ে সম্ভব হয়েছিল ওই লেখা। বেদনার অভিঘাত থেকেও যে এ-রকম আনন্দবোধে পৌঁছতে পারে কোনো কবিমন, সে-মন যে নৈরাশ্যের মুহূর্তকেও অনুবাদ করে নিতে পারে উদ্দীপনায়, তার একটা স্পষ্ট ছবি তো গানের ভাষাতেই একবার লিখে রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, লিখেছিলেন 'আনন্দগান উঠুক তবে বাজি / এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে। / অশ্রুজলের ঢেউয়ের 'পরে আজি / পারের তরী থাকুক ভাসিতে।'

'বলাকা'র এই লেখাটির সূত্রে আরেকটি কবিতার কথাও এখানে ভাবতে পারি আমরা। 'দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন': এই অতিখ্যাত কবিতা যেদিন লেখা হচ্ছিল, কী ছিল সেদিনকার জীবনস্থাপনের অভিজ্ঞতা? কাশ্মীর থেকে ফিরে এসেছেন কদিন আগে, জায়গাটি না কি কিছুমাত্র

ভালো লাগেনি তাঁর, উনিশে কার্তিক মীরা দেবীকে লিখছেন 'আমি যেখানে যাই কেবলি গোলমাল—লোক-জনের উৎপাত থেকে একদণ্ড নিষ্কৃতি নেই। শ্রীনগরে নৌকোয় ছিলুম—কিন্তু একটুও শান্তি বা আনন্দ পাইনি বলে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলুম।' মনে রাখা ভালো যে চিঠিটি লিখবার অল্প কয়েকদিন আগে (৭ কার্তিক) সেই কাশ্মীরে বসেই তিনি লিখেছেন 'আমি গানের সাথে গান,/ আমি প্রাণের সাথে প্রাণ, / আমি অন্ধকারের হৃদয়-ফাটা / আলোক জলজল' ('বলাকা' ৩৫), লিখছেন 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিল ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা'। সেই-কাশ্মীরে বিশ্রাম-না-হওয়া নিয়ে একুশ তারিখেও অনুযোগ করেন প্রমথ চৌধুরীর কাছে, আর তেইশ তারিখে শিলাইদহ থেকে সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে লেখেন যে অনেক ক্লান্তির পর তিনি বিশ্রাম নিতে এসেছেন পদ্মাতীরে। এই হচ্ছে পিছনের পট, যার সামনে দেখা গেল ওই তেইশ তারিখেই লেখা উদ্‌বোধক কবিতা 'দূর হতে কি শুনিস'! 'যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল, / উঠেছে আদেশ,/বন্দরে বন্ধনকাল হল শেষ' এই ধ্বনি উঠল সেখানে। 'কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার,/শিরে লয়ে উন্মত্ত দুর্দিন,/চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন' কেবলই যে ছুটে চলতে হবে সমস্ত বাধা লঙ্ঘন করে, 'ভাঙিয়া পড়ুক ঝড়, জাগুক তুফান,/ নিঃশেষ হইয়া যাক নিখিলের যত বজ্রবাণ', তবু যে বিজয়-ধ্বজা তুলতে হবে—এ-আহ্বান আসে যে-মন থেকে, সে-মনের তবে খুঁজতে হয় এক ভিন্ন ইতিহাস, জীবনের সরলরেখায় তাকে না-ও মিলতে পারে সবসময়ে। জীবন-ঘটনায় যেদিন শাস্ত্রীমশায় জমিটার জন্য তাগিদ করছেন এবং উদ্‌বেগ জানাতে হয় রথীন্দ্রনাথের কাছে, সেইদিনই লেখা হয়ে যেতে পারে 'তোমায় নতুন করে পাব বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণ', বলা যেতে পারে 'তুমি আমার নও আড়ালের, তুমি আমার চিরকালের'। ত্রিপুরার হিতসাধনে মহিম ঠাকুরকে উদ্‌বুদ্ধ করছেন যেদিন, যেদিন বলছেন ত্রিপুরার দায়িত্ব নিয়ে নিজের মনকে তিনি ইচ্ছে করলেও উদাসীন করতে পারেন না, সেইদিনই লেখা হতে পারে 'খেয়া'র "নিরুদ্যম" নামের কবিতাটি। 'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া' কবিতাটি লিখছেন যখন, যখন 'তৃণে পুলকিত' মাটির আহ্বানে বিভোরতার কথায় ভরে উঠছে কবিতা, লেখা হতে পারছে 'আছে আছে প্রেম ধুলায় ধুলায়/আনন্দ আছে নিখিলে', কী করে বোঝা যাবে সেটা ছিল তাঁর তীব্র এক অর্থসংকটের কাল, কবিতাটি লিখবার পরদিনই দীর্ঘ চিঠিতে প্রিয়নাথ সেনকে জানাতে হবে তাঁর বিপর্যয়ের কথা, লিখতে হবে: 'আমার টাকার দরকার বারো হাজার। কিন্তু শুনচি মহাজন ৬০০০ হাজারেই ক্ষান্ত থাকবে—সেটা জনশ্রুতি মাত্র। যদি ১২০০০ বা ১৩,০০০ পার যোগাড় কোরো, নইলে ৬০০০ই সই।'

কেবল যে বাইরের ঘটনার সঙ্গে ভিতরের মনের এই দূরবর্তিতা, সেইটেই একমাত্র কথা নয়। ভিতরের সেই মনটারও স্ফুরণ হতে পারে একই সঙ্গে কত আপাতবিরোধী পথে! তা যদি না হতো, তা হলে কীভাবে একই দিনে লেখা হতে পারত 'এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো' আর 'ওরে ভিখারি সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে', কিংবা তার পরদিনই 'আমরা চলি সমুখ পানে, কে আমাদের বাঁধবে' আর 'সন্ধ্যা হল গো ও মা বুকে ধরো'র মতো রচনাগুলি? প্রায় অবিশ্বাস্য না কি এই ঘটনা যে, কবিতায় যেদিন লেখা চলছে 'মন ছড়ান আকাশ ব্যেপে / আলোর নেশায় গেছি খেপে / ওরা আছে দুয়ার ঝেঁপে, চক্ষু ওদের ধাঁধবে', সেদিনকারই গানে আছে এই কথা: 'ফিরিয়ে নে মা, ফিরিয়ে নে গো—সব যে কোথায় হারিয়েছে গো / ছড়ানো এই জীবন, তোমার আঁধারমাঝে হোক-না জড়ো'? একই সঙ্গে 'আলোর নেশায় খেপে ওঠা' আর 'আঁধার-মাঝে জড়ো' হবার এই বিপরীত দুই ব্যাকুলতার অবিশ্বাস্য-তার মধ্যেই আছে কোনো কবি মনের ঠিক-ঠিক ইতিহাস।

৩

সে-ইতিহাসটার কথা আমরা খেয়াল রাখি না বলে কোনো কবির মানসিক জীবন নিয়ে অনেক সময়ে কিছু ভুল ধারণা তৈরি হয়ে যায়। স্বদেশী আন্দোলনের একটা তুঙ্গ মুহূর্ত ছিল ১৯০৫ সাল, আর সে আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক ভূমিকা প্রায় কিংবদন্তির মতো হয়ে আছে আজও। এর ঠিক পরবর্তী পাঁচ বছরে যে-দুটি কবিতার বই ছাপা হলো তাঁর, 'খেয়া' (১৯০৬) আর 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০), তার অন্তর্গত কবিতাগুলির নজিরে আমাদের ধারণা হয় যেন প্রত্যক্ষ জীবনের দায় থেকে হঠাৎ অনেক দূরে সরে গেলেন রবীন্দ্রনাথ, সরে গেলেন রাজনৈতিক সংঘর্ষের সমস্তরকম তাপ-উত্তাপ থেকে দূরে। 'খেয়া'র 'বিদায় দেহো, ক্ষমো আমায় ভাই। / কাজের পথে আমি তো আর নাই' (১৪ চৈত্র ১৩১২) থেকে শুরু করে 'গীতাঞ্জলি'র শেষ লেখায় 'পাথেয় যার ফুরায়ে আসে পথের

মাঝখানে, / ক্ষতির রেখা উঠেছে যার ফুটে' (২৯ শ্রাবণ ১৩১৭) পর্যন্ত ক্ষান্তিসূচক উচ্চারণগুলিতে সেই ধারণার বেশ সহজ একটা সমর্থন মিলে যায়। দুটো বইতেই নিভৃত সুরের বিস্তার আছে, আছে একটা সমর্পণের ভঙ্গি বা প্রতীক্ষাকাতরতা। আর যখন এর পাশাপাশি মনে পড়ে যে এই পর্বটির মধ্যেই আক্ষরিক অর্থে প্রতিদিন ভোরবেলায় কিছু অধ্যাত্মকথা তিনি শোনাচ্ছিলেন তাঁর শান্তিনিকেতনের সহকর্মীদের কাছে, পর্বে পর্বে ছাপা হচ্ছিল 'শান্তিনিকেতন' বইটি, কিংবা ছাপা হলো 'ধর্ম' নামেরও আত্মিকতায় ভরা আরেকখানা বই, 'গীতাঞ্জলি'র বছরেই যখন পেয়ে যাই আমরা অধ্যাত্মবিভাময় 'রাজা' নাটকটিকেও, তখন আমরা ধরে নিই যে তাঁর মনের ইতিহাস যেন পুরোই জানা হয়ে গেল আমাদের, গানে কবিতায় নাটকে প্রবন্ধে মিলিয়ে নিয়ে আমরা যেন পেয়ে গেলাম তাঁর সংসার থেকে দূরে পালানোর একটা ছায়াচ্ছন্ন কালখণ্ড।

যেটাকে বলা হয় রবীন্দ্রনাথের এই অধ্যাত্মভাবনা, সেটা ঠিক তাঁর পালিয়ে যাবারই পরিচয় কি না, না কি অন্য এক ধরণের লড়াইয়েরই চিহ্ন আছে সেখানে, সে-প্রশ্ন আমরা তুলছি না এখনই। কিন্তু যেটা লক্ষ করতে হবে তা এই যে, পর্ব জুড়ে এই 'আধ্যাত্মিকতা'কে একমাত্রিক ভাবে দেখবার মধ্যেই একটা আংশিকতা আছে, আজও পর্যন্ত যে-আংশিকতা আমাদের স্থির রবীন্দ্রবিচারের পথে প্রধান এক অন্তরায়। সেই আংশিকতার বাইরে গেলে দেখতে পাব যে 'ধর্ম' বইটির প্রবন্ধগুলির পাশে পাশেই কিন্তু তৈরি হতে পেরেছিল সামাজিক-রাজনৈতিক অনেক লেখা, "প্রাচীন ভারতের এক:"র পাশে "স্বদেশী সমাজ" যেমন, "উৎসব"এর পাশে "রাজভক্তি" যেমন। 'ধর্ম' ছাপা হয়েছিল ১৯০৯ সালে, কিন্তু স্মরণীয় যে এর অন্তর্গত চোদ্দোটি প্রবন্ধের ন-টিই লেখা হয়েছিল ১৯০২ থেকে ১৯০৬ সালের মধ্যে। সেই রচনাকালে, প্রায় একই সময়ে রবীন্দ্রনাথ বলতে পারছিলেন এই দুই ভিন্ন কথা :

১. আমাদের এই সংগীতধ্বনি কি আমাদিগকে জগতের সেই গভীরতম অন্তঃপুরে প্রবাহিত করিয়া লইয়া যাইতেছে—যেখানে বিশ্বভুবনের সমস্ত সুর তাহার আপাতপ্রতীয়মান সমস্ত বিরোধ-বিশৃঙ্খলতা মিলাইয়া দিয়া প্রতি মুহূর্তেই পরিপূর্ণ রাগিণীরূপে উন্মেষিত হইয়া উঠিতেছে ? ("উৎসব")

২. যে ক্ষুধিত সত্য ত্রিশ কোটি প্রজার মর্মের মধ্যে হাহাকার করিতেছে তাহাকে বলের দ্বারা উচ্ছেদ করিতে পারে এমন শাসনের উপায় কোনো মানবের হাতে নাই, কোনো দানবের হাতে নাই। ("রাজভক্তি")

ঠিকই, 'খেয়া'র রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'বিদায় দেহো, ক্ষমো আমায় ভাই'। কিন্তু ও-কথা লিখবার দশদিন পরেই আগরতলা থেকে এক চিঠিতে লিখতে হচ্ছে 'ঘুরিয়া মরিতেছি'। কখনো-বা ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যা নিয়ে তাঁকে তখন ঘুরতে হচ্ছে আগরতলা, কখনো কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মিলনী উপলক্ষে বরিশালে। কবিতার দিক থেকে যে-সময়টাকে আমরা মনে করছি আধ্যাত্মিক নিবৃত্তি, ঠিক সেই সময়টা জুড়ে বারবার তাঁকে ভাবতে হচ্ছে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কসমস্যা ("ব্যাধি ও প্রতিকার" "সমস্যা" "সদুপায়" প্রবন্ধগুলিতে যেমন), কথা বলতে হচ্ছে ইংরেজ-ভারতবাসীর শাসকশাসিতের সম্পর্ক নিয়ে ("দেশনায়ক" "যজ্ঞভঙ্গ" "পথ ও পাথেয়" "দেশহিত" প্রবন্ধগুলির মধ্যে যেমন)। ১৯০৮ সালে পাবনার প্রাদেশিক সম্মিলনীতে সভাপতির ভাষণ হিসেবে তাঁকে বলতে হচ্ছে আমাদের গ্রামজীবনের দুর্দৈবের কথা, তার অভ্যুদয়ের স্বপ্ন। কয়েকটি পল্লী নিয়ে কীভাবে গড়ে তোলা যায় এক-একটি মণ্ডলী, কীভাবে সেই মণ্ডলীর নিজস্ব মণ্ডপে গ্রামের মামলাবিবাদ মিটিয়ে দিতে পারে ভার-প্রাপ্ত প্রধানেরা, তার একটা পরিকল্পনা তিনি সাজিয়ে তুলছিলেন সকলের সামনে। আর, প্রায় তখনই লিখছেন 'চরণধ্বনি শুনি তব' 'বীণা বাজাও হে' বা 'বিপুল তরঙ্গ'-র মতো গানগুলি ; তখনই লিখছেন 'ধর্ম' বইয়ের "দুঃখ" প্রবন্ধ, যে-প্রবন্ধে বার বার উচ্চারিত হবে উপনিষদের ভাবনা, বলা হবে 'দুঃখের তত্ত্ব আর সৃষ্টির তত্ত্ব যে একেবারে একসঙ্গে বাঁধা'।

৪

তার মানে তাহলে এই : রবীন্দ্রনাথের নিবৃত্তির কাল বলে যে-সময়টা ব্যাপকভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে তাঁর কবিতাগানের—কিছু-বা তাঁর নাটকপ্রবন্ধেরও—নজিরে, যাকে অনেক সময়ে মনে করা হয়েছে নববধূসুলভ নম্রতার কাল, জীবনের ঠিক সেই সময়টাতেই তিনি লিপ্ত ছিলেন সমাজ-সংসারের কঠোর অনেক দায়িত্বের বোধে। সেই বোধের, সেই ভাবনার অনেক চিহ্ন ছড়ানো আছে তাঁর সমকালীন প্রবন্ধগুলিতে, অথবা তাঁর 'গোরা' উপন্যাসের দেশচিন্তায়। ১৯০৭ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত সময় জুড়ে কিস্তিতে কিস্তিতে যে মহাকাব্যিক উপন্যাসটি তিনি লিখে চলেছিলেন,

তার প্রধানতম চরিত্রই ছিল তাঁর দেশ ভারতবর্ষ। সে-দেশ নিছক ভাবের বা স্বপ্নের দেশ নয়, 'এই নিভৃত প্রকাণ্ড গ্রাম্য ভারতবর্ষ যে কত বিচ্ছিন্ন, কত সংকীর্ণ, কত দুর্বল', 'অজ্ঞতা জড়তা ও দুঃখের বোঝা যে কী ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড এবং এই ভার যে আমাদের শিক্ষিত-অশিক্ষিত ধনী দরিদ্র সকলের কাঁধের উপর' কীভাবে চেপে আছে, তার উপলব্ধিতে সঙ্গীব এক দেশকর্মীকে এর পাতায় পাতায় আমরা দেখতে পাই, সে-কর্মী তো রবীন্দ্রনাথ নিজেই। "স্বদেশী সমাজ" "ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ" "ব্যাধি ও প্রতিকার"-এর মতো নানা রচনায় যে বিশ্লেষণ আর আহ্বান আছে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের, তারই এক ব্যক্তিচরিত্রায়ণ হয়ে ওঠে 'গোরা'র মতো উপন্যাসে, ওই তাঁর অধ্যাত্মপর্বেই। আর তা যে হতে পারে এত তীব্রতায়, তার কারণ, এ-উপন্যাসের কথাগুলি কেবল তাঁর দেশভাবনারই প্রকাশ হয়ে থাকে না, অভ্যস্ত আর অভিজ্ঞ দেশকর্মীরও উচ্চারণ হয়ে থাকে, তাঁর সমগ্র সত্তারই প্রকাশ হয়ে ওঠে সেটা।

দেশাত্মবোধ বলতে রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন দেশের আত্ম-পরিচয়ের উদ্‌ঘাটন, তার আত্মপ্রতিষ্ঠার আয়োজন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আগে আর পরে দীর্ঘকাল জুড়ে অব্যাহত ভাবে সে-কাজেরই কিছু পদ্ধতি তৈরি করছিলেন তিনি, তারই জন্য তিনি আহ্বান সাজিয়ে যাচ্ছিলেন দেশবাসীর উদ্দেশে, কিন্তু শুধু সেই আহ্বানেই ক্ষান্ত না থেকে নিজের ভাবনার রূপায়ণও করছিলেন তিনি নিজেই, যতটুকু তাঁর সাধ্য। এ-দেশের আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য দুটো ভিত্তিকে তাঁর মনে হয়েছিল সবচেয়ে জরুরি, অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য, কৃষি আর শিক্ষা। আমাদের দেশের পক্ষে যথার্থ শিক্ষার কী পথ হতে পারে, তার তাত্ত্বিক ভাবনা অনেক তিনি বলেছেন গত শতকের শেষ থেকেই, পরে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে নিজেই তৈরি করে নিয়েছেন সমান্তরাল এক শিক্ষাবিধি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকে জাতীয় শিক্ষার আরেক ব্যাপক আয়োজন ভাবা হলো যখন, তারও এক প্রধান শক্তি হয়ে এলেন তিনি। অন্যদিকে, নিজের জমিদারির বৃত্তের মধ্যে কৃষিকাজ আর কৃষকজীবনের উন্নয়নের নানা প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় নেমে এলেন তিনি নিজেই।

ক্ষান্তিসূচক 'খেয়া' কবিতার বইটি বেরিয়েছিল ১৯০৬ সালে, লেখা হয়েছিল 'বিদায় দেহো, ক্ষমো আমায় ভাই'। আর সেই ১৯০৬ সালেই কৃষিবিদ্যা শিখবার জন্য তাঁর স্নেহ-ভাজন কয়েকজনকে বিদেশে পাঠাবার কথা ভাবছেন তিনি, যাচ্ছেনও রথীন্দ্রনাথ, সন্তোষচন্দ্র বা অল্প পরে নগেন্দ্রনাথ। এঁরা যখন বিদেশে, স্থানীয় যুবকদের নিয়ে দেশের মধ্যে তখন কাজ করছেন তিনি। 'আমি গ্রামে গ্রামে যথার্থ স্বরাজ-স্থাপন করতে চাই—সমস্ত দেশে যা হওয়া উচিত ঠিক তারই ছোট প্রতিকৃতি—খুব শক্ত কাজ অথচ না হ'লে নয়' এই কথা লিখছেন অজিতকুমার চক্রবর্তীকে (২৯ পৌষ ১৩১৪)। ভূপেশচন্দ্র রায় বা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতো মানুষদের কাজে লাগাচ্ছেন নানারকম সংগঠনের পরিকল্পনায়, 'কয়েক-জন পূর্ববঙ্গের ছেলে আমার কাছে ধরা দিয়েছে' বলে খুশি জানাচ্ছেন (এপ্রিল ১৯০৮) অবলা বসুকে, এদের দিয়ে 'রাস্তাঘাট বাঁধানো, পুকুর খোঁড়ানো, ড্রেন কাটানো, জঙ্গল সাফ করানো'র মতো নানা কাজের উদ্‌যোগ হচ্ছে, আশা করছেন যে অবলা বসুরা যখন দেশে ফিরে আসবেন 'ততদিনে আমাদের শিলাইদহের গ্রামগুলি অনেকটা গঠিত হয়ে উঠতে পারবে'। রাশিয়ার নবযুগ দেখবার প্রায় তেইশ বছর আগে (১২ কার্তিক ১৩১৪) নগেন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে লিখছেন : 'তোমরা দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজার অন্নগ্রাসের অংশ নিয়ে বিদেশে কৃষি শিখতে গেছ—ফিরে এসে এই হতভাগ্য-দের অন্নগ্রাস কিছু পরিমাণেও যদি বাড়িয়ে দিতে পার তা হলে এই ক্ষতি পূরণ হয়ে মনে সান্ত্বনা পাব। মনে রেখো জমিদারের টাকা চাষির টাকা এবং এই চাষিরাই তোমাদের শিক্ষার ব্যয়ভার নিজেরা আধপেটা খেয়ে এবং না খেয়ে বহন করছে। এদের এই ঋণ সম্পূর্ণ শোধ করবার দায় তোমাদের উপর রইল—নিজেদের সাংসারিক উন্নতির চেয়েও এইটেই তোমাদের প্রথম কর্তব্য হবে।'

আর, দেশে যখন ফিরে এলেন এঁরা, রথীন্দ্রনাথ লিখছেন : 'আসবামাত্রই তিনি আমাদের শিলাইদহে নিয়ে গেলেন কাজে নিযুক্ত করার জন্য'। বোটের ডেকের উপর বসে রবীন্দ্রনাথ তখন বলতেন তাঁকে 'বাংলার গ্রামে গ্রামে লোকদের সামাজিক, নৈতিক ও আর্থিক কি শোচনীয় অবস্থা তিনি দেখেছেন, তাদের জীবনযাপনের কতরকমের সমস্যা লক্ষ্য করেছেন, এইসব সমস্যার প্রতিকারের তিনি কি চেষ্টা করেছেন ও ভবিষ্যতে আরও কি করতে ইচ্ছা করেন' (রথীন্দ্র-নাথ)। কাজে লেগে গেলেন রথীন্দ্রনাথেরা, আর দূর থেকে নির্দেশ পাঠাতে ভুলতেন না রবীন্দ্রনাথ। কখনো হয়তো লিখছেন : 'বোলপুরে একটা ধানভানা কল আছে—সেই-রকম একটা কল এখানে [পতিসরে] আনাতে পারলে বিশেষ কাজে লাগবে।...এখানকার চাষাদের কোন্ in-

dustry শেখানো যেতে পারে সেইকথা ভাবছিলুম।…আমি জানতে চাই Pottery জিনিষটাকে Cottage Industry রূপে গণ্য করা চলে কিনা। একবার খবর নিয়ে দেখিস—অর্থাৎ ছোটখাটো furnace আনিয়ে এক গ্রামের লোক মিলে এ কাজ চালানো সম্ভবপর কিনা।…আর একটা জিনিষ আছে ছাতা তৈরি করতে শেখানো।' কখনো নগেন্দ্রনাথকে জানাচ্ছেন (৩০ ফাল্গুন ১৩১৬): '…কুষ্টিয়ায় আমাদের প্রজাদের নিয়ে Co-operative Dairy খোলার ভালো ক্ষেত্র আছে—এই সকল কাজ সম্বন্ধেই তোমার আসার প্রতীক্ষা করছি', কখনো (১৭ শ্রাবণ ১৩১৫) ভূপেশচন্দ্র রায়কে: 'প্রজাদের বাস্তবাড়ি, ক্ষেতের আইল প্রভৃতি স্থানে আনারস, কলা, খেজুর প্রভৃতি ফলের গাছ লাগাইবার জন্য উৎসাহিত করিও। আনারসের পাতা হইতে খুব মজবুত সূতা বাহির হয়।'

এইসবই হচ্ছে সেই সময়, যখন তিনি লিখছেন 'গীতাঞ্জলি'র গান, 'শান্তিনিকেতন'-এর ভাষণ বা 'শারদোৎসব' নাটক; লিখবেন 'রাজা' অথবা 'ডাকঘর'। একদিকে মাঘোৎসবের জন্য এই কথা (১১ মাঘ ১৩১৬): 'আমার মধ্যে তোমার যা প্রকাশ তাই কেবল সুন্দর, তাই কেবল মঙ্গল, তাই কেবল নিত্য। আর সমস্তের কেবল এইমাত্র মূল্য যে তারা সেই প্রকাশের উপকরণ।' আর অন্যদিকে, কয়েকদিনের মধ্যেই (২০ মাঘ) গ্রামের ভাবনায় নগেন্দ্রনাথকে জানানো: 'চাষাদের সঙ্গে co-operation-এ চাষ করা, ব্যাঙ্ক করা, ওদের স্বাস্থ্যকর বাসস্থান স্থাপন করা, ঋণ মোচন করা, ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, বৃদ্ধ বয়সের সংস্থান করে দেওয়া, রাস্তা করা, বাঁধ বেঁধে দেওয়া, জলকষ্ট দূর করা, পরস্পর পরস্পরের সহায়তাসূত্রে আবদ্ধ করা, এমন কত কাজ আছে তার সীমা নেই।'

৫

কিন্তু এ-দুয়ের মধ্যে সত্যি কি কোনো বিরোধ আছে, যতটা বিরোধ কল্পনা করি আমরা? একদিকে আত্মিক জীবন আর অন্যদিকে এই সমাজজীবনের মধ্যে যাওয়া-আসারও একটা ভিতরের পথ কি নেই কোথাও? একটু লক্ষ করলে হয়তো দেখব, যাকে আমরা রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মভাবনা বলে ভাবি, তার আছে একটা সামাজিক ভিত; আর তাঁর সমাজভাবনার শক্তি হিসেবে আছে একটা আত্মিক প্রবণতা। আর, এরই ফলে এই দুয়ের মধ্যে, বস্তুত রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনযাপনের মধ্যেই, তৈরি হতে থাকে এক সামঞ্জস্যসূত্র, আপাতবিরোধী বিচিত্র দিক একত্রে এসে মিলতে থাকে সেখানে।

দেশচর্যার কথা যখনই বলেন রবীন্দ্রনাথ, তখনই তিনি মনে করিয়ে দেন আমাদের অবমানিত প্রকাণ্ড দেশপরিধির কথা, মনে করিয়ে দেন রাজনৈতিক সঙ্ঘগুলির সঙ্গে সেই পরিধির ঐকান্তিক যোগহীনতার কথা। শিক্ষাহীন পুষ্টিহীন এ-দেশের সাধারণ মানুষের সামনে যখন জীবনেরই কোনো সঞ্চারক দিশা নেই, তাদের কাছে তখন দেশ কথাটারই-বা মানে কী! অবিরাম এক না-এর মধ্যে থাকতে থাকতে তাদের ভিতরে আত্মবিশ্বাসের কোনো অস্তিত্ব নেই আর। দশ বছরের গ্রামজীবনযাপনে রবীন্দ্রনাথ যা দেখেছেন, যে-বিবরণ তিনি তৈরি করেছেন 'গোরা'র (১৯১০) পল্লীভাবনার মধ্য দিয়ে, তাতে কেবলই জেগে ওঠে দেশজোড়া এক আত্মদীনতা আর আত্মধিক্কারের লাঞ্ছনা। সেইখান থেকে মুক্ত করে এনে তাদের কোনো-একটা বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠা দেওয়াকেই রাজনীতির একটা বড়ো কাজ বলে ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সমাজচিন্তা তাই হয়ে দাঁড়ায় আত্মশক্তিরই চিন্তা, এই শতাব্দীর প্রথম দশক জুড়ে এই আত্মশক্তির উপার্জনই হয়ে ওঠে তাঁর রাজনৈতিক ভাবনার কেন্দ্র। ১৯০৯ সালের 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে রাজার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে বিদ্রোহী করে তোলে ধনঞ্জয়। কিন্তু সেই একইসঙ্গে নিজেকে সে পরাভূত ভাবে, যখন দেখে যে তার অনুগামীরা ভর করছে কেবল তারই ওপর, নিজেদের ওপর ভরসা ফিরে পায়নি। এই দিকটাতে খেয়াল রাখলে বুঝতে পারি, যাকে অনেক সময়ে মনে করা হয়েছে সমাজ থেকে কাজ থেকে তাঁর দূরে সরে আসবার আয়োজন, সেটা তাঁর সামাজিক ক্রিয়ারই বিশেষ একটা পদ্ধতি মাত্র। রাজনৈতিক আলোচনায় যে 'সদুপায়' 'প্রতিকার' বা 'পাথেয়' শব্দগুলির ব্যবহার করতে দেখি তাঁকে, সেই উপায় বা পাথেয় নিহিত থাকে শুধু আত্মশক্তি গড়ে তুলবার ভাবনায়।

অন্যদিকে, সমাজজীবনের এই আত্মশক্তির নিভৃত একটা ঘর হলো তাঁর ব্যক্তিজীবনের আত্মিকতা। সেই আত্মিকতার ব্যাখ্যানে যখন তিনি মাঘোৎসবের ওই ভাষণগুলির মতো বলেন: 'আমাদের মুহূর্তে মুহূর্তে নবীন হতে হবে, আমাদের ফিরে ফিরে নিমেষে নিমেষে তাঁর মধ্যে জন্মলাভ করতে হবে। কবিতা যেমন প্রত্যেক মাত্রায় মাত্রায় আপনার ছন্দটিতে গিয়ে পৌঁছোয়, প্রত্যেক মাত্রায় মূল ছন্দটিকে নূতন করে স্বীকার করে, এবং সেইজন্যই সমগ্রের সঙ্গে তার প্রত্যেক

অংশের যোগ সুন্দর হয়ে ওঠে। আমাদেরও তাই করা চাই' তখন 'সমগ্রের সঙ্গে প্রত্যেক অংশের' ওই যোগভাবনার মধ্যেই থেকে যায় তাঁর জীবনমুখ, যে-জীবন ব্যষ্টি থেকে সমষ্টির দিকে ছড়িয়ে গিয়ে মুক্তি পায়।

আর তখন আমরা বুঝতে পারি, কেন একই দিনে লেখা সম্ভব আলো আর অন্ধকারের কথা, কেন একই দিনে দেখতে পাই 'সর্বনেশে'র আবির্ভাব আর ভিখারি সাজানোর ছবি, সামনের দিকে ছড়িয়ে যাওয়া আর ভিতরের দিকে সংহত করে আনার আবেগ। বাইরে যাকে ভিখারি সাজানো হয়েছে, জাগতিক আঘাতের পরম্পরায় আর ব্যর্থতায় ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে যাকে, ভিতরের সামর্থ্যে সেও হয়তো জীবনের বরণ পেতে পারে কোথাও। কিন্তু কোন্-সে জীবন? কে এই 'মহারাজা' যার দুয়োরে এসে দাঁড়াবে ওই ভিখারি? গণ্ডিবাঁধা এক 'আমি'র জীবন পেরিয়ে এসে প্রসারিত 'না-আমি'র যে জীবন আছে সামনে, সেই জীবনই তাকে ডাকতে পারে রাজরূপ নিয়ে। যদি সে-বরণ বুঝে নেয় কেউ, তখনই, আত্মশক্তির সেই বিন্দু থেকেই কেউ বাইরে তাকিয়ে বলতে পারে 'এবার যে ওই এল সর্বনেশে', ভিতরের 'মহারাজা' আর বাইরের 'সর্বনেশে' এক হয়ে যায় তখন, জীবন তখন মেতে উঠতে চায় কোনো 'মরণবিহারে'। 'ছড়ানো এই জীবন'কে যখন অন্ধকারের মধ্যে জড়িয়ে নেবার আর্তি জানান কেউ, তখন সেই অন্ধকার হয়ে দাঁড়ায় 'রাজা' নাটকের অন্ধকার, সে-অন্ধকার নিজেকে তৈরি করে তুলবার নেপথ্যঘর মাত্র। 'আমরা চলি সমুখপানে'র সঙ্গে তখন তার আর বিরোধ নেই একেবারেই, কেননা সমস্ত সেই চলার পথ জুড়েই অবলম্বন হয়ে থাকে তার ওই ভিতরকার ঘর, বাইরের সঙ্ঘ আর ভিতরকার ব্যক্তির মধ্যে চলতে থাকে এক যাওয়া-আসা। সেই যাওয়া-আসাকে আমরা সরলরেখায় চিনতে পারি না সবসময়ে। একদিকে সমাজজীবন আর অন্যদিকে শিল্পিত জীবনের মধ্যবর্তী সংযোগ হিসেবে থেকে যায় ব্যক্তিজীবনের কত অনুপুঙ্খ, তুচ্ছ আর মহৎ কত অভিজ্ঞতার টানাপোড়েন, ইন্দ্রিয়গত আর অতীন্দ্রিয়ের কত নিরন্তর মেলামেশা! একটি কবিতার মধ্যে এর সবই সম্পৃক্ত হয়ে থাকতে পারে বলে সে-ধরণের কবিতা থেকে নীরদচন্দ্র চৌধুরীর অর্থে সরল কোনো জীবনছবি পাওয়া হয়তো শক্ত হবে, জীবনকে তখন কেবল খুঁজতে হয় অবনীন্দ্রনাথেরই বলা অর্থে, কোনো গান বা কবিতা শুনতে শুনতে যেখানে মনে হতে পারে 'রবিকা পারতেন বলতে, তাঁর সেই বুক ছিল'। সেই বুকের স্পন্দন শুনবার মধ্যেই থেকে যায় কোনো কবির জীবন।

হিন্দুত্ব, ভারতীয়ত্ব এবং রবীন্দ্রনাথ

দেবদাস জোয়ারদার

রবীন্দ্রনাথের একটি প্রিয় শব্দ ছিল 'মহাভারতবর্ষ'। সংক্ষেপে একে তিনি কখনও কখনও বলেছেন 'মহাভারত'। কেননা তাঁর বিশ্বাস ছিল: 'একটি ভৌগোলিক আধারে ভারতবর্ষে অনেকগুলি দেশ পুরে রাখা হয়েছে। ব্যাপারটা য়ুরোপের ঠিক উল্টো। ওখানে একটি দেশ বহুদেশে পরিণত হয়েছে'।[১] য়ুরোপের নেশনস্টেটের আদর্শে ভারতে স্টেট গড়তে হলে বাংলা, গুজরাত, মহারাষ্ট্র ইত্যাদিকে আলাদা স্টেট করতে হয়। এ ত বলা হল স্বতন্ত্র ভাষাগোষ্ঠীর কথা, ধর্মীয় বা নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর পার্থক্যও এদেশে কম নেই। এ রকম নানাধরনের পার্থক্য স্বীকার করেই ভারতে যুগযুগ ধরে এক মহাজাতি গঠনের সাধনা চলছে। এই সাধনার বিরোধী শক্তি সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন বলেই ১৩০৫ বঙ্গাব্দে লিখতে পেরেছিলেন :—

'বহুদিনের বিরোধ-দ্বন্দ্বের মধ্যে যে একটি প্রাচীন ঐক্যগ্রন্থি আমাদের নাড়িতে নাড়িতে বাঁধিয়া গিয়াছে সেইটেকেই প্রবল করিয়া আমাদের স্থানীয় এবং সাময়িক অনৈক্যগুলিকে ক্ষুদ্র কোণজাত ধুলার মতো ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে। বর্তমান কালে হিঁদুয়ানির পুনরুত্থানের যে-একটা হাওয়া উঠিয়াছে তাহাতে সর্বপ্রথমে ওই অনৈক্যের ধুলা; সেই প্রাদেশিক ও ক্ষণিক তুচ্ছতাগুলিই উড়িয়া আসিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে'।[২]

মাঝেমাঝেই হাওয়ায় ধুলো ওড়ে, তাতে আমাদের সত্যদৃষ্টি ঢাকা পড়ে, রবীন্দ্রনাথের মহাভারতবর্ষকে বিশেষ কোনও ধর্মাবলম্বীর দেশ বলে সাময়িক ভাবে ভাবতে শুরু করি। ধূলিঝড় থামলে কালে কালে ভারতীয়রা সত্যদৃষ্টি ফিরে পেয়েছে, সাময়িক বিভ্রান্তি কাটিয়ে আত্মস্থ হতে পেরেছে।

রবীন্দ্রনাথ ভারতবাসীদের মধ্যে বহুজাতি আছে—এ কথা বিশ্বাস না করে বিশ্বাস করতেন যে সকল জাতি মিলিয়ে এখানে আছে একটা মহাজাতি। আর এ প্রসঙ্গেই 'মহাভারতবর্ষ' এবং 'মহাজাতি' শব্দগুলি রবীন্দ্ররচনাবলীতে ফিরে ফিরে এসেছে। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর বোমা নিক্ষেপের ঐতিহাসিক ঘটনার পর ১৯০৮এ লেখা তাঁর 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধে 'মহাভারতবর্ষ' শব্দটি আমরা পাই, আবার অনেক কাল পরে ১৯৩৩এ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা চিঠিতে তিনি বলেছেন 'যথার্থ ভারতবর্ষ' মহাভারতবর্ষ'।[৩] তাঁর 'চিত্ত মহাভারতবর্ষের অধিবাসী' বলেই 'মনুসংহিতা ও রঘুনন্দনের ছাঁটাকাটা হাড় বের-করা শুচিবায়ুগ্রস্ত ভারতবর্ষ'[৩]কে হিন্দুয়ানিতে আচ্ছন্ন এক ভূখণ্ডরূপে তিনি জানতেন। অন্যদিকে তাঁর মহাভারতবর্ষের কথায় তিনি বৌদ্ধধর্মের মিলনমন্ত্র স্মরণ করেছেন, আর ইসলাম সম্পর্কে বলেছেন :—

'তাহার পরে এশিয়ার পশ্চিমতম প্রান্তে দৈববলের প্রেরণায় মানবের আর এক মহাশক্তি সুপ্তি হইতে জাগ্রত হইয়া ঐক্যমন্ত্র বহন করিয়া দারুণ বেগে পৃথিবী প্লাবিত করিতে বাহির হইল; সেই শক্তিস্রোতকে বিধাতা যে কেবল ভারতবর্ষে আহ্বান করিয়াছেন তাহা নহে, এইখানেই তিনি তাহাকে চিরদিনের জন্য আশ্রয় দিয়াছেন'।[৪]

যারা তা বিশ্বাস করে না, তারা এক অলীক হিন্দু ভারতের ভাবনায় মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকে। এই হিন্দুভারত থেকে মহাভারতে তাঁর নিজেরও একদিন নিষ্ক্রমণ ঘটেছিল। সেই নিষ্ক্রমণের একটি বহুরেখ বহুবর্ণ ছবি তিনি এঁকেছিলেন তাঁর কল্পিত গোরা চরিত্রে। 'ঘরে বাইরে'র নিখিলেশও গুহকচণ্ডাল ও একলব্যের প্রতি রক্তের টানে, পঞ্চুর প্রতি ভালবাসায় এবং বিদেশী পণ্যবর্জন আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলার দরিদ্র মুসলমান প্রজা ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের জন্য সমবেদনায় সন্দীপের হিন্দুভারতের বিপরীত এক মহাভারতের ভাবনায় ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় আহত এক বলি, আর অমূল্য আরেক বলি, সে নিহত।

এ কথা ঠিক নয়, 'গোরা' লিখতে শুরু করার আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মন এই সম্পূর্ণ পর্ব জুড়ে হিন্দুভারতের গর্বে

আচ্ছন্ন ছিল। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে মাত্র কয়েকটি বছর কোনও কোনও রচনায় হিন্দুভারতের সঙ্গে তিনি তাঁর প্রিয় মহাভারতকে এক করে ফেলেছেন। যে-সব রচনায় এই প্রবণতা দেখি, সেখানেও হিন্দুভারতের গৌরব গান থাকা সত্ত্বেও তিনি দুর্বলতম মুহূর্তেও অহিন্দুদের প্রতি কোনও বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নি। কেন না বিদ্বেষ তাঁর স্বধর্ম ছিল না, প্রেমই তাঁর স্বধর্ম। 'আত্মশক্তি'র 'ভারতবর্ষীয় সমাজ' প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শন নবপর্যায়ে ১৩০৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণমাসে 'হিন্দুত্ব' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন :—

'সমাজকে শিক্ষাদান, স্বাস্থ্যদান, অন্নদান, ধনসম্পদদান, ইহা আমাদের নিজের কর্ম; ইহাতেই আমাদের নিজের মঙ্গল—ইহাকে বাণিজ্য হিসাবে দেখা নহে, ইহার বিনিময়ে পুণ্য ও কল্যাণ ছাড়া কিছুই আশা না করা, ইহাই ব্রহ্মের সহিত কর্মযোগ, এই কথা নিয়ত স্মরণ করা, ইহাই হিন্দুত্ব'[৫]।

এখানে যে-সব কাজকে তিনি 'হিন্দুত্ব' বলেছেন, সেগুলিকে 'মনুষ্যত্ব'ও বলতে পারতেন। তবে এ কথা সত্য, এখানকার ভাষায় যজ্ঞ, ব্রহ্ম, পুণ্য জাতীয় শব্দগুলিতে একটা ধর্মবিশ্বাস কাজ করেছে। তবে মনে হয় না যে এ বিশ্বাস এমন উগ্র হয়ে উঠেছে যে তা অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে অগ্রাহ্য হবে। এদেশে পুণ্যকে ইহলোকের পরিবর্তে পরলোকের বাণিজ্যরূপে দেখা হয় বলে লোককল্যাণকর কর্মের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক রচনায় পুণ্যলিপ্সাকে আঘাত হেনেছেন। কিন্তু সে আঘাত এখানে নেই। 'ভারতবর্ষ ও স্বদেশ' গ্রন্থভুক্ত 'নববর্ষ' প্রবন্ধে ভস্মাচ্ছন্ন মৌনী মৃগচর্মাসীন ভারতের গৌরবধ্বনি উচ্চারণ করতে গিয়ে আমাদের সাময়িক পাশ্চাত্য প্রীতি 'মিলি মিলি যাওব সাগরলহরী-সমানা'[৬]—এমন কথা তিনি বলেছেন। এ-সব কথায় তাঁর আত্যন্তিক হিন্দুভাবের প্রকাশ ঘটেছে।

এরকম হিন্দুভাবের প্রকাশ 'গোরা' লেখার পরেও দেখেছি, যেমন 'পরিচয়' গ্রন্থভুক্ত 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধের এসব কথায় :—

'হিন্দু শব্দে এবং মুসলমান শব্দে একই পর্যায়ের পরিচয়কে বুঝায় না। মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম কিন্তু হিন্দু কোনো একটি বিশেষ ধর্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম'।[৭]

এই প্রবন্ধেই তিনি লিখেছেন, কালীচরণ বাঁড়ুজ্জে, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন হিন্দু-খ্রীস্টান ছিলেন, তেমনই বাংলায় হাজার হাজার মুসলমানও আসলে হিন্দুমুসলমান, যদিও হিন্দুরা তাদের বারবার বলছে যে তারা হিন্দু নয়। 'হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম' এই বাক্যটি বা এই প্রবন্ধের আরও অনেক বাক্য আজকের সুযোগ সন্ধানী, ধর্মব্যবসায়ী, রাজনীতির হাটে দেবতাকে বিক্রি করায় ওস্তাদরা কাজে লাগাতে পারেন। ভারতীয়ত্বকে হিন্দুত্বের সঙ্গে একাকার করার এই ঝোঁক নিশ্চয় আমাদের মনে সাড়া জাগায় না। এ দুয়ের সমীকরণে আমরা আপত্তি জানালেও এই প্রবন্ধের মূল বক্তব্যে আমাদের সায় আছে। ব্রাহ্মরা হিন্দু বলে আত্মপরিচয় দেবে কি না—এই প্রসঙ্গে কবির বক্তব্য ছিল, হ্যাঁ, তা দেওয়া উচিত। এই বিশেষ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভারতের সকলেরই হিন্দু হিসাবে পরিচয়—এ কথায় বাড়াবাড়ি হলেও ইসলাম ভারতে এসে ভারতীয় রূপ পেয়েছে, প্রবন্ধের এই মূল বক্তব্য মুসলিম মৌলবাদীরা স্বীকার না করলেও একটি ঐতিহাসিক সত্য। চীন, পারস্য বা আফ্রিকার মুসলমান সকলেই মুসলমান হলেও প্রত্যেকেই নিজ নিজ দেশের 'পুরাতন জাতিগত প্রকৃতির মধ্যে নানা বৈচিত্র্য লাভ করিতেছে'।[৮] ভারতবর্ষই বা কেন এই বৈচিত্র্যলাভের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হবে? কেন ইসলামের ভারতীয় রূপে আপত্তি উঠবে? এই প্রবন্ধেরই শেষ দিকে উর্দু ভাষা সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন, তাতে 'বিদেশী সামগ্রীতে আদ্যোপান্ত সমাচ্ছন্ন'[৯] এ ভাষার ভারতীয়ত্বের কথাই বলা হয়েছে। এ ভাষার প্রকৃতিগত যে কাঠামোটা তার নিত্যসামগ্রী, যে কাঠামোকে অবলম্বন করে সৃষ্টির কাজ চলে, তার গুণে এ ভাষা ভারতীয়, যতই তার মধ্যে আরবি এবং পারসি শব্দ থাক না কেন। আজকের হিঁদুয়ানির ঝড়ে যাঁরা ধুলো ওড়াচ্ছেন, তাঁদের কাছে কি কবির এ-সব উক্তি গ্রহণীয় মনে হবে? তাঁরাই সহজ সরল সর্বজনবোধ্য হিন্দুস্থানির আরবি পারসি শব্দ ঝেঁটিয়ে বিদায় করে কৃত্রিম সংস্কৃত শব্দবহুল হিন্দী ভাষার জন্য মেতে উঠেছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রপ্রবন্ধ তন্ন বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তাঁর চিন্তাভাবনার পরিচয় এখানে দিতে বসি নি। কেন না প্রবন্ধ ত মতপ্রকাশের জন্য তিনি লিখেছেন। প্রবন্ধে মতপ্রকাশের চেয়ে অনেক গভীর সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ। সৃষ্টির সমুদ্রে আত্ম-

প্রকাশের অন্তঃস্রোত বয়ে যায়। এই আত্মপ্রকাশে সমগ্র মানুষের এক অন্তরঙ্গ পরিচয় নিহিত থাকে। এই সমগ্র মানুষ বিশেষ মতে, দেশে বা কালে সীমাবদ্ধ মানুষ নন। এই সমগ্র মানুষের পক্ষে মিথ্যাচরণ সম্ভব নয়। এই খাঁটি স্রষ্টার কথা মনে রেখেই মিল্টনের Paradise Lost সম্পর্কে Blake লিখেছিলেন 'he was a true poet and of the Devil's party without knowing it'.—The Marriage of Heaven and Hell.

তাই আমাদের লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের সৃষ্টি—তাঁর সাহিত্য থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত আহরণ। এই দৃষ্টান্তগুলিতে আমরা দেখতে পাব তিনি হিন্দু-মুসলমানের অন্তরের মিলনের কথা তাঁর কবিতায়, গল্প, উপন্যাসে এবং নাটকে কীভাবে বলেছেন। শুধু হিন্দু-মুসলমানের মিলন নয়, বর্ণভেদে ধনবৈষম্যে এই বহুধাবিভক্ত হিন্দু-সমাজের উচ্চস্তরের সঙ্গে নিম্নস্তরের মিলনের ভাবনাও তাঁর চিত্তে সদা জাগ্রত ছিল। তিনি যে-মহাভারতের ভাবনায় বিভোর ছিলেন, সেই মহাভারতে শুধু সংস্কৃত মন্ত্র-পড়া মুনি-ঋষিরা ছিলেন না, শুধু শাস্ত্রবেত্তা ব্রাহ্মণরা ছিলেন না, শুধু শস্ত্রহস্ত ক্ষত্রিয়েরা ছিলেন না, সেখানে ভীমের সঙ্গে হিড়িম্বা রাক্ষসীর বিবাহ সম্ভব হয়েছে, মণিপুরের অনার্য কন্যা চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ বীর অর্জুনের প্রণয় ও পরিণয় অবারিত হয়েছে। সেই মহাভারতে অনায়াসে রামের সঙ্গে গুহক চণ্ডাল মৈত্রীর বন্ধনে বাঁধা পড়েছেন। এ-হেন রামকে যখন রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত উত্তরকাণ্ডে ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রম ধর্মের ধ্বজা হাতে শূদ্র হয়ে তপস্যার অপরাধে শম্বুক হত্যা করতে দেখেন, তখন তাঁর শোচনীয় পরিণতিতে বেদনাবোধ করেন। 'অচলায়তন' ও 'রথের রশিতে রামের এই অপকর্মে ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রচিত্তের চিহ্ন রূপকের আড়ালে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।

রামকে সীতা বিসর্জনকারীর ভূমিকায় পুরুষ-পরুষ সমাজের নিষ্ঠুর প্রতিনিধিরূপে দেখতে পেয়েও তিনি এমনি বেদনা বোধ করেন। রবীন্দ্রনাথের অন্তত একটি গল্পের গূঢ় অভ্যন্তরে রামসীতার প্রত্নপ্রতিমা বা আর্কিটাইপ দেখতে পেয়ে আমরা বিস্মিত বোধ করি। সেই গল্প হল তাঁর লেখা 'শাস্তি'। এই গল্পের চন্দরা সীতার মতোই মিথ্যা অপবাদে অভিযুক্তা। সীতা তাঁর সতীত্বহানির অভিযোগে সমাজের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছেন। রামের অন্তরাত্মা স্ত্রীর চরিত্র বিশুদ্ধ জেনেও লোকরঞ্জনের জন্য তাঁকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার দোহদ অভিলাষ পূর্ণ করার মিথ্যা ছলনায় লক্ষ্মণকে দিয়ে আবার বনে পাঠিয়েছেন। আর অন্যদিকে নিরপরাধা তরুণীবধূ চন্দরার বড় জা রাধাকে হত্যার মিথ্যা অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হয়। পৃথিবী সীতার মা, পাতাল প্রবেশের মধ্য দিয়ে তিনি মায়ের কাছেই ফিরে গেলেন। চন্দরাকেও জেলখানায় ফাঁসির আগে সার্জন যখন জিজ্ঞেস করে কাউকে তার দেখতে ইচ্ছা করে কিনা, তখন উত্তরে সে বলেছে যে, সে তাঁর মাকে দেখতে চায়। রবীন্দ্রনাথ ত একালে আর পাতাল প্রবেশের অপ্রাকৃত গল্প লিখতে পারেন না। তবুও সীতার মা ধরিত্রীর স্নিগ্ধ অন্ধকারে আশ্রয় পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও চন্দরার মাকে দেখতে চাওয়ার শেষ ইচ্ছা আমাদের অনুভবে কোথায় যেন মিলে যায়, মিশে যায়। তা ছাড়া আর এক জায়গায় রামায়ণের রাম আর 'শাস্তি' গল্পের চন্দরার স্বামী ছিদামের কল্পনা রবীন্দ্রনাথের মনে মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে। লঙ্কাযুদ্ধে নাগপাশে সংজ্ঞাহীন রাম-লক্ষ্মণ। রাম সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে লক্ষ্মণকে দেখলেন সংজ্ঞাহারা। রাম তখন বলছেন, 'ভ্রাতা লক্ষ্মণকে যুদ্ধে নিহত দেখছি, তখন সীতায় বা জীবনে কী প্রয়োজন। অন্বেষণ করলে মর্ত্যলোকে সীতার সমান নারী পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু লক্ষ্মণের তুল্য ভ্রাতা সহায় এবং যোদ্ধা পাব না।' এরকম কথা রামের মুখে আরেকবার শুনেছি। সেবার রাবণের শক্তিশেলে লক্ষ্মণ মূর্ছিত। লক্ষ্মণ নিহত ভেবে রাম বলছেন :

> দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
> তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ॥

[দেশে দেশে পত্নী পাওয়া যাওয়া যায়, দেশে বন্ধুও মিলে কিন্তু এমন দেশ দেখি না যেখানে সহোদর ভ্রাতা পাওয়া যায়।] রামের এই কথাগুলিই কি আমরা চন্দরার স্বামী ছিদামের মুখে শুনি নি? রামলোচন চক্রবর্তী অযাচিতভাবে পরামর্শ দিয়েছিল যে দাদা দুখিরামের দায়ের কোপে বড় বউ মরেছে বললে ছোট বউ চন্দরা বেঁচে যাবে। রামলোচনের এই পরামর্শ শুনে কিছু না ভেবে-চিন্তেই ছিদাম বলেছে, 'বউ গেলে বউ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর তো ভাই পাইব না।' এই কথাগুলিকেই আমরা রামের কথা 'দেশে দেশে কলত্রাণি'···ইত্যাদির বাংলা বলছি। 'সম্পত্তি সমর্পণ' গল্পেও এই জাতীয় কথা শুনেছি। তাতে অনুমান করি 'গল্পগুচ্ছে'র লেখক রবীন্দ্রনাথের মনে নারী সম্পর্কে অবমাননাকর রামচন্দ্রের উক্তিটি

বিশেষভাবে জাগরূক ছিল।

রবীন্দ্রনাথের মহাভারতবর্ণে পুরুষও যেমন আছে, নারীও তেমনি আছে। আর এইখানে যখনই পুরুষপ্রধান সমাজে নারী লাঞ্ছিত, অপমানিত, সেইখানেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ। তাঁর 'হৈমন্তী' গল্পের শেষে সীতা বিসর্জনের ঘটনাটি নায়কের শাণিত ভাষায় ব্যঙ্গের বাণের মতো পুরুষপ্রধান হিন্দুসমাজের বুকের উপর নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কিন্তু তার বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে আমরা অন্য কয়টি গল্পের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধের উপর আলোকপাত করতে পারি। কবি চিরকাল যথার্থ মানবধর্মের স্বরূপ-সন্ধানী। এই মানবধর্মের বিপরীত প্রান্তে লোকধর্ম যার অবলম্বন আচার, বিচার, সংস্কার ও অভ্যাস। 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পে আপনার আরাধ্য রাধাকৃষ্ণের মালঞ্চের শুচিতা রক্ষায় অন্তস্র প্রহরিণী জয়কালীর সংস্কার শূকরের মতো মলিন ও বিশ্রী প্রাণীর প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত প্রীতিধর্মের কাছে হার মেনেছে—যদিও গ্রামের আর সকলে একে স-ক্ষম দৃষ্টিতে দেখতে পারে নি। 'রবীন্দ্রজীবনী'কার এই গল্পের সঙ্গে তখনকার একটি ঘটনার পরোক্ষ যোগ নির্দেশ করেছেন। সুদূর সুইডেন থেকে হামারগ্রেন নামে এক তরুণ রামমোহন রায়ের গ্রন্থাদি পড়ে এই মনীষীর জন্মভূমি বাংলার প্রতি মমতায় এই দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এদেশে এসেছিলেন। এখানে কঠিন শ্রমে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি তাঁর শেষ ইচ্ছা জানিয়েছিলেন যে হিন্দুদের মত শ্মশানে যেন তাঁর শবদাহ হয়। কিন্তু একজন বিধর্মী ও বিদেশীর এহেন সাধে বাদ সাধার লোকের অভাব এদেশে হয়নি। এই ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ আহতচিত্তে 'বিদেশী অতিথি ও দেশী আতিথ্য' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। শুদ্ধ আচারের দুর্গস্বরূপ মালঞ্চে শূকরের প্রবেশে ও জয়কালীর তা প্রসন্নচিত্তে মেনে নেওয়ায় হামারগ্রেনের হিন্দুশ্মশানে অনধিকার প্রবেশ অন্তত কল্পনায় রবীন্দ্রনাথ এই গল্পে অবারিত করে দিলেন। আবার একই সঙ্গে তিনি এই গল্পে লিখতে ভুললেন না :—

> এই সামান্য ঘটনায় নিখিল জগতের সর্বজীবের মহাদেবতা পরমপ্রসন্ন হইলেন কিন্তু ক্ষুদ্র পল্লীর সমাজ নামধারী অতি ক্ষুদ্র দেবতাটি নিরতিশয় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

দুর্ভাগ্যবশত সর্বজীবের মহাদেবতা অধিকাংশ আচারনিষ্ঠ হিন্দুর কাছে মূল্যহীন, আর যত অমূল্য পল্লীর সমাজ নামধারী অতিক্ষুদ্র দেবতাটি। এই দেবতাই শতসহস্র সংস্কার পালনে আমাদের উৎসাহিত করে। হামারগ্রেনের মতোই অনধিকার প্রবেশের গল্প বড়ো আকারে তিনি রূপ দিয়েছেন জন্ম সূত্রে আইরিশ গোরার কাছ থেকে পালক পিতা আচারনিষ্ঠ কৃষ্ণদয়ালের হিন্দুস্থলভ শুচিতা রক্ষায়। রবীন্দ্রনাথের মহাভারতবর্ণে যেখানেই ধর্ম নারীপুরুষের মিলনের পথে অন্তরায় হয়েছে, সেইখানেই এই অন্তরায়ের নিরর্থকতা উদ্‌ঘোষিত। 'দুরাশা' গল্পে কেশরলালের পরাভূত 'ব্রহ্মণ্য' সংস্কারের ভয়তোরণে মানবধর্মের পতাকা উড়েছে বদ্রাওনের নবাবদুহিতার কাছে শোনা তাঁর ব্যর্থপ্রেমের কাহিনীতে দার্জিলিঙের কুয়াশাচ্ছন্ন ক্যালক্যাটা রোডে। হ্যাঁ, তাঁর প্রেম ব্যর্থ হলেও এর জয় পতাকা বাতাসে ওড়ার শব্দ শুনছি। গল্প শেষে কেশরলালের যে-ব্রহ্মণ্য নবাবদুহিতার কিশোর হৃদয় হরণ করে নিয়েছিল, তা যে শুধুই 'অভ্যাস', শুধুই 'সংস্কার' মাত্র—তা অস্তবিহীন বেদনাকণ্টকিত ও অনভ্যস্ত পথ পেরিয়ে আজ নবাবদুহিতা বুঝতে পেরেছেন। কেননা আজই তিনি কেশরলালকে ভুটিয়া পল্লীতে ভুটিয়া নারী বিবাহ করে ভুট্টার শস্য সংগ্রহ করতে দেখলেন, তাঁকে পুত্রপৌত্রাদিবেষ্টিত অতি মলিন জীবনযাপন করতে দেখলেন। একদিন আহত কেশরলাল যুদ্ধক্ষেত্রে নবাবদুহিতার সেবা-শুশ্রূষায় জ্ঞান ফিরে পেয়েছিলেন। জল খেতে চাইলে যখন এই তরুণী তাঁকে জল দিতে গেলেন, তখনই তাঁকে চিনতে পেরে নিজের ব্রহ্মণ্য সংস্কারে জ্ঞানদাত্রী মুসলমান নারীর হাতের জল ব্রাহ্মণ কেশরলাল রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। তাতে আচার ধর্মের এই বাড়াবাড়ি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা ধিক্কৃত হয়েছে। আর এই মুসলমান তরুণীর প্রেম প্রত্যাখ্যানে যে-নিষ্ঠুরতা গল্পে দেখানো হয়েছে, তার বিপরীত দিকে প্রেমের ঐকান্তিক নিষ্ঠায় নবাবদুহিতাই বিজয়িনী হয়েছেন।[১০]

'মমস্যাপূরণ' গল্পটিতে আপাত দৃষ্টিতে বাংলার প্রজার উপর জমিদারের অত্যাচার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। নিশ্চয়ই তা হয়েছে এবং অসাধারণভাবে হয়েছে। কেননা ডাঙার বাঘ জমিদার ও জলের কুমির মহাজন এই দুয়ের আক্রমণ কী ভাবে বাংলার এক মুসলমান প্রজাকে নিরন্ন করে, কী ভাবে তার 'শীর্ণ ক্লিষ্ট শুষ্ক শ্বেত ওষ্ঠাধর' এই প্রজা এক মলিন চীর পরিহিত অবস্থায় আদালতে এসে দাঁড়ায়, তার দীপ্তনেত্র রূপটি এঁকেছেন এক জমিদার লেখক রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। কিন্তু এই সমাজ বাস্তবতার দিক্‌টি ছাড়াও এই গল্পের আর একটি দিক্ আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের জবালা ও সত্যকামের

কাহিনী নিয়ে তিনি একদিন 'ব্রাহ্মণ' কবিতা লিখছিলেন। জবালার কণ্ঠে অকপট স্বীকৃতি শুনেছিলাম : 'জন্মেছিনু ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে, / গোত্র তব নাহি জানি।' আর সত্যকামও গুরুকে গিয়ে একই কথা বলেছিলেন। তাঁর সত্যনিষ্ঠায় গুরু বলেছিলেন : 'তুমি দ্বিজোত্তম, সত্য কুল জাত।' আর এক সত্যকাম কৃষ্ণগোপাল তাঁর সমাজস্বীকৃত পুত্র জমিদার বিপিনবিহারীকে এই গল্পে অকপটে বলেছেন : "অছিমদ্দিন তোমার ভাই হয়, আমার পুত্র।" বিপিন চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "যবনীর গর্ভে?" কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "হাঁ বাপু।"

গায়ে নামাবলি ও হাতে হরিনামের মালা—কৃষ্ণগোপালের এই স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময় রূপ তাঁর সত্যনিষ্ঠ আত্মার বাহ্য শারীরিক রূপ। কৃষ্ণগোপালের মহত্ত্ব এই গল্পে প্রকটিত হয়েছে। আর অন্তদিকে, যারা এই মামলা ফেঁসে গেল কেন—এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে না পেরে নানা অনুমানে মেতে উঠেছিল, তাদের কথা বলতে গিয়ে লেখক কটাক্ষ করতে ছাড়েন নি। রামতারণ উকিলকে কৃষ্ণগোপাল নিজের খরচে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছিলেন। সেই রামতারণ আজ বিজ্ঞের মত বুঝেছে : 'যিনি যতো মালা জপুন, পৃথিবীতে আমার মতোই সব বেটা। সংসারে সাধু-অসাধুর মধ্যে প্রভেদ এই যে, সাধুরা কপট আর অসাধুরা অকপট।'

কৃষ্ণগোপাল কাশীবাসের আনন্দে বিভোর হয়ে থাকতে পারতেন। তবু তিনি তাঁর বৈধ পুত্র বিপিনবিহারীর হাতে লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত তাঁরই ঔরস ও মুসলমান নারীর গর্ভজাত অপর পুত্র অছিমদ্দির বেদনায় বিচলিত হয়ে সুদূর কাশী থেকে বাংলার এই আদালত প্রাঙ্গণে ছুটে এসেছেন। ধর্মের বেড়া ডিঙানো মহত্তর মানবধর্মের প্রেরণাই তাঁকে এই আদালত প্রাঙ্গণে উপস্থিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধের প্রকাশের দিক্ থেকেও এই গল্প অবিস্মরণীয়, শুধুই বাংলার অত্যাচারিত রায়তের সংগ্রামী গল্প হয়ে ওঠেনি 'সমস্যা পূরণ'। কৃষ্ণগোপালের মানবধর্মের এই মহত্ত্বের পাশে বিপিনবিহারীর 'প্রিন্সিপ্‌ল্' নিষ্ঠার এবং রামতারণের সুবিজ্ঞ উপলব্ধির নীচতা বৈপরীত্যসূত্রে একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ গেঁথেছেন।

১৮৯৬এ লেখা তাঁর কাব্য নাট্য 'সতী'র[১২] অন্তরলোকে মহাভারতবর্ষের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা ফিরে তাকাতে পারি। এই কাব্যনাট্যে আমরা রক্তাক্ত রণক্ষেত্রে প্রথমই কন্যা অমাবাই ও পিতা বিনায়ক রাওয়ের মিলনদৃশ্য উন্মোচিত হতে দেখি। এই একটি মাত্র দৃশ্যে সম্পূর্ণ নাটকে পরে অমার মা রমা বাইকেও দেখেছি। এই তিনজনের সংলাপে দ্বন্দ্ব-জটিল ঘটনাচঞ্চল গতিতে যে-নাট্যকাহিনী রূপ পেয়েছে, তাতে শুনি যে অমার বিবাহের রাত্রে একজন মুসলমান তরুণ তাকে বিবাহ বাসর থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল এবং তাকেই ভালোবেসে পতিরূপে অমা বরণ করেছিল। তাতে তাদের আগেকার ভালোবাসার সম্পর্কই জয়ী হল। আর ওদিকে তার পিতার নির্বাচিত বর জীবাজি ও পিতা নিজে সেই মুসলমান তরুণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করে। সেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে জীবাজিও নিহত হয়। এমন মরণগন্ডীর রণক্ষেত্রে পিতাপুত্রীর সংলাপে একদিকে অমার উদ্দেশে পিতৃকণ্ঠের ধিক্কার উচ্চারিত হচ্ছে, আর অন্তদিকে তারই উদ্দেশে যবন-পতিহারা অমার পাতিব্রত্যের নিষ্ঠা বেদনায় ঘোষিত হচ্ছে। পিতা তাকে বোঝাচ্ছে, যাকে সে পতি বলছে, সে বিধর্মী মুসলমান, পিতা কন্যাকে নিয়ে সমাজ থেকে বহুদূরে লোক-নিন্দার ওপারে চলে যেতে চায়, পড়ে থাকুক অমার শিশুপুত্র যবনের ঘরে। কিন্তু এমন নিষ্ঠুর প্রস্তাবে কন্যার সম্মত হওয়া সম্ভব নয়, একেবারে অসম্ভব। সেই সময় মাতা রমাবাই উগ্ররূপে এসে উপস্থিত হয়। অমা মাকে প্রণাম করতে গিয়ে বাধা পায়—'ছুঁস নে যবনী। পাতকিনী'। মা রমাবাই এসে জীবাজির জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রস্তুত চিতাশয্যায় অচীন সে-পতির সহমরণে অমাকে তুলে দেয়। বিনায়ক বুঝেছিল, 'সমাজের চেয়ে / হৃদয়ের নিত্যধর্ম সত্য চিরদিন', সৈন্যদলকে সে সেই নিষ্ঠুর কর্ম থেকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছে 'পতি এঁর স্বধর্মী যবন', কিন্তু সেনাপতি বলছে', 'সৈন্যগণ, / বাঁধো বুদ্ধ বিনায়কে'। এ ভাবেই ইতিহাসে বারবার মানবধর্মকে সমাজধর্মের পায়ে বাঁধা হয়েছে, রমাবাইয়ের মত সংস্কারে আচ্ছন্ন নির্মম মাতৃকণ্ঠে ধ্বনি উঠেছে 'বল্ জয় পুণ্যময়ী / বল্ জয় সতী'। রবীন্দ্রধ্যানের মহাভারতবর্ষ সত্য হ'লে যাকে ভালোবেসে শ্রদ্ধাভরে বরমাল্য পরিয়েছিল, বলে যাকে আত্মদান করে নি, যার সন্তান গর্ভে ধারণ করেছিল, তার সঙ্গে অমাবাইয়ের মিলন মরুপথে মৃত্যুতে ধূসর হত না, মিথ্যা সতীর আরোপিত খ্যাতি ভেদ করে সত্যসতীর মহিমায় অমার জীবন তার শিশুপুত্রের সঙ্গে স্নিগ্ধ হত।

মহারাষ্ট্রীয় এক গাথার অনুসরণে হিন্দু-মুসলমানের যে-পূর্ণদাম্পত্যমিলন মৃত্যুতে শূন্য হয়ে গেল 'সতী'তে ১৮৯৬এ, তা কবি পূর্ণ ক'রে তুললেন কল্পনায় জীবনের শেষপ্রান্তে লেখা 'মুসলমানীর গল্প'তে। এখানে কমলা আর করিমের বিয়ের

গল্প তিনি বলেছেন। তাদের মিলন অন্তরের কোনও সংস্কারে বা বাইরের প্রতিকূলতায় ব্যর্থ হয়ে যায় নি। এই বলিষ্ঠ মিলনের জন্যই খুড়তুতো বোন সরলাকে ডাকাতদলের হাত থেকে কমলার বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। দুই ধর্মের নারীপুরুষের অন্তরের মিলন এই গল্পে স্বীকৃত হলেও যেখানে মুসলমানপুরুষ কর্তৃক হিন্দুনারীহরণ, কিন্তু অন্তরের মিলন নেই—কবির শেষ জীবনের এমন অনেক ঘটনার বেদনায় রক্তলেখ হয়ে আছে পুরোনো ছড়ার আদলে লেখা 'আকাশ প্রদীপ' কাব্যগ্রন্থের 'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে' কবিতাটি। অপহৃতা সুন্দরীর নারীত্বের লাঞ্ছনায় কে হিন্দু, কে মুসলমান—এমনতর প্রশ্নের চেয়ে গুরুতর পুরুষের পৌরুষহীন পরস্বতা। সেই পৌরুষহীনতাই কবিতাটিতে নিন্দিত হয়েছে।

অন্তর্জলি ও সতীদাহ প্রথার নিষ্ঠুরতা গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে 'মহামায়া'য়। কুলীনের কৌলীন্য রক্ষার দায় পালন করতে গিয়ে বয়স্কা বোনের অনেককাল বিয়েয় ব্যবস্থা ভবানীচরণ করতে পারে নি। এর মধ্যে অকুলীন রাজীবের হৃদয়ে স্থান পেয়েছিল মহামায়া। কিন্তু তার ঘরে স্থান পাওয়ার পথে ভবানীচরণের দিক্ থেকে দুস্তর বাধা দিল। এক ম্রিয়মাণ বৃদ্ধের সঙ্গে অন্তর্জলিপ্রথায় মহামায়ার বিয়ে হয়। বিয়ের পরদিনই যথারীতি বৃদ্ধের মৃত্যু হলে মহামায়াকে তার চিতায় তুলে দেওয়া হল। বৃষ্টির জলে চিতার আগুন নিভে যাওয়ার মহামায়া তার অর্ধদগ্ধ মুখমণ্ডল নিয়ে চলে আসে রাজীবের ঘরে। গল্পের প্রথম দু'টি পরিচ্ছেদে এটুকু কাহিনী বলার পর গল্প যখন তৃতীয় পরিচ্ছেদে এসে প্রবেশ করে তখন এই ছোটগল্পের চারদিকে এমন রাবীন্দ্রিক আভা বিকীর্ণ হয় যে তাতে এই সামাজিক নিষ্ঠুরতার ছবিমাত্র হয়ে ওঠে নি এই গল্প। এ কথার অর্থ এই নয় যে রবীন্দ্রনাথ নিষ্ঠুরতার দিক্‌টি আড়াল করে গেছেন। কৌলীন্য প্রথা, অন্তর্জলি ও সতীদাহ প্রথার যাবতীয় বীভৎসতা ও নির্মমতা দেখাতে তিনি চেষ্টার কোনও ত্রুটি করেন নি। তৃতীয় পরিচ্ছেদে এই গল্পে মৃত্যুর নিপুণ শিল্প রচিত হয়েছে। পুরাণ বর্ণিত কর্ণের মত সহজ কবচ-ধারী একাকিত্বের একটি রূপ দগ্ধমুখ মহামায়ার মধ্যে ফুটিয়ে তুললেন। এই একাকিত্ব মৃত্যুর ভয়ালভীষণ জগতেই সম্ভব। 'জীবিত ও মৃত' গল্পে জীবন ও মরণের সীমান্ত প্রদেশচারিণী কাদম্বিনীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিঃসঙ্গতার এক চিত্র এঁকে-ছিলেন। সেই চিত্রই এই গল্পে আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। জীবনের সঙ্গে মৃত্যু সহবাস করতে পারে না। জীবনে মিলিত, কিন্তু মৃত্যুর মধ্যে আমরা বিচ্ছিন্ন। তাই মহামায়া রাজীবের গৃহে থেকেও তার 'মর্মের গেহিনী' হতে পারে নি, তার মুখ ছিল চিরদিন অবগুণ্ঠিত, রাজীবকে দিয়ে সে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল—সে কোনওদিন তার মুখ দেখবে না, অপ্রাপ্য সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি হয়ে সে 'বিদেশিনী' হয়ে থাকবে রহস্যসিন্ধুর অগমতীরে যেখানে স্নিগ্ধ মরণ আছে, আছে শান্তি, আছে সুপ্তি তিমিরতলে। একদিন রাত্রে মহামায়ার পৃথক্ শয়নকক্ষে জ্যোৎস্নার আলো এসে তার মুখের উপর পড়েছে, তার অবগুণ্ঠন সরে গেছে। রাজীব তার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গিয়ে মহামায়ার মুখটি দেখে ফেলে। আর মহামায়া তা টের পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছেড়ে চিরদিনের মত বেরিয়ে পড়ে। তার এই নিঃসঙ্গ যাত্রার কথায় গল্প এসে শেষ হয়। গল্পের প্রথম দুই পরিচ্ছেদ অন্যের পক্ষে লেখা সম্ভব হলেও বাকিটা লেখা একমাত্র রবীন্দ্রনাথেরই সাজে।

হিন্দু সমাজের অনাচার অবিচার এই গল্পে মৃত্যুর কালো কালিতে এমনভাবে লেখা হয়েছে যা কোনওদিন মুছে যেতে পারে না। আজকে যখন সারা দেশ জুড়ে রূপকানোয়ারের সতী হওয়ার ঘটনা নিয়ে তুমুল আলোড়ন চলে, তখন আমাদের আরেকবার পড়ে নিতে হয় 'মহামায়া' গল্পটি। সতীদাহের মাহাত্ম্য ঘোষণায় মুখর ভাষার অভাব এদেশে এখনও হয় না—এ আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য। 'বিচিত্র প্রবন্ধ' বইটির 'মা ভৈঃ' রচনার উল্লেখ করে অনেকে বলেন যে রবীন্দ্রনাথও সতীদাহের গৌরব কীর্তন করেছেন। তাই এ প্রসঙ্গে এই রচনার অংশবিশেষ স্মরণ করতে পারি। সেখানে তিনি লিখেছেন যে আমাদের পিতামহীরা কখনও কখনও স্বেচ্ছায় স্বামীর সঙ্গে সহমরণে চিতায় উঠেছেন। বিদেশীরাও তাঁদের স্বেচ্ছামৃত্যুর সাক্ষ্য দিয়েছেন। এ কথা মনে রেখেই তিনি লিখেছেন, 'বাংলার সেই প্রাণ বিসর্জন-পরায়ণা পিতামহীকে আজ প্রণাম করি।'[১৩] এই বাক্যের অর্থ এই নয় যে তিনি পিতামহীদের শুধু স্বেচ্ছামৃত্যুর গৌরবই দেখেছেন। কেন না একই প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, 'আমাদের পিতামহীরা কেহ কেহ লোকলজ্জাতেও প্রাণ দিয়াছিলেন'। এই প্রবন্ধে তিনি পিতামহীদের মধ্যে যাঁরা পতিপ্রেমের আবেগে আত্মোৎসর্গ করতেন, তাঁদের মহিমার উপর জোর দিতে গিয়ে এমন ভাষায় লিখেছেন যাতে সতীদাহের মত কুসংস্কারের নিষ্ঠুরতার কথা

বলার সুযোগ তিনি হারিয়েছেন। মৃত্যুভয়হীনতার জয়ধ্বনি তোলা ছিল এই রচনার লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের কথা মনে রাখলে রবীন্দ্রনাথকে ভুল বোঝার অবকাশ কমে যায়, যদিও আমরা মেনে নিচ্ছি যে ভুল বোঝার কিছু সুযোগ তিনি এই রচনায় আমাদের দিয়েছেন। ১৮৯৩এ লেখা 'মহামায়া' গল্পটিতে ১৯০২এ লেখা 'মা ভৈঃ' প্রবন্ধের মত ভুল বোঝার কোনও অবকাশ বিন্দুমাত্র নেই।

'নামঞ্জুর গল্প' এবং 'সংস্কার' নামে আরেকটি গল্প গান্ধীজীর ডাকে যাঁরা অসহযোগ ব্রত পালনের জন্য বেরিয়ে এসেছিলেন, মুখে আওড়েছিলেন জাতিভেদ অস্বীকারের কথা, ধিক্কার হেনেছিলেন অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে, তাঁদের স্বদেশ-ব্রত যে কত মেকি ও ঠুনকো, সকলকে মানুষ হিসাবে সম-মর্যাদা দানের বলিষ্ঠ উচ্চারণের সঙ্গে আচরণের যে কত দুস্তর ব্যবধান—এ-সব কথাই তিনি খুব তাড়ার সঙ্গে বলেছেন। অমিয়ার মা জাতিতে ছিল কাহার। অমিয়ার জন্মবৃত্তান্ত যতদিন অনিল জানতে পারে নি, ততদিন তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছে। কিন্তু জানার সঙ্গে সঙ্গে সেই আকর্ষণ কর্পূরের মতো উবে গেছে। স্বদেশী করলেও অনিলের মনের উপর সংস্কার অচল বাধা হয়ে দাঁড়ায়। 'সংস্কার' গল্পটি যেন আরও তাড়াহুড়োয় শেষ হয়েছে। এখানেও একজন স্বদেশব্রতীর স্ত্রী মেথরকে অশুচি বলে জানে, অস্পৃশ্য বলে ভাবে। স্বামীর স্বদেশব্রতে সহধর্মিণী ও সহমর্মিণী হয়েও মেথরের প্রতি এমন অবজ্ঞায় তাঁর মনের নীচতা সম্পর্কে এক মুহূর্তের জন্যও ভাবনা জাগে না। এই গল্প দু'টি লেখার পর অনেক বছর কেটে গেলেও এখনও জন্মগত কারণে লোধা মেয়ে চুনি কোটালকে যখন আত্মহত্যা করতে হয়, তখন বলতে হয় যে এসব গল্প আজও প্রাসঙ্গিক। মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথই অস্পৃশ্যতাবিরোধী সহজ মানবিকতার নাটক রচেছেন 'চণ্ডালিকা'। তিনিই 'পুনশ্চ'র একাধিক কবিতায় মধ্যযুগের জাত-বিচার-না-মানা ভক্ত সাধকদের জীবনের আদর্শ রূপ দিয়েছেন, 'পত্রপুট' কাব্যের ১৫ সংখ্যক কবিতায় বলেছেন—'আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্র-হীন'। মধ্যযুগের ভক্ত সাধকদের সাধনায় হিন্দু-মুসলমান মিলনের মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল বলেই তাঁদের প্রতি কবির এমন গভীর শ্রদ্ধা। কবীরের ভারতপন্থায় তিনি একালের এক পথিক। বাংলার আউল বাউলদের আচারহীন জীবন, তাঁদের মনের মানুষের ভাবনাও একই কারণে তাঁকে শ্রদ্ধা-প্লুত করেছে। তিনি ধর্ম ও ধর্মতন্ত্রের পার্থক্য বিশ্লেষণ করে-ছিলেন 'কালান্তর' বইটির 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধে ১৯১৭তে। কিন্তু এই পার্থক্য সম্বন্ধে তিনি প্রথমাবধি অবহিত ছিলেন। 'বিসর্জন' নাটকের রঘুপতি ও 'মালিনী'র ক্ষেমঙ্কর চরিত্রে ধর্মতন্ত্রী মৌলবাদী ভাবনা রূপ দিয়েছিলেন সেই সুদূর যৌবনে। পুরোহিত ধর্মের নামে রাজশক্তি করায়ত্ত করতে চাইলে কী হতে পারে—অনেক কিছুর সঙ্গে এরও নাট্যরূপ দেখি 'বিসর্জনে'। রঘুপতির মিথ্যা ছলনার আশ্রয় নেওয়ায়ও বিবেক দংশন হয় নি। জয়সিংহ প্রশ্ন করছে 'সত্যিই কি রাজরক্ত চাই?' তার উত্তরে কালী প্রতিমার আড়াল থেকে রঘুপতি বলছে 'চাই', এভাবে বলছে, এ যেন দেবী কালীরই উত্তর। এ দেবীর নামে রঘুপতির মিথ্যাচার।

বারবার রবীন্দ্রসাহিত্যে ধর্মের নামে ধর্মতন্ত্র, সংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, মানবপ্রকৃতিকে অস্বীকার করার ঔদ্ধত্য, নিজ-ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান, পরধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা উদ্ঘাটিত হয়েছে। হিন্দুত্ব ও ভারতীয়ত্বের সমীকরণ তাঁর রচনায় একবার 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধটিতে ঘটলেও তাঁর অজস্র রচনায় বিভিন্ন ভাষাগত, নৃতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর বৈচিত্র্য স্বীকার করেই ভারতের মহাজাতির ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উপমার ভাষায় তিনি বলেছেন, ভারত ফুল, একটি কুঁড়ি নয়। কুঁড়ি হলে পাপড়িগুলি মিলেমিশে থাকত, এ হত অপরিণত অবস্থা। পাপড়িতে পাপড়িতে বিচ্ছেদেই ফুল ফোটে। তাই ভারতীয়দের বৈচিত্র্য ও পার্থক্য স্বীকার করেই মহাজাতিরূপে ঐক্যের ভাবনায় আত্মস্থ হতে হবে। 'বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য' বলতে 'স্টীমরোলার বুলাইয়া সমস্ত বৈচিত্র্যকে সমভূম সমতল' করার কথা তিনি ভাবেন নি। 'মিশনারিদের মতোই ভক্তী' তাঁর ছিল না, 'হিঁছুয়ানির মোল্লা মৌলবী'দের উপর তাঁর আস্থা ছিল না; তবুও হেমন্তবালা দেবীকে এ-সব কথার পরই লিখেছিলেন, 'গভীরভাবে আমি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি ভারতীয়'।[১৩] আমরা বলি, আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ভারতীয় কেন, অনেক হিন্দুর চেয়ে তিনি অনেক বেশি হিন্দু ছিলেন, যদিও হিন্দুত্বের ধ্বজাধারীরা তাঁকে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে ঢুকতে দেন নি! কেন 'দেবালয়ের মন্দিরদ্বারে' 'পূজাব্যবসায়ী' এই ব্রাত্যকে, এই মন্ত্রহীনকে ঠেকিয়ে রাখে? এ-প্রশ্নের উত্তর তাঁর ভাষায়ই শোনা যাক :—

'রামচন্দ্র প্রজারঞ্জন করতে গিয়ে সীতাকে বনবাস দিয়েছিলেন, প্রজারা জয় জয় করেছিল, সোনার সীতা

দিয়ে তিনি ক্ষতিপূরণ করতে চেয়েছিলেন। দশের মনোরঞ্জন করতে গিয়ে সত্যকে নির্বাসন দিতে পারতুম, তাহলে সান্ত্বনার প্রয়োজনে সোনার অভাব ঘটত না'![১৪] সোনার চেয়ে সত্য খাঁটি বলে তিনি মানতেন। হিন্দুত্বের ধ্বজা ওড়ালে সান্ত্বনার সোনালাভ হলেও তিনি ভারতীয়ত্বের সত্য থেকে ভ্রষ্ট হতেন।

সূত্র নির্দেশ :

১. Nationalism, Nationalism in India, Macmillan, 1976, p. 69 লেখককৃত অনুবাদ।
২. আত্মশক্তি, প্রসঙ্গ কথা, ২, জন্মশতবার্ষিক সং (প্রতিক্ষেত্রেই এই সংস্করণ উল্লিখিত হবে), ১২ খণ্ড, ৮৪৯ পৃ।
৩. চিঠিপত্র, ৯ খ, ১২১ নং চিঠি
৪. রাজা প্রজা, গদ্য ও পাদ্যে, ১২ খ, ৯৩৯ পৃ।
৫. ১২ খ, ৬৮২ পৃ।
৬. ১২ খ, ১২৩ পৃ।
৭. ১২ খ, ১৬৫-৬৬ পৃ।
৮. ঐ, ১৭৫ পৃ।
৯. ঐ, ১৭৯ পৃ।
১০. কিন্তু কী আশ্চর্য যে এই গল্প সম্পর্কে একজন বাঙালী মুসলমান সমালোচক রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন, এই গল্পে নাকি মুসলমান নারীর হিন্দু পুরুষের প্রতি এই আকর্ষণ দেখিয়ে লেখক মুসলমানদের অপমান করেছেন। ঠিক সামরিকপত্রের নাম পড়ছে না, সমালোচকের নামও মনে নেই, তবে এটুকু মনে আছে যে এ সমালোচনা মুসলিম লীগ আমলে অথবা বাংলার এক সমালো-চকের। এ-হেন মন্তব্য অনেককাল আগের পড়া। সমালোচকের অভিযোগ ছিল যে, হিন্দু পিতামহীর রক্তপ্রবাহে নবাব দুহিতার শরীরে ঢেউ তুলে তাঁকে দিয়ে ব্রাহ্মণ্য পাঠ ও ধর্মসাধনা করিয়ে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুর গৌরব কীর্তন করেছেন। এই জাতীয় আলোচনা নিছক সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি-প্রসূত, সাহিত্য ও শিল্পবোধ প্রবর্তিত নয়।
১১. 'কাহিনী'র অন্তর্ভুক্ত, ৩-৫ খণ্ড।
১২. ১৪ খণ্ড, ৭৩৯ পৃ।
১৩. চিঠিপত্র, ৯খ, ১২১ নং চিঠি।
১৪. চিঠিপত্র, ৯খ, ২০ নং চিঠি।

আমার গুরুর আসন কাছে

পিনাকী ভাদুড়ী

এই শতকের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঐ আশ্রম প্রতিষ্ঠা এবং তার দায়িত্ব গ্রহণই তাঁকে গুরুদেব হিসেবে পরিচিতি দিয়েছিল। আজও তাঁকে অনেকে গুরুদেব বলেই জানেন। এখনও অনেকে কোন আলোচনায় তাঁর কথা, তাঁর নাম উল্লেখ করতে হলে 'গুরুদেব' শব্দটাই ব্যবহার করে থাকেন। এগুলো সবই তাঁর আশ্রমজীবনের অবশ্যম্ভাবী ফল। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর এই পরিচিতিতে খুশি হতেন না বিরক্ত হতেন, আনন্দিত হতেন না লজ্জিত হতেন—তার কোন বিস্তারিত সরাসরি খবর আমরা জানিনা। আমাদের দেশের প্রাচীন রীতি যা ছিল তাতে আমরা শিক্ষককে 'গুরু' বলতাম। শিক্ষক পত্নীকে বলতাম 'গুরুমা'। শিক্ষক সপরিবারেই আমাদের কাছে গ্রহণীয় ছিলেন। এগুলো সবই যে খুব প্রাচীন রীতি এমন নয়, এই শতকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত এসবের অস্তিত্ব ছিল। বিশেষ করে শহর থেকে দূরে, দেশের প্রত্যন্ত প্রদেশে যেসব বিদ্যালয় ছিল, তাদের মধ্যে শিক্ষক ছাত্রের এই ঘনিষ্ঠ এবং সম্ভ্রমপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকত। শিক্ষকের তখন অন্ন সংস্থান করা দুরূহ হত বটে, তথাপি ছাত্রের সঙ্গে প্রায় পারিবারিক পরিচয়, সম্প্রীতি ইত্যাদিতে ঘাটতি পড়ত না। ছাত্রের কাছে তিনি শুধু পাঠক্রমের সহায়ক নন, তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রারও একজন সঙ্গী—ফ্রেণ্ড, ফিলজফার এ্যাণ্ড গাইড।

রবীন্দ্রনাথও তাই ছিলেন। তিনি ত শুধুমাত্র পাশ করাবার জন্য বিদ্যালয় গড়েননি, তাঁর লক্ষ্য ছিল ছাত্রদের আনন্দের সন্ধান দেওয়া। সেজন্য তিনি নিজেকে কখনও 'গুরু' বলে ভাবতেন না। অথচ তখনকার সামাজিক পরিস্থিতিতে নিজের গুরুদেব পরিচয়টি এড়িয়ে যেতেও পারেননি। তবু স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে গেছেন যে এই বিদ্যালয়ে তিনি ছাত্রছাত্রীদের বন্ধু মাত্র, তার বেশি কিছু নন। 'আত্মপরিচয়ে'র ৪নং প্রবন্ধে বলেছেন—

এই আশ্রমের কর্মের মধ্যেও যেটুকু প্রকাশের দিক তাই আমার ···মানুষের আত্মপ্রকাশের ইচ্ছাকে আমি রূপ দিতে চেয়েছিলাম। সেইজন্যই তার রূপভূমিকার উদ্দেশে একটি তপোবন খুঁজেছি। নগরের ইটকাঠের মধ্যে নয়, এই নীলাকাশ উদয়াস্তের প্রাঙ্গণে এই সুকুমার বালক বালিকাদের লীলাসহচর হতে চেয়েছিলাম।··· এখানে আমি শিশুদের যে ক্লাস করেছি সেটা গৌণ। প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে শিশুদের সুকুমার জীবনের এই যে প্রথম আরম্ভরূপ, এদের জ্ঞানের অধ্যবসায়ের আদি সূচনায় যে উষারুণদীপ্তি, যে নবোদ্গত উদ্যমের অঙ্কুর, তাকেই অবারিত করবার জন্য আমার প্রয়াস—না হলে আইনকানুন সিলেবাসের জঞ্জাল নিয়ে মরতে হতো।··· লীলাময়ের লীলার ছন্দ মিলিয়ে এই শিশুদের নাচিয়ে গাইয়ে, কখনো ছুটি দিয়ে, এদের চিত্তকে আনন্দে উদ্‌বোধিত করার চেষ্টাতেই আমার আনন্দ, আমার সার্থকতা।··· শঙ্খঘণ্টা বাজিয়ে যাঁরা আমাকে উচ্চ আসনে বসাতে চান, তাঁদের আমি বলি, আমি নিচেকার স্থান নিয়েই জন্মেছি, প্রবীণের প্রধানের আসন থেকে খেলার ওস্তাদ আমাকে ছুটি দিয়েছেন। এই ধুলোমাটি ঘাসের মধ্যে আমি হৃদয় ঢেলে দিয়ে গেলাম, বনস্পতি ওষধির মধ্যে যারা মাটির কোলের কাছে আছে, যারা মাটির হাতে মানুষ, যারা মাটিতেই হাঁটতে আরম্ভ করে শেষকালে মাটিতেই বিশ্রাম করে, আমি তাঁদের সকলের বন্ধু, আমি কবি।

'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'র দুটি দিনের ডায়ারি দেখলেও কবির মনোভঙ্গিটা বোঝা যায়—

কেউ বললে 'নেতা হও', কেউ বললে, 'উপদেশ দাও'। আবার কেউ বললে, 'দেশটাকে মাটি করতে বসেছ'। অর্থাৎ স্বীকার করলে দেশটাকে মাটি করে দেবার মতো অসামান্য ক্ষমতা আমার আছে।

—৫ই অক্টোবর, ১৯২৪

একদা পদ্মার ধারে আকাশের পারে সংসারের পথে যারা আমার সঙ্গী ছিল তারা বলছে···তোমার খ্যাতি

তোমাকে না টানুক, তোমার কীর্তি তোমাকে না বাঁধুক···লোকের ডাকাডাকি শুনোনা···যাবার বেলায় কবুল করে যাও যে তুমি কোনো কাজের নও, তুমি অস্থায়ীদের দলে।

—৭ই অক্টোবর, ১৯২৪

রবীন্দ্রনাথের মনের গতিটা কোনদিকে, কোথায় তাঁর স্বস্তি, সেটা বেশ স্পষ্ট এই দুটি উদ্ধৃতির মধ্যে। যতই তাঁকে গুরুদেব বলা হোক, অথবা তাঁর কাছে নির্দেশ চাওয়া হোক, তিনি নিজে মানুষের সঙ্গী হতে পারার মধ্যেই নিজের সার্থকতা খুঁজে পেতেন।

রবীন্দ্রনাথ নিজে গুরুবাদকে কোন্ চোখে দেখতেন তার পরিচয় তাঁর রচনার মধ্যে বিক্ষুতভাবে ছড়ানো আছে। গুরুবাদ বলতে জীবনের সব রকম দিকের গুরুকেই তিনি বুঝতেন। ধর্মগুরু হোক, রাজনৈতিক গুরু হোক—অর্থাৎ যেখানেই আমরা পরের ক্ষমতার কাছে আত্মসমর্পণ করি, কবি সে সমস্ত দিকের কথাই বলেছেন। বিদ্রূপ করেছেন, নিন্দা করেছেন, যুক্তি দিয়েছেন। সারাজীবন অবুদ্ধির বিরুদ্ধে লড়েছেন তিনি। সেইজন্যই 'গুরু' নামক Panacea-কে আক্রমণ করেছেন বারবার। নিজেকে তিনি গুরুর আসনে বসাতে চান নি, তিনি চেয়েছেন সবার সহচর হতে এবং সেটি খেলার সহচর। জীবনের মধ্যে খেলার আনন্দ ভরে দেওয়াই ছিল তাঁর অন্যতম লক্ষ্য।

একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাব আমাদের, অর্থাৎ তাঁর স্বদেশীয় চরিত্রের ঠিক বিপরীত। আমরা স্বভাবতই কোনও একজন গুরুকে আশ্রয় করতে চাই, যিনি আমাদের সমস্ত ভার নিজের কাঁধে নিয়ে নেবেন। তিনিই বিতরণ করবেন বিপদ-মুক্তির মন্ত্র, যা উচ্চারণ করলেই আমাদের মিলবে মুক্তি বা মোক্ষ। আমাদের বুদ্ধি, আমাদের বিবেচনা সমস্তই আমরা বাঁধা রাখতে চাই 'গুরু' নামক এক অলৌকিক শক্তির অধিকারীর কাছে যিনি সর্বশক্তিমানের প্রতিনিধি। আমাদের পরমপ্রিয় শ্লোক হল 'সর্বধর্মং পরিত্যাজ্য, মামেকং শরণং ব্রজ', অথবা 'এতৎ কর্মফলং শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু—সংস্কৃত না জেনেও এই বাণী আমাদের জপমন্ত্র হয়েছে অনায়াসে। আমাদের সব কর্মফল—বিশেষ করে অকর্ম বা কুকর্ম—আমরা নিবেদন করি গুরুকে। তিনি নীলকণ্ঠের মত সেসব গ্রহণ করবেন, অথবা শোধন করে দেবেন, আমরা বিপমুক্ত হব। শুধু তাই নয়, আমাদের উন্নতি হবে। আমার মনে আছে, রবীন্দ্রনাথের 'বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহেমোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়'—এই গানটি শুনে কোনও বৃদ্ধাকে বলতে শুনেছি—'কি আস্পর্ধা!' এক কথায় রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সমাজের পক্ষে নতুন, এবং অসহ্য। তবু তিনি সারাজীবন দেশের এই নির্বুদ্ধিতাকে পরিষ্কার ভাষায় নিন্দা এবং ব্যঙ্গ করে গিয়েছেন। আমরা যথারীতি তাঁর সেই যুক্তিবাদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করিনি। রবীন্দ্রনাথকে উপনিষদ লালিত বলতেই ভাল লাগে আমাদের, কারণ তাতে তাঁকেই আরেকজন গুরু বানিয়ে নেওয়া চলে। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত মূর্তি আমাদের ততটা আকর্ষণ করে না। তাঁকে অন্যদিক দিয়ে যেমন, এইদিক দিয়েও তেমনই আমরা ব্যর্থ নমস্কারে ফিরিয়ে দিয়েছি। কারণ আমরা সকলেই রামকৃষ্ণ কথিত জনসাধারণ, যারা গুরু নামক ভেলা আশ্রয় করে ভবনদী পার হতে চাই বিনা মেহনতে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটক পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। নাটক যেহেতু প্রধানতঃ দৃশ্যবস্তু, সুতরাং মনে করা চলে যে তাঁর কোনও কোনও চিন্তাকে তিনি সরাসরি চোখের সামনে ঘটিয়ে তুলতে চাইছেন।

'অচলায়তন' নাটকে খুব স্পষ্টভাবে রবীন্দ্রনাথ আমাদের অন্ধ বুদ্ধি, প্রথার জড়তাকে আক্রমণ করেছেন। যেসব নিয়মকানুন আমরা বিচার না করেই মেনে থাকি, তার বিরুদ্ধেই তাঁর ব্যঙ্গ। ধর্মের নামে, আধ্যাত্মিকতার পোষাকে এই সব আচারের আবর্তন আমাদের বিচারবুদ্ধিকে বিকশিত হতে দেয় না। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ সমাজের মধ্যে চলিত কিছু বিধির নাম করেছেন, যাদের ভিতরে সমাজের নির্বুদ্ধিতাই প্রকাশিত। সেই সব নাম ঠিক বানিয়েছেন কবি এমন নয়—ঐ ধরনের বিধি বা মন্ত্র বাস্তবেও ছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal বইটিতে ঐসব মন্ত্রের উল্লেখ আছে। এই নাটকে সকলেই ঐসব প্রথা মেনে চলে, শুধু পঞ্চক ছাড়া—

পঞ্চক—দেখেছি বইকি! ও মাসে শনিবারে যেদিন মহাময়ুরী দেবীর পূজা পড়ল সেদিন আমি কাঁসার থালায় ইঁদুরের গর্তের মাটি রেখে তার উপর পাঁচটা শেয়াল কাঁটার পাতা আর তিনটে মাষকলাই সাজিয়ে নিজে আঠারো বার ফুঁ দিয়েছি।

সকলে—এ্যাঁ! কি ভয়ানক! আঠারো বার।

সুভদ্র—পঞ্চকদাদা, তোমার কি হল?

পঞ্চক—তিনদিনের দিনে যে সাপটা এসে আমাকে নিশ্চয় কামড়াবে কথা ছিল সে আজ পর্যন্ত আমাকে খুঁজে বের করতে পারেনি।

ব্যঙ্গটা পরিষ্কার। এই নাটকেই শোনপাংশু নামে যে clan-টিকে কবি দেখিয়েছেন, তারা অনেক সহজ জীবন যাপন করে। তাদের কোন প্রথার অন্ধতা নেই—চাষ করে, গান করে, আনন্দ করে তারা জীবন কাটায়। পঞ্চককে তারা যখন বলে যে ঐ অচলায়তনের গুরু কেমন তা তারা দেখতে চায়, তখন পঞ্চক শিউরে ওঠে।

পঞ্চক—তোরা দেখবি কি রে। সর্বনাশ। তিনি তো শোনপাংশুদের গুরু নন।···তোদেরও তো গুরু আছে, তাকে নিয়েই—

শোনপাংশু—গুরু! আমাদের আবার গুরু কোথায়!

···এ পর্যন্ত আমরা তো কোনো গুরুকে মানিনি।

ঐ সহজ সরল মানুষগুলো নিজেরাই জীবনযাপন করতে পারে, আর এদিকে এই অচলায়তনের পণ্ডিতরা নিজেদের জীবন কেমন সদাসশঙ্ক এবং জটিল করে রাখে, তার পরিচয় আছে এই নাটকে সুভদ্র নামক এক কিশোরের কাজের মধ্যে।

সুভদ্র—আমি পাপ করেছি।

পঞ্চক—কি পাপ?

সুভদ্র—ভয়ানক পাপ।

···আমি আমাদের উত্তর দিকের জানলা খুলে বাইরেটা দেখে ফেলেছি।

পঞ্চক—শুনে লোভ হচ্ছে যে!·····

প্রথম বালক—মহাপঞ্চকদাদা বলে দিয়েছেন, ওতে মাতৃহত্যার পাপ হয়, কেননা উত্তর দিকটা যে একজটা দেবীর।

পঞ্চক—মাতৃহত্যা করলুম না, অথচ মাতৃহত্যার পাপটা করলুম, সেই মজাটা কিরকম দেখতে আমার ভয়ানক কৌতূহল।—

সেইজন্যই সুভদ্র যখন বলে, 'আমার কি হবে', পঞ্চক তখন তাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'তোমার জয় জয়কার হবে সুভদ্র। তিনশো পঁয়তাল্লিশ বছরের আগল তুমি ঘুচিয়েছ।'

পঞ্চকের চরিত্রটি স্পষ্ট। সে এই বুদ্ধির জড়তা থেকে মুক্ত। কিন্তু সুভদ্রের এই কর্মের পরে অচলায়তনের আচার্যের কণ্ঠে যা ধ্বনিত হয় তাতে তাঁর হৃদয়ের দ্বিধাটুকু বেরিয়ে আসে—'ওরে পণ্ডিত, সব শাস্ত্রই তো পড়া হল, সব ব্রতই তো পালন করলি, এখন বল মূর্খ, কী পেয়েছিস। কিছু না, কিছু না।···আজ দেখছি—এই অতিদীর্ঘকালের সাধনা কেবল আপনাকেই আপনি প্রদক্ষিণ করেছে—কেবল প্রতিদিনের অন্তহীন পুনরাবৃত্তি রাশীকৃত হয়ে জমে উঠেছে।'

এর পরে যে গুরু এসে পৌছন অচলায়তনে, তিনি আদেশ করেন না, জপের মন্ত্র দেন না, তিনি বলেন—'আমি তোমাদের সঙ্গে খেলব। নইলে তোমাদের গুরু হয়ে সুখ কিসের।'

এই নাটকের 'গুরু' নামে একটি অভিনয়যোগ্য রূপ দিয়েছিলেন কবি, তার মধ্যেও গুরুর ঐ খেলার নিমন্ত্রণ। উত্তর দিকের জানলা খুলে যে একজটা দেবীর কোপে পড়ার ভয় হয়েছিল, তার সম্বন্ধে গুরু বলছেন—'একজটা দেবী! উত্তর দিকের দেয়ালটা ভাঙবামাত্রই তার সঙ্গে এমন মিল হয়ে গেল যে আর কোন দিন জটা দুলিয়ে কাউকে ভয় দেখাবে না। এখন তাকে দেখলে মনে হবে সে আকাশের আলো—'। আলো এসে পড়েছে অন্ধ মনের মধ্যে। গুরু বলতে যেখানে ঐ আয়তনের বাসিন্দারা বুঝত যুক্তিহীন নিয়মতান্ত্রিকতার ধারককে—কবি সেখানে গুরুকে খেলার সাথী করে নিলেন।

এই নাটকে মানুষের জীবনে প্রথার আনুগত্যের যে নিন্দা করলেন রবীন্দ্রনাথ—তারই সম্প্রসারিত এবং পরিণত রূপ হল 'রক্তকরবী।' এই নাটকে মানুষের লোভ কেমন করে মানুষকে মারে তার ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে সেই মারকে কেমন প্রচ্ছন্ন করে দেওয়া যায়—তার পরিচয় হিসেবে ধর্মগুরুর কাছে মানুষের আচ্ছন্নতার একটা রূপ দেখানো হয়েছে।

তবে তার আগে আমরা দুটো নাটিকার কথা বলে নেব যাতে এই গুরুবাদ সরাসরি নিন্দিত হবার যোগ্য সাজ পরেই আসে। প্রথম নাটিকাটির নাম 'মুক্তির উপায়'। এ নাটিকাটিতে সেই গুরুদের কথাই বলা হয়েছে যারা ভক্তদের ঠকিয়ে সম্পদ আহরণ করে। এটি একটু মোটা দাগের নাটক। তথাপি এটি কোন একদিক দিয়ে আমাদের গুরুবাদী নিয়তিকে প্রকাশ করে। একটু উদাহরণ দেওয়া যাক।

গুরু—কি গো বিপিন, প্রস্তুত তো? যেমন বলেছিলুম, কাল তো সারারাত জপ করেছিলে—সোনা মিথ্যে, সোনা মিথ্যে, সব ছাই, সব ছাই?

বিপিন—জপেছি। মোহরটা যেন আরো তারার

মত জল জল করতে লাগল মনের মধ্যে। প্রভু আমি পাপিষ্ঠ, আরো কিছুদিন সময় দাও।

গুরু—এই রে! মোলো দেখছি! সর্বনাশ হল। দিতে এসে ফিরিয়ে নেওয়া, এ যে গুরুর ধন চুরি করা (ঝুলি এগিয়ে) ক্যাল ক্যাল বলছি, এখ্‌খনি ক্যাল্।···

পুষ্প—ওঁর বাবা পুলিসে খবর দিয়েছেন, তাঁর হার চুরি গেছে।

গুরু—কি সর্বনাশ!

পুষ্প—কোনো ভয় নেই, এখ্‌খনি সোনাগুলোকে ভস্ম করে ফেলুন, পুলিসের উপর সেটা প্রকাণ্ড একটা কানমলা হবে।···

গুরু—পালাব কোথায়। ওরা যে আমার ঠিকানা জানে।

উদ্ধৃতির আর প্রয়োজন নেই। আমাদের বুদ্ধিহীনতার সুযোগ নিয়ে কতজন যে গুরুর ভেক ধরে শিষ্যদের লুণ্ঠন করে তা বোঝা গেল। কবি একটি চিঠিতেও বলেছেন, অনেকে সন্ন্যাসী সাজে অর্থের প্রত্যাশায়।

অন্য নাটিকাটি হল 'গুরুবাক্য'।

'হাস্যকৌতুক'-এর অন্তর্গত। এর উদাহরণ নেওয়া যাক।

বদন—গুরুদেব, কাল মশারি ঝাড়তে ঝাড়তে মনে একটা প্রশ্ন উদয় হয়েছে।

শিরোমণি—প্রকাশ করে বলো।

বদন—বিহগরাজ জটায়ু রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে কেন নিহত হলেন? আমাদের খগেন্দ্রবাবু বলছিলেন অস্ত্রাঘাতই তার কারণ।

শিরোমণি—বটে! হাঃ হাঃ আধুনিক কালেজের ছেলের মতই উত্তর হয়েছে। শাস্ত্রচর্চা ছেড়ে বিজ্ঞান পড়ার ফলই এই·····

আচ্ছা বাপু খগেন্দ্র, তুমি তো অনেকগুলি পাশ দিয়েছ, তুমিই বলো তো, অস্ত্রাঘাতেই বা জটায়ুর মৃত্যু হল কেন, রক্তপিত্ত রোগেই বা মরে না কেন?···অত কথায় কাজ কি, জটায়ুই বা মরে কেন, রাবণ মলেই বা ক্ষতি কি ছিল?···প্রথমে দেখতে হবে 'রাবণে'রই সঙ্গে বা যুদ্ধ হয় কেন, তার পরে দেখতে হবে রাবণের সঙ্গে 'যুদ্ধ'ই বা হয় কেন, তার পরে দেখতে হবে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে 'জটায়ু'ই বা মরে কেন, সব শেষে দেখতে হবে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে জটায়ু 'মরে'ই বা কেন?·····

প্রথম প্রশ্নের উত্তর, নিয়তি: কেন বাধ্যতে।

বদন—আঃ বাঁচলুম, এছাড়া আর কোন উত্তর হতেই পারে না।

সমস্তটাই ব্যঙ্গ এবং বিদ্রূপে ভরা। একদিকে গুরুর দার্শনিকতার মুখোস, অপরদিকে শিষ্যদের মূর্খতা।

এবার ফিরে আসি 'রক্তকরবী' প্রসঙ্গে।

'রক্তকরবী' নাটকে এই বিষয়টিকে যেভাবে দেখানো হয়েছে তাতে ধরা পড়ে যে সমাজে অত্যাচারকে প্রতিষ্ঠার জন্য কীভাবে আধ্যাত্মিক গুরুর সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। এ ধরনের গুরু প্রশ্রয় পায় সামাজিক অন্ধতার জন্যই। তবে এ নাটকে তার প্রতিবাদও দেখানো হয়েছে। একটু উদাহরণ নেওয়া যাক।

সর্দার—নাতনী, একটা সুখবর আছে। এদের ভালো-কথা শোনাবার জন্য কেনারাম গোঁসাইকে আনিয়ে রেখেছি। এদের কাছ থেকে প্রণামী আদায় করে খরচটা উঠে যাবে। গোঁসাইজির কাছ থেকে রোজ সন্ধেবেলায় এরা—

ফাগুলাল—না না, সে হবে না সর্দারজি। এখন সন্ধে বেলায় মদ খেয়ে বড়ো জোর মাতালামি করি, উপদেশ শোনাতে এলে নরহত্যা ঘটবে।···

সর্দার—এই যে·····প্রভু প্রণাম। আমাদের এই কারিগরদের দুর্বল মন, মাঝে মাঝে অশান্ত হয়ে ওঠে। এদের কানে একটু শান্তিমন্ত্র দেবেন—ভারি দরকার।

গোঁসাই—এই এদের কথা বলছ? আহা এরা তো স্বয়ং কূর্ম-অবতার। বোঝার নিচে নিজেকে চাপা দিয়েছে বলেই সংসারটা টিঁকে আছে···আশীর্বাদ করি সর্বদাই অবিচলিত থাকো, তাহলেই ঠাকুরের দয়াও তোমাদের পরে অবিচলিত থাকবে। বাবা, একবার কণ্ঠ খুলে বলো 'হরি হরি'।···

ফাগুলাল—এতক্ষণ অবিচলিত ছিলুম, কিন্তু আর তো পারিনে। সর্দার, এত বড়ো অপব্যয় কিসের জন্য। প্রণামী আদায় করতে চাও রাজি আছি, কিন্তু ভণ্ডামি সইব না।···

গোঁসাই—যাই বল সর্দার। এদের আমরা শেখাব কি, এরাই আমাদের শিক্ষা দেবে।···

আরো কটা মাস পাড়ায় ফৌজ রাখা ভাল। কেননা,

নাহংকারাৎ পরো রিপু। কৌজের চাপে অহংকারটার দমন হয়।…

এই নাটকেই যখন সর্দারের আঘাতে গজ্জু মৃতপ্রায় হয়ে, টলতে টলতে চলেছে, তখন নন্দিনী ব্যাকুল হয়ে বলছে—

নন্দিনী—অধ্যাপক, ওকে ধরো তুমি, দুজনে মিলে আমাদের বাসায় নিয়ে যাই।

অধ্যাপক—সাহস করিনে নন্দিনী। এখানকার নিয়মমতে তাতে অপরাধ হবে।

নন্দিনী—মানুষইাকে মরতে দিলে অপরাধ হবে না?

অধ্যাপক—যে অপরাধের শাস্তি দেবার কেউ নেই, সেটা পাপ হতে পারে, কিন্তু অপরাধ নয়।

'অপরাধ' এবং 'পাপ' রবীন্দ্রনাথ এ দুয়ের পার্থক্য নির্ণয় করেছেন এবং এ দুয়ের সংজ্ঞাটি অভিনব—পাপের কথা বলে আমাদের যে ধাক্কা দেওয়া হয় সেইটিই বলা হল।

আর একটি উদাহরণ—

রাজা (নেপথ্যে)—পুজোয় যাবার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে থেকো না। বিপদ ঘটবে।

নন্দিনী—দেবতার সময়ের অভাব নেই, পুজোর জন্য যুগ যুগান্তর অপেক্ষা করতে পারেন। মানুষের দুঃখ মানুষের নাগাল চায় যে। তার সময় অল্প।

দেবতাকে ছেড়ে, ধর্মগুরুকে ছেড়ে রবীন্দ্রনাথ মানুষের মধ্যে চলে আসছেন।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে শচীশ নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। খুঁজে ফিরেছে শান্তি। লীলানন্দস্বামী তার এক সময়ের গুরু। সেই গুরুর প্রতি কাজেই দামিনীর প্রতিবাদ ঝলসে ওঠে। এই ভক্তিরস যে কাউকে মুক্তি দেবে না, এই কথাই বলেছে দামিনী। বলেছে শ্রীবিলাসও। যেদিন নবীনের স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি অভিমানে বিষ খেল, সেদিন দামিনী স্পষ্ট ভাষায় গর্জে উঠল। নবীন ওই গুরুজির একজন কীর্তনিয়া। ঐ গানের অবসরে সে তার স্ত্রীর বোনের প্রতি আসক্ত হল এবং স্ত্রীর কথায় সেই বিয়েও করে নিল। তারপরেই ঐ আত্মহত্যা। তখন দামিনী শচীশকে ডেকে বলল, 'আমাকে বুঝাইয়া দাও তোমরা দিনরাত যা লইয়া আছ তাহাতে পৃথিবীর কী প্রয়োজন। তোমরা কাকে বাঁচাইতে পারিলে!' প্রায় চাবুকের মত এসে পড়ে দামিনীর কণ্ঠস্বর। যে রসসাধনায় শচীশ তার গুরুর কথায় ডুবেছে, তাঁর ভয়ংকর ছবি আজ দেখা গেল। এই সঙ্গে মনে পড়ে যায় হেমন্তবালা দেবীকে ২১শে এপ্রিল ১৯৩১ সালে লেখা কবির চিঠি—'রসের সাধনার অনেকটাই সেই ফেনা, সেই বাষ্পোচ্ছ্বাস—যাঁর সামনে ধরি তাঁকেও ফাঁকি দিই, নিজেকেও।'

দীর্ঘকাল ধরে রবীন্দ্রনাথ হেমন্তবালা দেবীকে যে সব চিঠি লিখেছিলেন, সেই পত্রধারার মধ্যে এই ধর্মগুরু অথবা আধ্যাত্মিক মোহের বিষয়ে তিনি মতামত বিস্তারিতভাবে দিয়েছিলেন। সেগুলো লক্ষ করলেও আমরা এ ব্যাপারে একটা সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছব। চিঠির সংখ্যা অনেক, আমরা কয়েকটি অংশ বেছে নিচ্ছি—

আমার দেবতা মানুষের বাইরে নেই।…আমাদের দেশে ধার্মিকতার দ্বারা মানুষ এত অত্যন্ত অবজাত।…মানুষার মন্দিরে, কত লক্ষ লক্ষ লোকের দৈন্য অজ্ঞান অস্বাস্থ্য ঐ সব গহনার মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। (১২ এপ্রিল, ১৯৩১)

বাংলাদেশে…হৃদয়াবেগের মধ্যে তলিয়ে যাওয়াকেই সাধনার সার্থকতা মনে করি। একে আধ্যাত্মিক বিলাস বলা যেতে পারে। (১৭ এপ্রিল ১৯৩১)

গুরুকে আমি প্রতীক শ্রেণীতে ফেলিনে। (২৩ এপ্রিল, ১৯৩১)

গুরুমশায় আর গুরু একজাতের নয়। গুরু যাঁরা তাঁরা স্বভাবসিদ্ধ গুরু—আর গুরুমশাই সেই, যে চোখ রাঙিয়ে টেঁড়ে চড়ে গুরুগিরি করে। আমি উক্ত দুই জাতেরি বার। (৩০ এপ্রিল, ১৯৩১)

মানুষের প্রতি মানুষের এত নিরোৎসুক্য, এত ঔদাসীন্য অন্য কোনো দেশেই নেই, এর প্রধান কারণ এই যে, এদেশে হতভাগা মানুষের সমস্ত প্রাপ্য দেবতা নিচ্ছেন হরণ করে। (১৪ জুন, ১৯৩১)

য়ুরোপে এখন অনেক নাস্তিক আছেন যাঁরা বিশ্বমানবের উপলব্ধির দ্বারা তাঁদের কর্মকে মহৎ করে তোলেন…তাঁরা যথার্থ ভক্ত। যাঁরা আচারে অনুষ্ঠানে সারা জীবন শুচি হয়ে কাটালেন, তাঁরা তো নিজেরই পুজো করলেন—তাঁদের শুচিতা তাঁদেরই আপনার,… আর মুক্তি বলে যদি কিছু পান তবে সেটা তো তাঁদেরই পারলৌকিক কোম্পানীর কাগজ। (২৭ জুন, ১৯৩১)

বোষ্টমী অনেকখানিই সত্যি। (২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১)

যে গল্পটার কথা কবি বলছেন তার মধ্যে গুরু নামক মানুষটির নির্মায়িক মোহকে দেখিয়েছিলেন।

এ দেশেও আমার ভক্ত আছে, কিন্তু তাদের কাছ থেকে আমি পুজা চাইনে। যদি সত্যিই চাইতুম তাহলে এই ধর্মমুগ্ধ দেশে অবতার হয়ে ওঠা আমার পক্ষে শক্ত হত না। (২১ অক্টোবর, ১৯৩১)

আমরা যে কেবল মঙ্গল গ্রহের দিকেই সভয়ে তাকিয়ে আছি তা নয়—শীতলা আছেন, ওলাবিবি আছেন… এমন দেশে বিধাতার দান বুদ্ধিটাই কি যত অপরাধ করলে! সে ছাড়া আর সব কিছুর জন্যই পুজা মিলবে! (৮ নভেম্বর, ১৯৩১)

যে দেবতা বুদ্ধির দোহাই মানেন না দয়ার দোহাইও না তাঁকে যে মানুষ ভয়ে ভয়ে মানে সে নিজেকে অমানুষ করে। (১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২)

গুরু সম্বন্ধে, এবং ধর্মবোধের বিকৃতি সম্বন্ধে কবির ধারণা এই পত্রাংশগুলিতে স্পষ্ট। তিনি নিজে যে গুরু হতে চাননি, অথচ তাঁকে আশ্রম-সুবাদে গুরু বানানো হয়েছে, এ ব্যাপারে দুঃখ করে তিনি অজিতকুমার চক্রবর্তীকে যে চিঠি লেখেন, তার অংশ উদ্ধৃত করি—

জগতে যদি আমার কোনো সত্যকার স্থান থাকে তবে সে কবি হিসেবে—গুরু হিসেবে একেবারেই না। অথচ কেমন একটা দুর্বিপাকে আমাকে তোমরা পাঁচজনে মিলে একটা গুরুর আসন দিয়েছ—এটাকে আমি কোনোমতেই ঠিকভাবে অধিকার করতে পারচিনে—বার বার কুণ্ঠিত হই—আপত্তি করেও কোনো ফল পাইনে।

এ চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে যে কবি ঐ 'গুরুদেব' সম্বোধনটায় আপত্তি করেছেন, কেউ মানেননি। এখনও অনেকে ঐ সম্বোধনটা কবি সম্বন্ধে ব্যবহার করে থাকেন—অর্থাৎ রবীন্দ্র-সান্নিধ্য তাঁদের পক্ষে সার্থক হয়নি। কবির নিজের আপত্তিই তাঁরা গ্রাহ্য করেন না।

তবু রবীন্দ্রনাথ যে গুরু বা সাধক হয়ে যাননি, তার কারণ তাঁর কবি ধর্মই তাঁকে সংযত এবং রক্ষা করেছে।

এই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের উল্লেখ করতে হয়। মানুষকে ছাড়িয়ে কোন অতিমানবত্বকে তিনি মানেননি। গুরু বলতে আমরা যা বুঝি, তা সেই মানবোত্তর কোনও সত্তার প্রতিনিধি। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বলেছেন, আমার বুদ্ধি মানববুদ্ধি, আমার হৃদয় মানবহৃদয়, আমার কল্পনা মানবকল্পনা।…কোনো অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি কেউ বলেন, তবে সে কথা বোঝবার শক্তি আমার নেই।'

'শিশুতীর্থ' কবিতায় যে ধর্মব্যবসায়ীদের কথা বলেছেন, অনেক সময়েই আমরা তাদেরই গুরু বলে মানি—দেবতাকে বিক্রয় করাই যাদের জীবিকা, নিজের লোভকে মহৎ নাম ও বৃহৎ মূল্য দিয়ে ব্যাখ্যা করে থাকে তারা। এই ধরনের অমুক বাবা তমুক ব্রহ্মচারীর পায়ে আমরা নিজেদের বিসর্জন দিয়ে থাকি।

শুধু আধ্যাত্মিক নয়, আমরা রাজনৈতিক গুরুও চাই। যিনি আমাদের সমস্যার সমাধান করে দেবেন, স্বরাজ এনে দেবেন অথচ যার জন্য আমাদের কোন প্রস্তুতি নিতে হবে না। দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ওঠাপড়ার সময়ে রবীন্দ্রনাথ বারে বারে ঐ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। মহাত্মা গান্ধীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম, তথাপি যেখানে তিনি মতে মিলতে পারেননি, সেকথা একলা দাঁড়িয়ে পরিষ্কার উচ্চারণ করতে দ্বিধা করেননি। 'একলা চল রে' এ গানটি গান্ধীজির প্রিয় ছিল, কিন্তু কবির জীবনে বারে বারে এই গানকে প্রয়োগ করতে হয়েছে। বলেছেন, 'আমাদের দেশে একদল সন্ন্যাসী গাঁজা খেয়ে বুদ্ধিকে বিহ্বল করে। সেটা তাদের আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গস্বরূপ। বুদ্ধিকে তারা বিশ্বাস করে না।' এই ঘটনাই রাজনৈতিক গুরুরাই ঘটিয়ে থাকেন। 'দলে দলে পোলিটিকাল গুরুদের ধর্ষর্ধর চেলারা সম্পূর্ণ হতবুদ্ধিতার তপস্যায় আজ প্রবৃত্ত।… তাতে মস্তিষ্ককে, হৃদয়কে, আত্মসম্মানকে পরকৃতপীড়নে দলে দলে করেছে পক্ষাঘাতগ্রস্ত।' বুদ্ধির পঙ্গুতার উপর নির্ভর করে একদিন আমাদের দেশে উচ্চবর্ণের মানুষ নিম্নবর্ণের মানুষদের উপরে হুকুম জারি করেছিল, 'মেনে চলবে ভেবে চলবে না।' রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'পৃথিবীতে সেই প্রথম ফ্যাসিস্ট প্রবর্তনা।'

স্বরাজসাধনা নিয়ে কবির অনুদের সঙ্গে চিন্তার পার্থক্য ঐ বুদ্ধির উপরে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল। কেবল ইংরেজ তাড়ানো বা সুতো কাটা নয়—স্বাধীনতার অর্থ দেশকে সৃজন করা। আমাদের রাজনৈতিক নেতারা সে বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন না। তাই আজ স্বাধীনতার এই দুঃস্থ মূর্তি। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'সম্মিলিত আত্মকর্তৃত্বের চর্চা, তার পরিচয়, তার সম্বন্ধে গৌরববোধ জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত

হলে তবেই সেই পাকা ভিত্তির উপর স্বরাজ সত্য হয়ে উঠতে পারে।'

গান্ধীজি যখন চরকা কাটার ডাক দিলেন, রবীন্দ্রনাথ তখন ব্যথিত কণ্ঠে বললেন, "মহাত্মাজীর কণ্ঠে বিধাতা ডাকবার শক্তি দিয়েছেন, কেননা তাঁর মধ্যে সত্য আছে··· কিন্তু তিনি ডাক দিলেন একটিমাত্র সংকীর্ণ ক্ষেত্রে। তিনি বললেন, কেবল সকলে সুতো কাটো, কাপড় বোনো। এই ডাক কি সেই আয়ন্ত সর্বতঃ স্বাহা।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্ববোধের বাণী 'কালান্তর' গ্রন্থের নানা প্রবন্ধে বলেছেন। সেকথা তখন সকলের কাছে সহজবোধ্য হয়নি। আজও কি হয়েছে? রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'বিচারহীন বিধান লোহার চেয়ে শক্ত, কলের চেয়ে সংকীর্ণ। যে বিপুল ব্যবস্থাতন্ত্র···বহু যুগ ধরে বহু কোটি নরনারীকে যুক্তিহীন ও যুক্তিবিরুদ্ধ আচারের পুনরাবৃত্তি করতে নিয়ত প্রবৃত্ত রেখেছে, সেই···মানুষপেষা জাঁতাকল কি কল হিসেবে কারো চেয়ে খাটো?' গান্ধীজি এই রবীন্দ্রনাথকে সম্মান করে বলেছিলেন—The Great Sentinel—মতে না মিললেও তিনি যে আমাদের বিবেকের প্রহরী একথা স্বীকার করতে হয়েছিল। গান্ধীজি কবিকে একবার বলেছিলেন চরকা কাটতে। কবি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন—I can spin songs, I can spin poems, but I will make a mess of your precious cotton.

আচারবিলাসীদের দিকে ব্যঙ্গ ছুঁড়েছেন কবি, বলেছেন 'এরা হাজার খুঁটিতে, ধর্মের বেড়াজালে এইরকম বাঁধা হয়ে শান্ত হয়ে পড়ে থাকে—কারণ এটি দূর থেকে দেখতে বড়ো সুন্দর।' বলেছেন, 'বুদ্ধিকে না মেনে অবুদ্ধিকে মানাই যাদের ধর্ম, রাজাসনে বসেও তারা স্বাধীন হয় না।' আজও অবাধে দেশে ধর্মের নামে জাঁকিয়ে বসে বিচ্ছিন্নতার লড়াই, পণের দায়ে নতুন বউকে পুড়ে মরতে হয়, সতীর নামে জয়ধ্বনি দেয় অনেক নেতাই, তখন এই কথার সত্যতা বোঝা যায়। রামমোহন বিদ্যাসাগর ছাড়া আর কাউকে রবীন্দ্রনাথের মত বলতে শুনিনি, 'আমাদের লড়াই ভূতের সঙ্গে, অবুদ্ধির সঙ্গে, অবাস্তবের সঙ্গে।' তিনি এমনও বলেছিলেন, 'বিদেশিকে বিদায় করলেও আগুন জ্বলবে, এমনকি স্বদেশি রাজা হলেও দুঃখ দহনের নিবৃত্তি হবে না।' কারণ যে আগুন জ্বলছে তার জ্বালানিটা হল 'ধর্মে কর্মে অবুদ্ধির অন্ধতা।'

নিজের জীবনে পৃথিবীর সব নির্মমতা, সব বুদ্ধিহীনতা যখন দেখা হয়ে গিয়েছে—শুধু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়নি, তবে পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে—সেই সময়ে 'কালান্তর' লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। লিখলেন, নতুন যুগে 'ব্যক্তিভেদে অপরাধের ভেদ ঘটে না—যেটা অন্যায় সেটা প্রথাগত শাস্ত্রগত গায়ের জোরে শ্রেয় হতে পারে না, শংকরাচার্য উপাধিধারীর স্বরচিত মার্কা সত্ত্বেও সে শ্রদ্ধেয় নয়।' প্রশ্ন করলেন, 'মনুষ্যত্বের 'পরে বিশ্বাস কি ভাঙতে হবে?' উত্তরও দিয়ে দিলেন—'নৈরাশ্যের মধ্যেই এই কথা মনে আসে যে, দুর্গতি যতই উদ্ধতভাবে ভয়ংকর হয়ে উঠুক, তবু···ঘোষণা করতে পারি 'তুমি অশ্রদ্ধেয়', অভিসম্পাত দিয়ে বলতে পারি 'বিনিপাত', বলবার জন্য পণ করতে পারে প্রাণ এমন লোকটি দুর্দিনের মধ্যে দেখা দেয়।'

রাশিয়ায় গিয়ে যখন প্রসঙ্গক্রমে ডিক্‌টেটরশিপ সম্বন্ধে নিন্দা করছেন, তখন সেই সূত্রে নিজের দেশের কথা তাঁর মনে পড়ে গিয়েছে। মনে পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক গুরুর হাতে আমরা কেমন মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকি—'মহাত্মাজী যখন বিদেশি কাপড়কে অশুচি বলেছিলেন আমি তার প্রতিবাদ করেছিলেম, আর বলেছিলেম, ওটা আর্থিক ক্ষতিকর হতে পারে, অশুচি হতেই পারে না। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রচালিত অন্ধ চিত্ত ভোলাতে হবে, নইলে কাজ পাব না—মনুষ্যত্বের এমনতরো চিরস্থায়ী অবমাননা আর কি হতে পারে? নায়কচালিত দেশ এমনিভাবেই মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকে—এক জাদুকর যখন বিদায় গ্রহণ করে তখন আর-এক জাদুকর আর-এক মন্ত্র সৃষ্টি করে।'

গান্ধীজির সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনে রবীন্দ্রনাথ এই অভিযোগ করেছিলেন। এল্‌মহার্স্ট তাঁর গ্রন্থে সেকথা লিখে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'গান্ধীজী, আপনি কেমন করে নিজেকে মহাত্মা বলে ডাকতে আপনার অনুগামীদের অনুমতি দেন? আপনি কি মহাত্মা?' গান্ধীজি বলেছিলেন—'না, তা আমি নই। কিন্তু ভারতীয়রা সর্বদাই একটি প্রতীক চায়। যদি আমাকে সেরকম একটা কিছু ভেবে নেয়, তাহলে সেটাই কি বড়ো কাজের জন্য এক হতে সাহায্য করবে না?' রবীন্দ্রনাথ এটিকে বিস্ময়ের বস্তু বলে মনে করেছিলেন, ভেবেছিলেন এতে যথেষ্ট সততার পরিচয় দেওয়া হচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাটি এখানে বোঝা যায়, যদিও এও সত্যি কথা যে তিনি নিজেকে 'গুরুদেব' সম্বোধন থেকে মুক্তি দিতে পারেন নি।

রাশিয়ার নতুন অর্থনীতি সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'গুরুমন্ত্রের মোহ থেকে সামলিয়ে নিয়ে আমাদের বলা দরকার যে প্রয়োগের দ্বারাই মতের বিচার হতে পারে, এখনো পরীক্ষা শেষ হয়নি।' আশ্চর্য, একথা উচ্চারণের এতদিন পরেও আমাদের মধ্যে অনেকেই এই রাজনৈতিক গুরুমন্ত্রের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

যখন 'চার অধ্যায়' লিখলেন, তখনও সেই একই কথা বললেন। সারাজীবন দেশপ্রেমের নামে যে নির্দয় নিয়মকে চলতে দেখেছেন, বোধহয় তার বিরুদ্ধে নিজের বিবেককে শাণিত স্বরে তুলে ধরতে চাইলেন এই প্রেমোপাখ্যানের পটভূমিতে—'তোমাদের স্বদেশি কর্তব্যের জগন্নাথের রথ। মন্ত্রদাতা বললেন, সকলে মিলে একখানা মোটা দড়ি কাঁধে নিয়ে টানতে থাকো দুই চক্ষু বুজে—এই একমাত্র কাজ। হাজার হাজার ছেলে কোমর বেঁধে ধরল দড়ি। কত পড়ল চাকার তলায়, কত হল চিরজন্মের মত পঙ্গু।···আপন শক্তির পরে বিশ্বাসকে গোড়াতেই এমনি করে ঘুচিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, সবাই সরকারি পুতুলের ছাঁচে নিজেকে ঢালাই করতে দিতে স্পর্ধা করেই রাজি হল। সর্দারের দড়ির টানে সবাই যখন একই নাচ নাচতে শুরু করলে, আশ্চর্য হয়ে ভাবলে—একেই বলে শক্তির নাচ। নাচনওয়ালা যেই একটু আলগা দেয়, বাতিল হয়ে যায় হাজার হাজার মানুষ পুতুল।'

এবারে একটি শেষ কথা। যাঁরা জীবনে গুরুর পায়ে সমস্ত নিবেদন করে দিয়েছেন—তাঁদের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিও আছেন, এতে অবশ্য প্রমাণ হয় যে নিজের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট হলেও জীবনযাপনে এঁদের সীমাবদ্ধতা অকল্পনীয়। সমস্ত যুক্তির বিরুদ্ধে এঁরা একটি কথা বলে থাকেন। সেটা হল এই যে, গুরুর কাছে এঁরা শান্তি ত পেয়েছেন। এইটেই এঁদের চরম ভুল বোঝা। মানুষ যদি শুধু শান্তি চাইত, তাহলে আজ এতদূর এসে পৌছত না সে। সক্রেটিস বলেছিলেন, 'তোমার হাতে প্রশ্ন তুলে দেব, সে তোমাকে অস্থির করে তুলবে। ঐ অস্থিরতাই হবে তোমার শিক্ষক।' নির্বোধের পক্ষে ত শান্তি সহজলভ্য। সেই শান্তি ত মানুষের কাম্য হতে পারে না। 'রক্তকরবী' নাটকের আর একটি অংশ এই প্রসঙ্গে পড়ে দেখা যাক—

গোঁসাই—ঠেলছ কাকে।

নন্দিনী—তোমাদের যে অজগর আড়ালে থেকে মানুষ গেলে, তাকে।

গোঁসাই—হরি হরি, ভগবান যখন ছোটোকে মারেন, তখন তার ছোটোমুখে বড়োকথা দিয়েই মারেন। দেখো নন্দিনী, তুমি নিশ্চয় জেনো, আমি তোমার মঙ্গল চিন্তা করি।

নন্দিনী—তাতে আমার মঙ্গল হবে না।

গোঁসাই—এসো আমার ঠাকুরঘরে তোমাকে নাম শোনাইগে।

নন্দিনী—শুধু নাম নিয়ে করব কী।

গোঁসাই—মনে শান্তি পাবে।

নন্দিনী—শান্তি যদি পাই তবে ধিক্ ধিক্ ধিক্ আমাকে।

তিনবার 'ধিক্' বলালেন রবীন্দ্রনাথ। গুরুর মন্ত্রে শান্তি পাবার এই সহজ এবং নির্বোধ উপায়কে ধিক্কার দিলেন। আমরা সেই প্রবল প্রতিবাদকে এখনও বুঝতেই পারলাম না। চিনতেই চাইলাম না সেই গুরুকে যিনি আমাদের সঙ্গে খেলতে চান (যেমন অচলায়তন নাটকে), যাঁর আশ্রয়ে শুধু সুবোধ মানুষই নন, অবোধজনেরাও ধন্য হয়ে যায় (তাঁর একটি গানে সে কথা রয়ে গেছে)—

আমার গুরুর আসন কাছে
সুবোধ ছেলে কজন আছে
অবোধজনে কোল দিয়েছেন তাই আমি তাঁর চেলা।

ডেভিড বলল

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

ইস্রায়েলে সারা বছর ধরে
বুনতে পারো বুনতে পারো বীজ—
কিন্তু কবে ফসল ঘটবে তার
খবর কেউ রাখে না। একবার,

ডেভিড বলল, শস্ত্রের বদলে
জেরুজালেম রৌদ্রে যখন পোড়ে
মরুভূমির ভিতর থেকে নাকি
জীর্ণ হলো হাজার ম্যাঙ্গানিজ!

এই ইহুদি ডেভিড আমার ভাই :
হা-হুতাশন হয়ে সদাই জ্বলে
সারা জীবন, সত্যি বললেও
তাই মনে হয় বাড়িয়ে কথা বলে।

তার কথায় নিথর যখন আমি
ডেভিড আমায় করল না খারিজ,
বলল : তুমি এখন ইস্রায়েল :
বীজ বুনে দাও, বীজ বুনে যাও, বীজ...

শুভাশিস, তোমাকে খুঁজছি আমি

মহাদেব সাহা

শুভাশিস, তোমাকে খুঁজছি আমি
হরিচরণের যথার্থ বানানে লিখে নাম,
উচ্চারণ অভিধান ঘেঁটে সঠিক মাত্রায় ডেকে ডেকে ;

তোমাকে খুঁজছি আমি শুভাশিস, এই দুঃসময়ে
যখন সকল মানবিক স্রোতধারা শুষ্ক হ'য়ে যায়,
নেমে আসে দিবসে-নিশীথে দীর্ঘ জিরাফের গ্রীবা।

তোমাকে খুঁজছি আমি যেন সেই শৈশবের নদী
যেন আমার মায়ের অপার স্নেহের দু'টি হাত,
একটি প্রাচীন বৃক্ষ, তুলসীমঞ্চ, সন্ধ্যাদীপ
সুফী দরবেশের সেই ধ্যানী দৃষ্টি ;
তোমাকে খুঁজছি আমি শুভাশিস সমস্ত জীবন।

শুভাশিস, তোমাকে খুঁজছি আমি সকালের চোখে
নক্ষত্রের নিপুণ মুদ্রায়, মানুষের গাঢ় কণ্ঠস্বরে—
শ্রাবণের অঝোর বর্ষণে আর চৈত্রের উদাস জ্যোৎস্নায়
তোমাকে খুঁজছি আমি এইভাবে কতো লক্ষ সহস্র বছর ;

তোমাকে খুঁজছি আমি শুভাশিস, সবখানে
লোকালয়ে, বৃক্ষপত্রে,
শহরের কংক্রিটের মাঠে
এই দুঃসময়ে কোথায় তোমার দেখা পাই!

শুভাশিস, তুমি নিরুদ্দেশ সেই কবে থেকে।

স্ফিংস

বিরাম মুখোপাধ্যায়

চোয়ালে ফাটল দু-দুটো আক্কেল-দাঁত হাড়হাঁটু
শাদা আর ধূসরের হামাগুড়ি থিতু জাদুঘর
আলস্যের মহাঘুম—বেমালুম আকাশ উধাও
ডাইনোসের-দিনের খটখটে রোদ ঋতুরঙ্গ
রঙবাজ মন্মথ মেঘেরা নর্দমার নোংরা স্রোত
পাললিক স্তরের গভীরে এঁটে-থাকা একমুঠো
ফসিলের ধূসরিমা আবহমানের আলোকিত
সিন্ধুসভ্যতার ক্ষয়াটে কাঁকর গুঁড়ো-গুঁড়ো ধুলো
ঝক্কি-ঝুঁকি ঝেড়ে ফেলে অনুকূল চিকন হাওয়ায়
আর্যজিৎ সোনার মুকুট—য়ুফ্রেতিস তাইগ্রিস
সহোদরা দুটি ঘন জলের বিহ্বলি মোহময়
এলোকেশী কখনো-বা, ভূমধ্যীয় সোনা-সুখ-রোদ
ফল-ফসলের বোঁটায়-বোঁটার স্বাদের দাদন
ঢলকানো, সম্পন্ন পলির পোক্ত ভিতে আইভরি-
রসদ ঢালাই,—পরম্পরা এ-মহিমা কতোটুকু
খাদ ? আর ওই নিত্য-আবেগের স্ফিংসের বয়েস ?

হাজামজা হাজার-হাজার বছরের কিংবদন্তি
মিশরের স্ফিংস—সাত-সিন্ধু দশ-দিগন্তের না—
প্রাচীন পাথর সিংহের পাঁজর তলপানো ঢেউ
প্রত্ন-প্রত্নচিহ্ন আট-হাজার বছর তো বটেই

সময়ের রসালো ইন্ধনে শিলীভূত জৈবকোষ
প্রেমী-উপস্থের অতিক্ষীরক্ষরণের গলস্টোন
খুঁজে খুঁড়ে কালপঞ্জি কাটাছেঁড়া শুশ্রূষা-আরাম
মানুষ ও সিংহীসঙ্গমের পরিসিক্ত পরিণাম
উদাত্ত আশ্লেষ আদিসভ্যতার হারানো বিভাব
শুধু মিশরজ্ঞ করতলে রুদ্রের প্রসাদ ?—রহস্যের গিঁট
গ্রীকমিথ্ আগুপিছু কত নক্ষত্রের গর্ভচ্যুত
বাষ্পের কান্নায় হিসেবের গরমিলে নষ্টভ্রূণ
মন্থিত আবেগমাত্রা মোচনের যোগ্য জ্যোৎস্নাবীথি
মরু-সিন্ধু-ভূকম্পিত সঙ্গমের চিত্রিকা দানবী ॥

আমি বকুল নই

রাজলক্ষ্মী দেবী

পদাঘাতে প্রস্ফুটিত হবো—এই নির্ণয় নিয়েছি।
আমি তো বকুল নই, মুখমদিরা-র ধৃষ্ট ছিটে
সইবে না আমার। মারো। পায়ে দলো। ঘৃষ্ট, পিষ্ট করো।

আমি ফিরে ফিরে আসি। দ্বিধার বেড়া টপকিয়ে, দিনে
আসি, রাতে আসি। সতেজ সটান উঠে আসি
পৃথিবীর গর্ভ থেকে। মারো। খুঁড়ে তোলো শেকড়সমেত।

গর্ভস্রাব হয়ে আসি। অজীর্ণ উদ্গার, রক্তস্রোত
হয়ে আমি আসি। গোগ্রাসী ছোঁ-মারা শকুনের
মতন ঝাঁপাই। মারো! ওপড়াও রোমশ পালক।

না, আমি বকুল নই। আছে বুঝি মৃতসঞ্জীবনী
প্রিয়ের ধুৎকারে? তবে বেছে নেবো আমূল মরণ-ই।

স্যুইসাইড হিল্-এর রাত্রি, এবং অনুশীলা

বেণু দত্তরায়

রাত্রির ক্যানভাসে এক ছায়া। বনবেড়ালের মতো
আমি আজও স্যুইসাইড হিল্-এর ধার থেকে তার
ছায়াকে পাশ কাটিয়ে যাই। উপত্যকার ধারে রাবার
গাছের পাশে বাঁকা ঠোঁট ক্রুদ্ধ মুখের ভঙ্গিটা আমাকে
ধম্‌কে উঠলো। নিষ্ঠুরতারও একটা সীমা থাকতে হয়।
আমি কিছুই জানি না—কিছুই বুঝিনা। স্বভাব-সঙ্গত
নিয়মে রাত্রি বেশি হলে ছায়ার ধমক খেতেই তো হয়।
অনুশীলা একদিন আমাকে বলেছিলো, আপনি কিন্তু
খুব সতর্ক হবেন। সত্যি কথা বলতে কি সতর্কতা
আমার স্বভাবই না। আজো পাহাড়তলির ধার দিয়ে দ্রুত
নামতে গিয়ে চমকে উঠলুম। স্যুইসাইড হিল-এ
আজ রাত্রে বাতাস ধূর্ত ও প্রবঞ্চক—দিন-দুপুরেই সেই
পাঁচ-পাঁচটা খুন হয়েছিলো পুলিশ আসেনি। এবং
অদৃশ্য প্যাঁচার চোখ সবুজ-বেগুনী ইত্যাদি-ইত্যাদি।
রাডারের উচ্চচাপ ও অনিচ্ছুক তীক্ষ্ণতা আমার পেছন-
পেছন যায়। আমি স্যুইসাইড হিল্-এর পাশ দিয়ে
উঠতে-উঠতে অনুশীলার নাম ধ'রে ডাকলুম। সেই
কুয়াশার শুভ্র চাপ-চাপ মৃত নক্ষত্রদের পাশ দিয়ে
যেতে-যেতে হিংস্র বাজনা বাজাবার শব্দ···জেদী ও হিংস্র···
স্যুইসাইড হিল্ থেকে আজ কিন্তু কেউ আর আমাকে
ডেকে উঠলো না কোনো অনুশীলা নয়, কিম্বা আর কেউ

ত্বক ও ধড় পৃথক করা সম্পর্কে কিছু ভাবনা

আনন্দ ঘোষ হাজরা

ছবিটা যে কোনো মাংসের বাজারে গেলেই দেখা যাবে। কিংবা কলকাতার বা শহরতলির যে কোনো গলিতে। লাল জলপরীদের মতো ত্বকবিহীন ধড়গুলো টাঙানো রয়েছে। লোমশ ত্বকগুলো এক জায়গায় ডাঁই করা। ত্বক আর ধড় পৃথকভাবে থাকলে সব কিছু অর্থহীন হয়ে যায়। এমন কি ধড়টি মুণ্ডযুক্ত হলেও। কারণ তখন আর কোনো শব্দই থাকে না। থাকে শুধু ঘটনা। শেষ অর্থযুক্ত শব্দটা ত্বক আর ধড় পৃথক করার আগেই উচ্চারিত হয়ে যায়।

প্রথম সৃষ্টির সময় থেকেই ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে। কিন্তু শব্দগুলো ঘটনাবহুল জলন্ত উথাল পাথাল নরকনদীর ওপর উড়ে বেড়াচ্ছিল। এক সময়, বিবর্তনের এক একটা মুহূর্তে শব্দগুলো বললো, 'ঘটনা যেমন ঘটছে ঘটুক, আমরা ঠিক মুখে মুখে বসে যাবো।' যেই তারা ঠিক স্থানটি নির্বাচন করতে পেরেছে, অমনি সব কিছু অর্থবান হয়ে উঠলো, মূল্যবানও।

তবু, ত্বক আর ধড় রোজই আলাদা করা হচ্ছে আর শেষ অর্থযুক্ত শব্দ প্রত্যেকদিন অনেকবার উচ্চারিত হচ্ছে, যেন তৃতীয় সহস্রাব্দে আর কোনো শব্দই থাকবে না।

হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথ, আমি জীবনানন্দ বলছি।

কি আশ্চর্য! ত্বকবিহীন ধড় বা ধড়বিহীন ত্বকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কি সম্পর্ক? জীবনানন্দেরই বা কি সম্পর্ক? কেবল বকর বকর বকর বকর, অর্থহীন শব্দোৎপাত।

কিন্তু ক্রমশ পৃথিবী জুড়ে ত্বক আর ধড় কেবলই আলাদা হচ্ছে। ত্বকগুলো শহরে শহরে দৌড়ে বেড়াচ্ছে ঠিক ধড়টি খুঁজে নেবার জন্য। আর ধড়গুলো কোথায় চলে গেছে—গ্রামে গঞ্জে, জঙ্গলে, পাহাড়ে, নদীতে! তারাও জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রে, নক্ষত্রবিহীন অন্ধকারে, প্রভাতসূর্যের আলোয়, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায়, বছর বছর ধ'রে ত্বকের সন্ধান করছে; কিংবা হঠাৎ দুজনের দেখা হয়ে গেলে ভেবে পাচ্ছে না কোথায় গেল টিম্বুগুলো!

অথবা সকলেই খুঁজছে রবীন্দ্রনাথকে, জীবনানন্দকে, যাতে নতুনভাবে তারা পুনরায় শব্দ ক'রে উঠতে পারে।

ফুলের ভিতর ঢাকল আঁখি জল

অসীম রেজ

সাত সকালে উঠেই দেখি
দিব্যি তারায় ডুবছে আঁখি,
ঘাস শিশিরে মিলেমিশে
বদলে দিচ্ছে আলোর রঙ।
তোমায় বুকে উদোম হাওয়া
আচম্বিতে হারায় কোথায়
কোন সে দেশের কোন সাগরের পাড়ে।
হরেক মানুষ হরেক আলো,
রঙ বেরঙের হরেক খেলা,
মেলার ভিতর মন্ত্রমুগ্ধ আমি।
গড়িয়ে এলে শেষের বেলা
দেখি তুমি দাঁড়িয়ে একা,
একেবারে নীল সে পরী,
ডানার ভিতর নামল বুঝি অথৈ নীরবতা।
শূন্যে হাওয়া উথাল পাথাল,
মধ্যরাতে শরীর জুড়ে পাগল করা অঝোর জল,
অন্ধকারে ফিসফিসিয়ে তোমার সাথে গোপন কথা
ভর বাদলে মনে পড়ে?
তোমার সঙ্গে শেষ যে দেখা
পথের বাঁকে এক নিমেষে আলোর রেখা,
হাতের মধ্যে হঠাৎ পাওয়া
একটি রুমাল তোমার দেওয়া,
ফুলের ভিতর ঢাকল আঁখি জল।

ইতিহাস

সুজিৎ ঘোষ

আমার হাতেই আছে তুরুপের তাস,—
সহজেই তৈরি করা যায় ইতিহাস
ভেঙে ইতিহাস

মহাত্মা গান্ধিতে হ্যারিসন
এণ্ডারসন ভবানীভবন
অকটরলনির নাম
কেমন সহজে পালটালাম
শহীদ মিনার
যেখানে ভবানী ভাঁড়ে, নতুন সৃষ্টির ইচ্ছা—
অথচ খরচ কোনও হয় না দিনার
বুদ্ধি করে নাম পালটে, রঙ পালটে
দিলেই প্রগতি—
লাটের বাগানে গিয়ে নিক না বিশ্রাম
ঘোড়সওয়ারের দৃপ্ত ব্রোঞ্জ আউটরাম

উত্তরের গো-বলয় কেন যে বোঝে না—
ইতিহাস ভেঙে তৈরি করা যায় ইতিহাস
সহজেই, শুধু নাম পালটে দিলে
মসজিদ? মন্দির? রামেরই মন্দির বলে
ফলক লাগিয়ে ভেঙে দিলে
কি ভাঙলো? মন্দির? মসজিদ?—রামভক্ত সেনা
ধৃতরাষ্ট্রের দৃষ্টি নিয়ে অধুনা এ প্রশ্নও করে না—
কেন পলাতক রাম, গৃহহীন রাঘব ভিখারি!

ইতিহাস ভেঙে তৈরি করা যায় ইতিহাস
সহজেই, প্রগতি বা পশ্চাদগতিতে
ইতিহাসে সে-ও এক নতুন ইতিহাস
মানুষেই সৃষ্টি করে, ভাঙে।

শৈলবালা ঘোষজায়া ও 'শেখ আন্দু'

শিবনারায়ণ রায়

এখন থেকে ঠিক তিরিশ বছর আগে মিচিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে আমার এক অর্থনীতিবিদ পাঞ্জাবী বন্ধুর তরুণী স্ত্রী তাঁর একটি নাতিদীর্ঘ গবেষণাপত্র আমাকে পড়তে দেন। বন্ধুপত্নীটি জন্মসূত্রে জার্মান, তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল জার্মান সাহিত্যের প্রচলিত ইতিহাসে অবহেলিত নারী প্রতিভা। তখনও পর্যন্ত আমেরিকাতেও নারীমুক্তি আন্দোলন ব্যাপক প্রসার লাভ করেনি। বন্ধু পত্নীটির নিবন্ধে কবর্বেশি পনেরোজনের মতো জার্মান লেখিকার কবিতা,নাটক, উপন্যাস নিয়ে আলোচনা ছিল যাদের বই পড়া দূরে থাক, নাম পর্যন্ত আমি সে সময়ে শুনিনি। কিন্তু বন্ধু পত্নীটির সাহিত্যরুচির উপরে আমার যথেষ্ট আস্থা ছিল, এবং তাঁর ঐ নিবন্ধটি আমাকে ভাবিয়ে তোলে। সাহিত্যের ইতিহাস নামে যা আমরা পড়ি তা কতটা একপেশে? গত তিরিশ বছরের অভিজ্ঞতা এবং পড়াশুনোর ফলে আজ আমার মনে সন্দেহ নেই যে সব দেশেই সাহিত্যের ইতিহাস (ধর্মশাস্ত্র এবং তত্ত্বগ্রন্থাদির মতো) মুখ্যত পুরুষদের রচনা, এবং এর ফলে মানুষের সাংস্কৃতিক উত্তরলব্ধিতে নারীদের দান ঐ সব বিবরণীতে প্রায়শ অবহেলিত অথবা অবমূল্যায়িত।

আধুনিক সভ্যতার উদ্ভব এবং বিকাশ যেমন পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে নারীদের উপরে পরম্পরাসূত্রে চাপানো নানা বাধা এবং নিষেধ কিছুটা লাঘব করেছে তেমনই সাংস্কৃতিক ইতিহাসে নারীদের বিভিন্ন কৃতির কিছুটা স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। আজ যাঁরা ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস পড়েন, তাঁদের মনে কোনও সংশয় রাখবার অবকাশ নেই যে জেন অস্টেন, জর্জ এলিয়ট, এমিলি এবং অ্যানি ব্রন্টি থেকে শুরু করে ভার্জিনিয়া উলফ পর্যন্ত অনেক প্রতিভাময়ীই ইংরেজি উপন্যাস সাহিত্যকে তার মহাসমৃদ্ধি এনে দিয়েছেন। আধুনিক পশ্চিমী সাহিত্যের আকাশে আনা আখমাটোভা, গাব্রিয়েলা মিস্রাল, এডিথ সিটওয়েল, এডিথ সোরেডারগ্রান, সেলমা লাগেরলফ, সিগ্রিড উণ্ডসেট, গ্রাত্‌জিয়া দেলাদ্দা—প্রত্যেকেই উজ্জ্বল নক্ষত্র। কিন্তু নারীনর সাম্যের আন্দোলন এবং সে সংক্রান্ত ক্রমবর্ধমান গবেষণাদি থেকে ক্রমেই স্পষ্টতর হয়ে উঠছে যে পশ্চিমেও সমাজ সংস্কৃতির বহুক্ষেত্রে নারীদের বিচিত্র অবদান এখনও পর্যন্ত অনেকটাই শিক্ষিত সাধারণের কাছে অপরিজ্ঞাত অথবা উপেক্ষিত।

পশ্চিমের তুলনায় এদেশের সমাজজীবনে এবং সাংস্কৃতিক প্রতিন্যাসে আধুনিকতা নিতান্তই উপরিগত। ফলে ইতিহাসের যে ধরনের মৌলিক পুনর্বিচার হওয়া দরকার এখানে তা প্রায় শুরু হয়নি বলা চলে। অজ্ঞতা এবং প্রতিকূল সংস্কার সাহিত্যের ইতিহাসকে কতটা অনির্ভরযোগ্য করতে পারে তারই উদাহরণ হিসাবে একটি বিশেষ প্রভাবশীল গ্রন্থ থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দেব। গ্রন্থকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর ছাত্রছাত্রীদের ভিতরে অনেকে বিভিন্ন কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা এবং সাহিত্যের অধ্যাপক হন; স্বীকৃতস্বরূপ বইটিরও কয়েকটি সংস্করণ হয়েছে, এবং বাংলা উপন্যাস সংক্রান্ত ধারণাদিকে এই বইটি যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। বইটির নাম **বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা**। লেখকের নাম: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বাইশ অধ্যায়ে বিন্যস্ত ৫৭৭ পৃষ্ঠার এই বিবরণী গ্রন্থে একটি অধ্যায় আছে 'স্ত্রী-ঔপন্যাসিক'দের উপরে। সেখানে প্রভাবতী দেবী সরস্বতী এবং শৈলবালা ঘোষজায়াকে একত্রে নিচে উদ্ধৃত তিনটি মাত্র বাক্য দিয়ে উক্ত পণ্ডিত প্রবর বরখাস্ত করেছেন:

> প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ও শৈলবালা ঘোষ জায়া অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে নূতন ধারা প্রবর্তনের বিশেষ কোনো পরিচয় পাওয়া যায়না। মোটের উপর ইঁহারা সকলেই কম বেশী পুরাতন আদর্শ-সংঘর্ষের যুগে পুরাতনেরই পোষকতা করেন। (পৃ: ২৮৪, তৃতীয় সংস্করণ)

প্রভাবতী বর্তমানে আমার আলোচনার বাইরে, কিন্তু যে বিশেষ উপন্যাসটি আমার এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় সেটির

লেখিকা সম্পর্কে প্রয়াত রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকের বক্তব্য কতটা সমীচীন আর কতটা অজ্ঞতাপ্রসূত প্রবন্ধপাঠের পর হয়ত পাঠক পাঠিকারা অনেকে সে বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠবেন। এবং হয়ত কৌতূহলের ফলে ঐ উপন্যাসটির পুনর্মুদ্রণ ঘটতে পারে।

॥ দুই ॥

বস্তুত বিস্তর চেষ্টা সত্ত্বেও ঐ উপন্যাসটির গ্রন্থাকারে প্রকাশিত একটিও কপি আমি আজ পর্যন্ত যোগাড় করে উঠতে পারিনি। অথচ বিষয় নির্বাচন এবং লেখিকার প্রতিন্যাস উভয় বিচারেই উপন্যাসটি এতই অভিনব যে শিক্ষিত বাঙালি পাঠক পাঠিকা মাত্রের এটি অবশ্যপাঠ্য। বিশেষ করে বর্তমানে এদেশে শিক্ষিতজনের অজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক দলগুলির নির্বিবেক উস্কানির ফলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আবার যেভাবে প্রবল হয়ে উঠেছে তাতে এই বইটির ব্যাপক পঠনপাঠন কিছুটা শান্তিবারির কাজ করতে পারে বলেই আমার ধারণা। এই ধরনের একটি উপন্যাস যে এখন থেকে আটাত্তর বছর আগে সে সময়কার সবচাইতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তার জন্য সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মুক্তবুদ্ধির তারিফ করি।

উপন্যাসটির নাম 'সেখ আন্দু', লেখিকার নাম শৈলবালা ঘোষজায়া। এটি 'প্রবাসী' মাসিক পত্রে ধারাবাহিকভাবে ১৩২২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা থেকে ফাল্গুন সংখ্যা পর্যন্ত এগারোটি কিস্তিতে বত্রিশটি পরিচ্ছেদে প্রকাশিত হয়। যেহেতু বেশ কয়েকটি সাধারণ গ্রন্থাগারে খোঁজ করেও 'সেখ আন্দু'র একটি কপিও আমি বার করতে পারিনি তাই উপন্যাসটির জন্য 'প্রবাসী'র উপরেই আমাকে নির্ভর করতে হয়েছে। 'প্রবাসী' ১৩২২-এর বাঁধানো দুটি খণ্ড সাময়িক ঋণ হিসেবে আমাকে সংগ্রহ করে দেন কল্যাণীয়া শুচিস্মিতা সরকার। পড়তে গিয়ে নজরে পড়ে যে বৈশাখ সংখ্যায় লেখিকার নাম ছাপা হয়েছিল শৈলবালা ঘোষ; জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে সেটি কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হয় ঘোষজায়া নামে। অনেক কাল পরে সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে শৈলবালা বলেছিলেন:

> আমি নামের পর ঘোষজায়া কেন লিখি জান? শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যেন কিছুতেই বুঝতে না পারে, আমিই ওদের নতুন বউ শৈলবালা ঘোষ। ওসব লেখা-টেখার ওরা ধার ধারত না, খবরও রাখত না।

কী প্রতিকূল পরিবেশে শৈলবালাকে সাহিত্যসাধনা করতে হয়েছিল তার কিঞ্চিৎ আভাস এই উদ্ধৃতি থেকে মেলে! বস্তুত তাঁর জীবন বা সাহিত্যকর্ম নিয়ে বিস্তারিত কোনও আলোচনা অথবা বই প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই, তাঁর জীবন সম্পর্কে যেটুকু তথ্য মেলে তার প্রধান উৎস ঐ সাক্ষাৎকার। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয় ছাত্র এবং কয়েক প্রজন্ম ধরে বাঙালি ছাত্রসমাজের সাহিত্যরুচির উপরে বিশেষ প্রভাবশালী অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে সম্ভবত গুরুর বিচারবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শৈলবালার পরিচয় দিয়েছিলেন মোট চার পংক্তিতে, চারটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে, কিন্তু 'সতীর অভিশাপ' উপন্যাসের লেখক কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে দেন সাঁইত্রিশ পংক্তি। শৈলবালাকে অবহেলা করে উক্ত অনুল্লেখ্য চট্টোপাধ্যায়কে এবংবিধ প্রাধান্য দেওয়ার ভিতরে শুধু অজ্ঞতা এবং সাহিত্যবোধের অভাব প্রকটিত হয়না, পুরুষ-পক্ষপাতিত্বও ধরা পড়ে।

সুধীরঞ্জনের সঙ্গে প্রাগুক্ত সাক্ষাৎকার এবং অন্য দু'একটি সূত্র থেকে শৈলবালা সম্পর্কে যেটুকু সংবাদ মেলে সংক্ষেপে তা এই। শৈলবালার বাবা কুঞ্জবিহারী নন্দী আসিস্ট্যাণ্ট সার্জন ছিলেন; চাকরি সূত্রে তিনি যখন চট্টগ্রামের কক্সবাজারে তখন সেখানে ২রা মার্চ ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে শৈলবালার জন্ম হয়। বাংলা হিসেবে তাঁর জন্ম তারিখ ১৯শে ফাল্গুন, ১৩০০—অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় একশ বছর আগে। তাঁর মার নাম হেমাঙ্গিনী দেবী। বাবা চাকরি থেকে অবসর নেবার পর বর্ধমানে বসবাস করেন। শৈলবালা সেখানে রাজ বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কিন্তু এগারো/বারো বছর বয়সেই তাঁকে স্কুল ছাড়তে হয়। তবে বাবার আনুকূল্যে তাঁর সাহিত্যরুচি খুব অল্পবয়সেই গড়ে উঠতে থাকে। অবসরপ্রাপ্ত বাবাকে বঙ্কিম, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের বই পড়ে শোনাতে হত। কিন্তু বিয়ে হয়ে যাওয়ার ফলে তের বছর বয়সে তাঁকে বর্ধমান জেলার মেমারিতে শ্বশুরবাড়ি চলে আসতে হয়। সেখানে বিরাট একান্নবর্তী পরিবার। স্বামীর নাম নরেন্দ্রমোহন ঘোষ। স্বামী গোড়া থেকেই একটু অদ্ভুত, অন্যরকম মানুষ ছিলেন। শৈলবালা সংসারের সমস্ত কাজ করে রাতে লুকিয়ে লণ্ঠনের আলোয় লেখাপড়া করতেন। তাঁর বয়স যখন আঠারো তখন তাঁর প্রথম গল্প 'বীণার সমাধি' একটি পুরস্কার পায়; তারপর কুড়ি-একুশ বছর বয়সে লেখেন তার প্রথম উপন্যাস **শেখ আন্দু**। সেই সময়

তাঁর স্বামী সাহিত্য চর্চায় কিছুটা উৎসাহ দিতেন, এই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি তিনিই প্রবাসী দপ্তরে নিজে পৌছে দেন। তারপর কয়েক বছর শৈলবালা বেশ কয়েকটি গল্প এবং উপন্যাসে লেখেন। সেগুলি 'বঙ্গশ্রী' ইত্যাদি পত্রিকায় এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই সব লেখা থেকে তাঁর উপার্জন হতে থাকে। শ্বশুরবাড়িতে দু একজন দেওর এবং ভাসুরপো তাঁর লেখার কদর করলেও সেখানকার বাকি সকলেই তাঁর এই সাহিত্যসাধনার বিরোধিতা করে। সংসার প্রতিকূল, স্বামী উপার্জনহীন অসুস্থ, কিন্তু এসব সত্ত্বেও শৈলবালা হতোদ্যম হন নি।

সাক্ষাৎকারের সময়ে শৈলবালা তাঁর যে সব উপন্যাস এবং ছোটগল্পের বইয়ের উল্লেখ করেছিলেন তাদের ভিতরে ছিল **আড়াই-চাল, নমিতা, মনীষা, শান্তি, মঙ্গলঘট, ইমানদার, অবাক, বিভ্রাট, স্নিগ্ধা, রত্নীন ফানুস, চৌকো চোয়াল, বিনীতা দি, অভিশপ্ত-সাধনা** এবং **বিপত্তি**। তাঁর নিজের বিচারে শেষের দুটিই তাঁর সেরা রচনা। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং সুবোধ সেনগুপ্তের উপরে নির্ভর না করে যাঁরা শৈলবালাকে নিয়ে (অথবা সাধারণভাবে বাঙালি মহিলা লেখিকাদের নিয়ে) গবেষণা করবেন এই সব বই তাঁদের সংগ্রহ করে পড়তে হবে।

শৈলবালার স্বামী নরেন্দ্রমোহন কলকাতায় এসে কিছুকাল হোমিওপ্যাথি পড়েন এবং শর্টহ্যাণ্ড টাইপরাইটিং শেখেন। এই সময় তাঁর খরচ যুগিয়েছেন শৈলবালা তাঁর লেখার রোজগার থেকে। কিন্তু শৈলবালার বয়স যখন ছাব্বিশ তখন তাঁর স্বামী সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যান—তাঁর উপরে মারধোর শুরু করেন। সাক্ষাৎকারের ভাষায় :

"১৩২৭ সাল আমার জীবনের সবচেয়ে দুর্বৎসর। স্বামী ঘোর উন্মাদ—দুর্দান্ত। সেই সুযোগে আত্মীয়রা সম্পত্তির ভাগ ঠকিয়ে নিচ্ছে। আমার ওপর চলছে অমানুষিক অত্যাচার। আমার স্বামী মাথায় এমন জোরে আঘাত করলেন যে মনে হল চোখ দুটো বুঝি ঠিকরে বেরিয়ে এল। ক্ষীণ হয়ে গেল দৃষ্টিশক্তি, উঃ মাথায় কী যন্ত্রণা!"

এই দুঃসহ অবস্থা থেকে পুলিশের সাহায্যে তাঁকে উদ্ধার করেন তাঁর দাদা মেজর অশ্বিনীকুমার নন্দী। তাঁকে নিয়ে আসেন বর্ধমানে তাঁর বাড়িতে।

"সেই সময়, সারা জীবনের মধ্যে সেই একবারই আমি ভেঙ্গে পড়েছিলাম—ভগবানে বিশ্বাস শিথিল হয়ে গিয়েছিল।...আমি শান্তির জন্য, নিজেকে জয় করবার জন্যে সাহিত্যচর্চা করতাম।"

১৩৩৩ সালে শাশুড়ির মৃত্যুর পর তিনি মেমারিতে শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যান। তার তিন বছর পরে ১৩৩৬ সালে তাঁর উন্মাদ স্বামীর মৃত্যু হয়। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির ষড়যন্ত্রে অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি সংসার ত্যাগ করে রামচন্দ্রপুরে বিজয়কৃষ্ণ আশ্রমে আশ্রয় নেন। ১৯৬২ সালে তাঁর সঙ্গে সুধীরঞ্জনের সাক্ষাৎকার যখন প্রকাশিত হয় তখন শৈলবালা বলেছিলেন, "আরে আমি কবে মরে ভূত হয়ে গেছি! এখন কবর খুঁড়ে কী পাবে তুমি?" সৌভাগ্যবশত লেখায় মূল্যবান কিছু থাকলে তা লেখক/লেখিকাকে বিস্মরণ নামে মৃত্যুর হাত থেকে বারেবারেই পুনরুদ্ধার করে। তাঁর জীবদ্দশায় শৈলবালা তাঁর কৃতির জন্য কিছুটা স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। সাহিত্যচর্চার জন্য তিনি 'সরস্বতী', 'সাহিত্যভারতী' এবং 'রত্নপ্রভা' উপাধি পান। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস 'সেখ আন্দু' পুনর্মুদ্রিত হলে বাংলাসাহিত্যে তাঁর বিশিষ্ট স্থান ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করবে।

॥ তিন ॥

শৈলবালার আগে কোনও বাঙালি হিন্দু, লেখক অথবা লেখিকা, কোনও মুসলমান যুবককে নায়ক এবং হিন্দু তরুণীকে নায়িকা করে উপন্যাস লিখেছেন বলে আমার অন্তত জানা নেই। আমি বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক বা ঐতিহাসিক নই, কিন্তু এমন কোনও উপন্যাস থাকলে তার উল্লেখ বা আলোচনা এতদিনে সম্ভবত আমার চোখ এড়িয়ে যেত না। হিন্দু যুবকের প্রতি মুসলমান তরুণীর অনুরাগ নিয়ে কাহিনী রচিত হয়েছে, কিন্তু মুসলমান যুবকের প্রতি হিন্দু তরুণীর অনুরাগ 'সেখ আন্দু' প্রকাশের আটাত্তর বছর পরেও হিন্দু সমাজে অথবা হিন্দুদের রচিত উপন্যাস সাহিত্যে খুব বেশি নজরে পড়ে না। নজরুল ইসলাম, হুমায়ুন কবীর বা আবু সয়ীদ আইয়ুব নিতান্তই ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। বস্তুত ১৯১৫-১৬ সালে শৈলবালা যে কাহিনী প্রকাশ করেছিলেন তা শুধু সে যুগে বিস্ময়কর নয়, এখনও প্রায় বৈপ্লবিক ঠেকে।

বঙ্কিমচন্দ্র নবাবনন্দিনী আয়েষাকে রাজপুত্র জগৎসিংহের প্রতি অনুরাগিনী করে এঁকেছিলেন, তাঁর কোনও কোনও উপন্যাসে মহত্ত্বসমন্বিত মুসলমান চরিত্রে আছে, কিন্তু কোনও হিন্দু রমণীর তাঁরা প্রেমপাত্র নন। রবীন্দ্রনাথের ইশা খাঁ

এবং কাবুলিওয়ালা বিভিন্ন কারণে আকর্ষণীয় চরিত্র ; কিন্তু 'মুকুট' নাটক স্ত্রী চরিত্র বিবজিত এবং মিনি যখন কাবুলিওয়ালার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল তখন সে নিতান্তই বালিকা। 'দুরাশার' নায়িকা মুসলমান, কিন্তু যে পুরুষ তাঁর মনে দুরাশা জাগিয়েছিল সে হিন্দু। তবে অন্য সব ক্ষেত্রেও যেমন এ ক্ষেত্রেও তেমনই রবীন্দ্রনাথকে এক হিসেবে প্রায় বিপ্লবী বলা চলে। হিন্দু রমণী হওয়া সত্ত্বেও 'সতী' তার মুসলমান স্বামীর অনুগতা ; এই আনুগত্যের জন্য তাকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। কিন্তু তার স্বামী মৃত এবং নাটক শুরু হবার আগেই যে মৃত সে আনুগত্য পেতে পারে, কিন্তু তাকে নিশ্চয় প্রেমকাহিনীর নায়ক বলা চলে না। শরৎচন্দ্রের অন্নদাদিদির স্বামী আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে মুসলমান হয়েছিল কিন্তু তার চরিত্র গাঢ় কালিতে আঁকা। বস্তুত ভেবে পাইনা ১৯১৫ সালে শৈলবালা 'সেখ আন্দু'র কাহিনী লিখতে বসে কোথা থেকে অনুপ্রেরণা বা মডেল পেয়েছিলেন। সাক্ষাৎকারে শৈলবালা বলেছিলেন তিনি কোনও মুসলমান পরিবারের সঙ্গে কখনও মেশেন নি। তবে একবার স্বপ্নে এক বৃদ্ধ মুসলমান ফকির এবং তার দুই তরুণ সঙ্গীকে দেখেছিলেন। গভীর আদর্শবোধের হিসাবে গোরার সঙ্গে হয়তো সেখ আন্দুর চরিত্রের কিছু মিল আছে, কিন্তু গোরা আইরিশ মাতাপিতার সন্তান হতে পারে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও মুসলমানের ঘরে তাঁর নায়কের জন্ম কল্পনা করা সম্ভব ছিল না। হয়তো যে উদার সংস্কারমুক্ত মানবিক চেতনা ব্রাহ্ম আন্দোলনের সূত্রে শিক্ষিত হিন্দুমনে সাময়িকভাবে হলেও স্বাস্থ্যকর প্রভাব ফেলেছিল তার ক্ষীয়মাণ বিভা গোঁড়া হিন্দু ঘরের বউ হওয়া সত্ত্বেও শৈলবালার মনকে আলোকিত করেছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর আদৌ কোনও যোগাযোগ ঘটেছিল কিনা জানিনা, কিন্তু সে যুগের বিখ্যাত সম্পাদক এবং ব্রাহ্ম আদর্শবাদী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যে নিতান্ত অপরিচিতা এই তরুণীর সাহসী প্রথম উপন্যাসটিকে তাঁর প্রভাবশালী মাসিকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছিলেন তা থেকে সন্দেহ থাকে না যে শৈলবালার সংস্কারমুক্ত প্রতিভাস তাঁর উদারপন্থী বিচারে মূল্যবান এবং বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে হয়েছিল।

সেখ আন্দুর পিতৃদত্ত নাম আনোয়ার উদ্দীন। তার সঙ্গে যখন আমাদের প্রথম পরিচয় হয় তখন তার নায়ক হবার যোগ্যতা বিষয়ে লেখিকার বর্ণনা থেকেই জানতে পারি :

আন্দুর দৈহিক গঠন পৌরুষ কঠিন—কিন্তু লাবণ্য বর্জিত নয়। প্রশস্ত ললাটে মমতাশীলতার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতেছে, চক্ষু দুটি নম্র, স্নিগ্ধ, বিশালবক্ষ, আজানুলম্বিত বাহু, সর্বশরীর পেশীবহুল, পুষ্ট, সুন্দর, মনোরম লাবণ্যে উদ্ভাসিত।

(প্রবাসী, পঞ্চদশভাগ, প্রথম খণ্ড, ১৩২২ বৈশাখ, পৃঃ ১৪২)

আন্দু "শুচিতাসম্পন্ন", "সুকোমল হৃদয়", "দৃঢ় প্রকৃতি", "সাবলম্বী", "বিদ্যাগ্রহী", কিন্তু "বড় বেশী ঝোঁকাল লোক"। "তার মনের তেজ বড় প্রবল"—তার গুরুস্থানীয় পণ্ডিতজী তাকে সেজন্য "খুব সাবধান" হতে উপদেশ দেন (পৃঃ ৭৩১)। সে নানা কাজে সুনিপুণ, প্রত্যেকটি কাজই অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে করে। কিন্তু কোনও একটি নির্দিষ্ট কাজের মধ্যে সে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে অনিচ্ছুক। তার ভিতরে এক গভীর অদম্য অস্থিরতা আছে যা সম্ভবত তার ক্ষান্তিহীন জীবন জিজ্ঞাসারই প্রকাশ। তার সারারাত জেগে বই পড়া দেখে যখন প্রশ্ন ওঠে এত বই পড়ে লাভ কী। তখন সে "নিজের মনে উত্তর দেয়, এতে জগতের তো কোন অপকার নাই।" লেখিকা আমাদের জানান, "সে চায় মনকে একটু উন্নত করিতে।" (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৪৭) বই পড়া তার নেশা, বই পড়ে সে "আনন্দ পায়", "সামান্য বিদ্যা হইলেও সেক্সপীয়ারও তাহার হস্তে পরিত্রাণ পান নাই" (পৃঃ ১৪৭)। একসময়ে তার বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভবতারণ প্রশ্ন করে, "তোমার জীবনের লক্ষ্যটা কি?"

"আমার জীবনের লক্ষ্য!" শান্তভাবে হাসিয়া আন্দু বলিল, "আমার জীবনের লক্ষ্য?—সকলের সঙ্গে আমার জীবন জড়িয়ে রয়েছে, সকলের শুভ ভিন্ন আমার শুভ নাই—এই মোটা ধারণাটা মনের মধ্যে পুষে ভগবানের নাম নিয়ে সকল ভাল চেষ্টায় হাত দেবো, তারপর ঈশ্বরের ইচ্ছা!" (প্রথম খণ্ড পৃঃ ২৬৪)

কিন্তু যেটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়, সেখ আন্দু বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নায়কদের মতো বড় ঘরের সন্তান নয়, স্কুলে বেশিদূর লেখাপড়ার সুযোগ তার হয়নি, অল্পবয়স থেকেই তাকে কায়িকশ্রম করে জীবিকা উপার্জন করতে হয়েছে। বিহারী, গোরা, বা নিখিলেশের মতো আদর্শবাদী হলেও তাদের মতো সে না জন্মসূত্রে বিত্তবান না উচ্চকুলোদ্ভব। শৈলবালা শুধু মুসলমান যুবককে আদর্শ নায়ক হিসেবে কল্পনা করে অসম সাহসের পরিচয় দেননি, নিচের

তলার একটি মানুষকে তার স্বোপার্জিত চরিত্রের জোরে আমাদের কাছে শ্রদ্ধাভাজন করে তুলে নবযুগের আভাসও দিয়েছেন। আন্দুর পিতার ছিল দর্জির পেশা। আন্দু খুব নিপুণভাবে সূচীকর্ম লেসের কাজ, চিকন শিল্প, কামদারী ইত্যাদি শিখেছিল (কোন্ কাজেই বা সে দক্ষতা অর্জন করেনি?) কিন্তু দর্জির কাজে তার মন না বসায় তার বাবা তাকে স্কুলে পাঠান। প্রথম শ্রেণীতে ওঠার পর পিতা তাকে স্কুল ছাড়িয়ে নিজের দর্জির দোকানেই আবার বসিয়ে দিলেন। কিন্তু আন্দু পিতার অজ্ঞাতে "এক অভিজ্ঞ লোকের কাছে আরবি, ফারসি শিখিতে লাগিল। কিছুদিন শিখিয়া সে বহুগ্রন্থ পাঠ করিয়া ফেলিল।" তারপর সে আগ্রায় গিয়ে কিছুদিন চিত্রবিদ্যা শিখল, কিন্তু শিক্ষক তার ছবি বিশেষ প্রশংসা করায় তার উৎসাহ চলে গেল।

"যাহা দুষ্প্রাপ্য তাহার উপরেই আন্দুর আগ্রহ—যাহা অনায়াস লভ্য তাহার আর বিশেষত্ব কি?"

(প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৪৫)

আন্দু তারপর কুস্তি এবং গানবাজনায় তালিম নেয়। এক সাহেবের কাছে মোটরগাড়ি চালানো শেখে। বাবা মারা যাবার পর সমস্ত ধারদেনা শোধ করে দর্জির দোকানের পাট তুলে দেয়, এবং ভাগলপুরে চৌধুরী সাহেবের মোটরগাড়ি চালকের চাকরি নেয়। শিক্ষা, নানা বিষয়ে দক্ষতা, স্বভাবজাত পরোপকারপ্রবণতা চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং বিনয় তাকে অল্প সময়ের ভিতরে সেখানে সকলের প্রিয় ব্যক্তি করে তোলে। এখানেই এই কাহিনীর সূচনা।

চৌধুরী সাহেবের সপ্তদশবর্ষীয়া কন্যা লতিকা এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে গ্রীষ্মের ছুটিতে ভাগলপুরে বেড়াতে এসেছে। সঙ্গে নিয়ে এসেছে তার সহধায়িনী এবং পিতৃবন্ধুর কন্যা জ্যোৎস্নাকে। জ্যোৎস্না বিবাহিতা; তার স্বামী ইঞ্জিনিয়ারিং শিখতে আমেরিকায় গেছে; তার স্বভাব স্নিগ্ধ, প্রকৃতি কোমল। অপরপক্ষে, অবিবাহিতা লতিকা সুন্দরী বটে কিন্তু "অস্বাভাবিক অহংকারে" তার সৌন্দর্যশ্রীর উপরে একটা উগ্রতা এসে পড়েছে। লতিকার ভাবী স্বামী বম্বেতে চিকিৎসাবিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার জন্য গেছেন। লতিকা ভাবী স্বামীর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করে না। আন্দুর রূপ গুণ দেখে লতিকা মুগ্ধ; মনের নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব জয় করে অবশেষে সে দীর্ঘ আট পৃষ্ঠার একটি প্রেমপত্র লিখে আন্দুর ঘরে রেখে যায়—জানায় যে সে আন্দুকে বিয়ে করতে চায়। এই চিঠি পড়ে আন্দু প্রথমে খুব বিক্ষুব্ধ হয়, পরে ভেবে দেখে তার নিজের মনে কোন পাপ নেই, সে কোনভাবেই লতিকাকে তার প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেনি। চিঠিটি সে পুড়িয়ে ফেলে। লতিকা আন্দুর ঘরে এসে তার কাঁধে হাত রাখায় সে বিদ্যুৎপৃষ্ট বোধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। তারপর সে চৌধুরী সাহেবের কাজ ছেড়ে দিয়ে ভাগলপুর ত্যাগ করে চলে যায়।

বাপের মুসলমান ড্রাইভারকে উচ্ছ্বসিত প্রেমপত্র লিখে এবং তার ঘরে গিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে লতিকা তার সৃষ্টিকর্ত্রীর চাইতে দুনো সাহস দেখিয়েছে, কিন্তু তার চরিত্রের অগভীরতা এবং অসংযমের সঙ্গে এই সাময়িক সাহস এবং আকুলতা সহজেই মানিয়ে গেছে। যথাসময়ে লতিকার বিয়ে হয়েছে, আন্দুর সঙ্গে তার আরেকবার দেখাও হয়েছে, তরুণ বয়সের অস্থিরচিত্ততা এবং অহংকারী ভাব তখনও তার যায়নি। লতিকা আন্দুকেও কিছুটা উন্মনা করেছিল, কিন্তু আন্দু যদি লতিকার প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে তাকে নিয়ে পালিয়ে যেত তাহলে হয়ত লেখিকার র‍্যাডিক্যালিজ্‌ম্ স্পষ্টতর হত, কিন্তু আন্দুর চরিত্রের সঙ্গে সে আচরণ একেবারেই মিলত না, এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কও অল্পসময়ের মধ্যেই বহুরন্ধ্র হয়ে যেত। লতিকা আয়েষা নয়; এবং আন্দুও সেই প্রকৃতির মানুষ যারা সারা জীবন অন্বেষণ এবং পরসেবায় কাটায়, নিজেরা বিয়ে করে হিসেবী সংসারী হয় না।

আন্দুর সবচাইতে ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং তার জীবনের উপরে সবচাইতে প্রভাবশালী শিক্ষাগুরু দুজনেই হিন্দু। তার কুস্তির আখড়ায় মেলা বন্ধু ভবতারণ চাটুজ্জে আদালতের কেরানি। সংস্কারমুক্ত উদারপ্রকৃতির এই সদ্য বিবাহিত যুবকের বর্ষিয়সী বিধবা দিদিকে আন্দু "মা" বলে। ভবতারণের মা আন্দুকে ডাকেন "নাৎজামাই", ভবতারণের ছোটভাই হরু আন্দুকে "মামা" বলে জড়িয়ে ধরে। আন্দু ব্যস্ত হয়ে বলে, "এই যাঃ! মুসলমানকে ছুঁয়ে ফেল্লে।" তখন ভবতারণের দিদি বলেন, "তা হোক, জামাকাপড় ছেড়ে ফেলবে।" ভবতারণের জন্যে কোন আচারবিচার নেই। সে তাই দিদিকে প্রশ্ন করে:

"যদি জানছই যে একদিকে তোমরা যতখানি আচার করে চলেছ, অন্যদিকে আমি ততখানিই অনাচারে চলছি, তবে এত ছোঁয়াছুঁয়ি বিচার কেন?"

দিদি···ভ্রাতার কথায় হাসিয়া মাথা নাড়িয়া স্নেহভাবে

বলিলেন, "তা জানিনা ভাই"।

(প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৬৯)

ভবতারণ বন্ধুকে একেবারে অন্দরে তার নিজের বউয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। পরিহাস করে বলে, "একে আশীর্বাদ করো, বল সাধা স্বরে বাঁধা বোল—ছেলে হোক।"

ভবতারণের স্ত্রীর বয়স তখন ১৪। সেখ আন্দু অক্ষয়কুমার দত্তের লেখা পড়েছিল কিনা উপন্যাস থেকে তা জানা যায়না। কিন্তু সে যা বলে ১৯১৫ সালে তা প্রায় বৈপ্লবিক:

"আমি এরই মধ্যে ছেলে হবার আহাম্মুখী আশীর্বাদ করব না। ছেলেমানুষের ছেলে! সে আশীর্বাদ নয়, সে অভিশাপ। আমি ভগবানের নামে প্রার্থনা করছি নিজেরা আগে 'মানুষ' হোন—ছেলেকে আগে 'মানুষ' করবার ক্ষমতা হোক, তারপর যেন হয়, আরও বছর পাঁচছয় পরে।

ভবতারণ প্রীতমুখে তাহার পিঠ ঠুকিয়া বলিল, ঠিক কথা! বুদ্ধিমান জামাই বটে।"

(প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৬৩)

মনে রাখা দরকার শারদা আইন পাশ হয় পনের বছর পরে ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে। মার্গারেট ম্যাক্সারের বার্থ কণ্ট্রোল আন্দোলনের সমর্থন করে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে লেখেন ১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। সেখ আন্দু নিজে এবং তার সৃষ্টিকর্ত্রী আর যাই হোন শ্রীকুমার কথিত "পুরাতনেরই পোষক" ছিলেন না। ভবতারণের মত অক্ষয়কুমারও নিশ্চয় তাদের বিবেচনাবুদ্ধিকে তারিক করতেন।

॥ চার ॥

ভাগলপুর থেকে বেরিয়ে শেখ আন্দুর অডিসি শুরু হয়। ট্রেনে তার পরিচয় হল পণ্ডিত রামকিঙ্কর চৌবের সঙ্গে। তাঁর আকর্ষণে এবং পরামর্শে দিল্লী না গিয়ে সেকেন্দ্রাবাদে নেমে পড়ে। তার সেনাবিভাগে যোগ দেবার চেষ্টা সফল হয় না। উপার্জনের জন্য রাজমিস্ত্রীর কাজ শিখতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতজীর ছাত্র হয়ে তাঁর কাছে নিয়মিতভাবে সংস্কৃত পাঠ নেয়। এই পণ্ডিতজী (স্থানীয় লোকেরা যাঁকে দাদাজী বলে) খুবই মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ; আন্দু তাঁর কাছে শুধু সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও দর্শনে পাঠ নেয় না, তাঁর প্রভাবে তার নিজস্ব বুদ্ধিবিবেক সূক্ষ্মতর এবং বলিষ্ঠতর হয়। দাদাজীই তার যথার্থ শিক্ষাগুরু।

আরবি এবং ফারসির পরে ইংরেজি এবং সংস্কৃত শিখলেও আন্দুর জীবন কেতাবী বিদ্যার জগতে আবদ্ধ ছিল না, তা সম্ভবও ছিল না। পুলিস সাহেবের প্রাণরক্ষার ফলে সে পুলিস বিভাগে চাকরি পায়, কিন্তু এখানকার কাজ তাকে ক্রমাগত পীড়ন করতে থাকে। তার মনে আত্মগ্লানি হয়। অল্প বয়স থেকেই সে স্বাবলম্বী, জীবিকা উপার্জন স্বাবলম্বনের প্রথম শর্ত। কিন্তু যে জীবিকায় বিবেকবুদ্ধি অনুসারে চলা প্রায় অসম্ভব তাকে অবলম্বন করা অসঙ্গত। একজন যথার্থ স্বাধীনচিত্ত ব্যক্তির মতই আন্দু ভাবে, "অবস্থার দাস হওয়া নয়, অবস্থাকে নিজের দাস করিতে পারাতেই পৌরুষের জয়।" শীকারগঞ্জে নিজের ন্যায়বোধ অনুযায়ী কাজ করার ফলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার বিরোধ হয় এবং সে তৎক্ষণাৎ পুলিশের চাকরিতে ইস্তফা দেয়। তারপর কিছুদিন স্থানীয় ডোম যুবকদের সঙ্গে মিশে ঝুড়ি, চাঙাড়ি, চাঁচ করতে থাকে। এই সময়ে শ্যামদাস নামে একজন প্রাচীর চিত্রকরের সঙ্গে তার পরিচয় হয়; তার সহকারী হিসেবে সে রমানাথ রায় নামে একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে প্রাচীরচিত্রাঙ্কনের কাজ নেয়। রমানাথের দৌহিত্র রতুর সঙ্গে তার বিশেষ ভাব হয় এবং তার কাছ থেকে জানতে পারে রতুর দিদিই লতিকার একসময়কার সহপাঠিনী এবং আন্দুর পূর্বপরিচিতা জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না এখন বিধবা। রমানাথ অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় কলকাতা থেকে ফিরে আসেন। জ্যোৎস্নার সঙ্গে আন্দুর আবার দেখা হল—তার মনে হল "এমন শুচিস্মিত শান্ত দৃষ্টি" আর সে কোথাও কখনও দেখে নি। সে অনুভব করল জ্যোৎস্নাকেই সে প্রথম থেকে ভালবেসে এসেছে। "জীবনের যে দিকটি সে এতদিন অগ্রাহ্য করিয়াছিল সেটি জাগিয়া উঠিল" এবং "মানবজীবনের সর্বাপেক্ষা মহান অভিজ্ঞতা ইহাই সে সম্বন্ধে তাহার তিলার্ধ সন্দেহ রহিল না।" (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭১)।

জ্যোৎস্নাও যে আন্দুকে গভীরভাবে ভালবাসে তা আমরা কিছু পরে জানতে পারি, কিন্তু আন্দু নিজের সম্পর্কে সজাগ হবার পরে সহজেই বুঝতে পারে এই প্রেমের বহিঃপ্রকাশ বা বাস্তবায়নের চেষ্টা শুধু সর্বনাশেই সমাপ্ত হতে পারে। নিজের ভিতরে দ্বন্দ্ব তার "চিৎশক্তিকে প্রায় নিঃশেষ" করে ফেলে, "মৃত্যুবিহ্বল বিফলতা তাহাকে নির্জীব করিয়া দিল।" সে স্থির করল যে মক্কায় যাবে। কিন্তু তার গুরু দাদাজী তাকে জানালেন রমানাথ মরণাপন্ন, তাঁকে সেবাশুশ্রূষা করার জন্য আন্দুর সেখানে যাওয়া অবশ্য কর্তব্য। সেবার ভিতর দিয়ে জ্যোৎস্না এবং আন্দু পরস্পরের সান্নিধ্যে আসে, কিন্তু ভিতরে

ভিতরে ক্ষতবিক্ষত হলেও আন্দু বোঝে জ্যোৎস্না তার জীবনে "আদর্শ রমণী", তাকে কালিমার স্পর্শ থেকে রক্ষা করতেই হবে। রমানাথ মারা গেলে তাঁর পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের পূর্ণ দায়িত্ব এসে পড়ে দাদাজীর উপরে। নিজের মনের আকুলতা ধরা পড়ে যাবার ভয়ে আন্দু শ্মশান থেকেই পালিয়ে যায়।

এবারে আন্দু জাহাজে খালাসীর কাজ নিয়ে আড়াই বছর দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু তার মনের সুখশান্তি অপহৃত; যে প্রেম অনেক দেরিতে তার জীবনে এল, কিন্তু যাকে প্রকাশ করবার কোনও উপায় পর্যন্ত নেই, তা তার এতদিনের সযত্ন লালিত মনের ভারসাম্যে উলটপালট ঘটায়। এই নিঃসঙ্গ ভ্রাম্যমাণ জীবন এখন দুর্বিসহ ঠেকে। জাহাজ বন্দরে লাগতে সে নেমে পড়ে। সেখানে তার সঙ্গে দাদাজীর আবার দেখা হয়ে যায়। তাঁর কাছে শোনে রতু এবং জ্যোৎস্না দাদাজীর সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছে; সেতুবন্ধ রামেশ্বর হয়ে এখানে এসেছে; এখান থেকে দ্বারকায় যাবে। আন্দু দাদাজীর কাছে নিবেদন করল দ্বারকা তীর্থযাত্রায় সেও সঙ্গী হতে চায়। উদারহৃদয় দাদাজী তাঁর সম্মতি দিলেন এবং যে বাড়িতে তারা উঠেছেন রাত্রিবাসের জন্য সেখানে আন্দুকেও অতিথিরূপে নিয়ে গেলেন। সেখানে আন্দুকে দেখে জ্যোৎস্না "অভিভূত হইয়া পড়িল। আপনার অন্তরের মধ্যে একটা তপ্ত সংঘর্ষণ অনুভব করিয়া জ্যোৎস্না কেমন হইয়া গেল" (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৫৭)। রাত্রে সেই বাড়ির পুকুরের পাশে বসে আন্দু যখন মনের প্রশান্তি এবং পবিত্রতার জন্য কোরাণ পড়ছে তখন জ্যোৎস্না সেখানে এসে তাকে আর্তস্বরে বলল, "তুমি দ্বারকায় যেওনা"। আন্দু তাকে প্রশ্ন করল, "আমাকে ভয় কি?"

"কি ভয় সে যে ভাষায় বুঝাইবার নহে! পরিপূর্ণ আবেগে জ্যোৎস্নার সমস্ত ইন্দ্রিয় নিশ্চল চৈতন্যশূন্য হইতে বসিয়াছে। হৃদপিণ্ড যেন পঞ্জরাস্থি ভেদ করিয়া ঠিকরাইয়া বাহির হইতে চাহিতেছে—মরণাহতের অন্তিম নিঃশ্বাসের মত তাঁহার কণ্ঠ হইতে মৃত্যুমন্ত্র উচ্চারিত হইল—তোমাকে ভয় নয়। তুমি ত মহৎ, তুমি পবিত্র। তোমার নিঃশব্দ ধৈর্য্য আর নীরব আত্মত্যাগ বড় কঠিন, বড় ভয়ানক। তাতেই মনকে মুগ্ধ করে, ভীত করে। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ফিরে যাও—আমার তীর্থ ধর্ম সকল হতে দাও।" (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৫৮)। আদর্শবাদী মুসলমান যুবকটির প্রতি এই ভীরু, অন্তর্মুখী, কোমলস্বভাব, ভাগ্যহত বিধবা হিন্দু যুবতীর অনুরাগ যে কত গভীর, মর্মান্তিক ও নিরুপায় লেখিকা সে বিষয়ে সংশয়ের এতটুকু অবকাশ দেন নি। জ্যোৎস্না লতিকা নয়; অনুচ্চার্য বেদনায় অতি সংগোপনে তার মনের অন্ধকার ফলকে সেখ আন্দুর নায়কোচিত মুখখানি আমৃত্যু উৎকীর্ণ হয়ে থাকবে। জ্যোৎস্না হিন্দুঘরের বিধবা; তার প্রেম নির্ভীক নয়। কিন্তু তা ঐকান্তিক, নির্ভেজাল, নিবিড়। তার আর্ত অনুরোধ তার অবস্থা এবং চরিত্রের পক্ষে স্বাভাবিক।

আন্দু রাজি হয়ে বলল, পরদিন সে জন্মের মত এদেশ ত্যাগ করে চলে যাবে, ভারতবর্ষের মাটিতে আর ফিরে আসবে না। "ঈশ্বর আপনাকে শান্তি দিন।"

আন্দু চলে যাচ্ছিল।

জ্যোৎস্না যন্ত্রণারুদ্ধ স্বরে বলিল, "আমার দুর্বলতা ক্ষমা কর, তোমার অতুল নিষ্ঠার গভীর মহত্ত্ব অনুভবের শক্তি আমার নাই, আমাকে ক্ষমা কর।"

"ক্ষমা"!—আন্দু স্বভাবসুন্দর হাসিমুখে ফিরিয়া দাঁড়াইল, "ক্ষমা"? না দেবী, এর মাঝে ক্ষমা নাই। এত হৃদয়হীন ছেলেখেলায় পরিতাপের কুটুম্বিতা নয়।—এ যে প্রাণের গোপনে প্রাণের আদর্শ পূজার উন্মাদ-সাধনা! এতে যদি অপরাধ থাকে, তবে শাস্তিও আছে। কিন্তু ক্ষমা?—না ক্ষমা নাই!"

আন্দু ধীর পদে চলিয়া গেল। অর্ধমূর্ছিত জ্যোৎস্নার প্রাণে কেবলই বাজিতে লাগিল, এতে যদি অপরাধ থাকে শাস্তিও আছে, কিন্তু ক্ষমা নাই!—পূজার মাঝে কামনাই পাপ—আসক্তি অপরাধ। কিন্তু ত্যাগের ব্রতে, উৎকর্ষের অর্চনা—সে যে আমরণের সাধনার সামগ্রী! তাতে ক্ষমা নাই, ক্ষান্তি নাই—শেষ নাই!

(দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৫৮)

আন্দু জাহাজে উঠে মক্কার দিকে রওনা হয়ে গেল।

লেখা বাহুল্য সেখ আন্দু আদর্শ চরিত্র এবং এ ধরনের আদর্শ পুরুষ হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, নাস্তিক, কোন গোষ্ঠীর মধ্যেই সহজে মেলেনা। এই হিসেবে 'চতুরঙ্গে'র জ্যেঠামশায়-ও আদর্শ চরিত্র—যেমন আদর্শ চরিত্র গোবিন্দ-মাণিক্য বা নিখিলেশ। শৈলবালা অবশ্যই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নন, কিন্তু আদর্শচরিত্র নিয়েও ভাল কাহিনী হয়, এবং আন্দু-লতিকা-জ্যোৎস্নার কাহিনীকে আমার মোটেই অবিশ্বাস্য বা ক্লান্তিকর ঠেকেনি। দাদাজী ঠিকই বলেছিলেন, "আন্দু বড়বেশী ঝোঁকাল লোক···(তার)

মনের তেজ প্রবল।" এই ঝোঁক বা তেজ আন্দুকে গতি এবং প্রাণ প্রাবল্য দিয়েছে, শান্তি বা স্থিরতা দেয়নি। সে সৎ এবং পরোপকারী, মুক্তমনা এবং সুবেদী। প্রেমের শুদ্ধতা এবং যন্ত্রণা দুই-ই সে নিজের জীবনে জেনেছে। শৈলবালা কোন জটিল চরিত্র আঁকবার চেষ্টা করেননি; শচীশের মত আন্দু দুর্বোধ্য নয়। শৈলবালা যখন উপন্যাসটি লেখেন তখন তাঁর বয়স কুড়ি কি একুশ, শিল্পবিচারে উপন্যাসটিতে ত্রুটি আছে, কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে আন্দুর চরিত্রটি যেমন আকর্ষণীয় তেমনি প্রত্যয়ার্হ। বর্তমানে যে নির্বিঘ্নতার যুগের ভিতর দিয়ে আমরা যাচ্ছি—ব্যক্তিকে অকিঞ্চিৎকর, হীনচিত্ত, সংশয়াকুল, বিবেকহীন, অনির্ভরযোগ্য ভাবতেই যখন কয়েক প্রজন্ম ধরে আমরা অভ্যস্ত, যখন কবিতা, কাহিনী, উপন্যাস, নাটক সর্বত্রই মানুষের আত্মিক দীনতা অসহায়তা আপজাত্য প্রবল ভাবে ঘোষিত, যখন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মানবেন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিদের প্রায় পৌরাণিক চরিত্র বলে মনে হয়—তখন সেখ আন্দুকে আধুনিক পাঠকের কাছে আরেক যুগের, আরেক জগতের মানুষ মনে হতে পারে। কিন্তু সেই যুগ, সেই জগতের সঙ্গে পরিচয় সমকালীন নির্বেদ থেকে উদ্ধারের হয়ত সহায়ক, হয়ত অভঙ্গ বঙ্গের বিস্মৃত রেনেসাঁসেরই এক সন্তান সেখ আন্দু। এখন থেকে আটাত্তর বছর আগে যে তরুণী হিন্দু কুলবধূ একটি আদর্শ-বাদী ও হৃদয়বান মুসলমান যুবককে তাঁর কাহিনীর নায়ক-রূপে সযত্নে এঁকেছিলেন তাঁর মুক্তবুদ্ধি, সৎসাহস এবং উজ্জ্বল কল্পনাকে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানাই। শৈলবালার জন্মশত-বর্ষে তাঁর এই ঐতিহাসিক তাৎপর্যান্বিত উপন্যাসটির পুনর্মুদ্রণ বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয়।

জ্যোৎস্নায় পার্লামেণ্ট

সাধন চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় রক্তপাতের ঠিক ১৪ ঘণ্টা আগে ওঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ।

ইনিই যে অম্বুজাক্ষ প্রধান—ধলঘাটের এম. পি.—দূর থেকে বাংলে না দিলে বুঝে ওঠা শক্ত। সাধু-সন্ন্যাসী, টিকিটচেকার বা বিয়ে করতে যাওয়া বরের মত এম. পি.দেরও চিনে ফেলা যায় কী ভাবে! সাইরেনসহ কনভয় বা মঞ্চ-ময়দান-টিভিতে বিশেষভাবে ফলাও না হলে ভি. আই. পি.দের সনাক্তকরণের চটজলদি কোনও কায়দা নেই। বিশেষ দু চারজনের কথা নিপাতনে সিদ্ধ। জামার কলারের পেছনে ছোটছোট ব্যানার, পকেটের ওপার স্টিকার বা কাঁধের কাছে লোগো—মেম্বর অব দি পার্লিয়ামেণ্ট—লিখবার বাধ্যতা-মূলক আইন চালু থাকলে পরিচয় বিভ্রাট হত না। সুতরাং বাতলে দেবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাই ভূজেন্দ্র ব্যক্তিগত চিঠি শুরু করেছিল, এই প্রসঙ্গে, এই ভাবে……

মান্যবরেষু,

ব্যক্তিগত পরিচিতির সূত্রে পত্র লেখককে সনাক্তকরণ সম্ভবে না। ইহা ঘটে নাই। আপনিই অম্বুজাক্ষ প্রধান—চাক্ষুষ উপলব্ধি করিয়াছিলাম সপ্তাহখানেক পূর্বে, ধলঘাটের বাসস্ট্যাণ্ডে। এই গৌড়ভূমিতে একটানা তিনবার নির্বাচিত হইবার সাফল্যে আপনার নাম কিঞ্চিৎ বিদিত। আপনার দল দেশের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র হইলেও, ধলঘাট আপনাদের কব্জায়; স্বাধীনতার পর হইতেই। তথাপি ৪৫ বছরে দলের কোন্দল, গোষ্ঠিদ্বন্দ্ব, বিক্ষোভ ও বিতাড়নে তৃণমূল সংগঠন বেশ খানিকটা লুজ্ হইয়াছে। নিছক সংগঠনের জোর নয়, আপনি জেতেন ব্যক্তিগত রুৎকৌশলেও।

যাক্, অম্বুজাক্ষ প্রধান বলিতে ঠিক কোন মানুষটিকে বোঝায়, কী তাঁহার চেহারার বিশিষ্টতা, নেতা হইবার কী কী বাড়তি গুণ উপস্থিত—চোখজোড়া মুহূর্তে চারপাশ ধরিতে পারে কিনা, হাঁটা-পোষাক-চুলছাঁটা এবং উপস্থিত বুদ্ধি কেমন—মানুষের স্বাভাবিক কৌতূহল থাকিবেই। রাজনীতি-বিদদের মুণ্ডুপাত করিলেও একেবারে চোখের ওপর দেখিবার সুযোগ পাইলে জনগণের বুকের মধ্যে সামান্য বিস্ময় মোচড় দেয় বৈকি!

আপনার ডাইনে এবং বাঁয়ে মাত্র দুইজন কাডার—দলীয় কর্মী; উহাদের তোষামুদে কথাবার্তায় আপনার আকর্ষণ ছিলনা—উভয়ের মাথা উপকাইয়া আপনি চোয়ালের ছোট-ছোট উঠা-নামায় পান চিবাইতেছিলেন। আপনি এবং আমরা একই বাসের অপেক্ষায় ছিলাম।……

ভূজেন্দ্র এবং সঙ্গীরা দাঁড়িয়েছিল। মোট চারজনের ছোট্ট দল। জিলাশহরে কবি সম্মেলন সেরে ফিরছিল কলকাতায়। সারাদিন ধরে স্বল্প সুরাপানে হালকা ভাব। বিকেল সাড়ে তিনটার বাস—তিনটা পঁয়ত্রিশেও গ্যারাজ থেকে স্ট্যাণ্ডে ঢোকেনি। ঝুপড়ি থেকে সিগারেট কিনে বিশ্বজিৎ ভূজেন্দ্রর কানে কিছু বলতেই 'তাই!' ভূজেন্দ্র সামান্য ঘুরে 'অম্বুজাক্ষ প্রধান? কে বলল?' সন্দেহ প্রকাশ করতে বিশ্বজিৎ বলে—নাম-ফাম জানিনা। দোকানদার বলল লোকাল এম. পি. যাচ্ছেন।

—ঐ সামনের ভদ্রলোক?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা! আচ্ছা! ধলঘাটের এম. পি. ত অম্বুজাক্ষ প্রধান!

—হবে!

ভূজেন্দ্র দেখতে পেল পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ওঁর নজরবন্ধ একটি এ্যারিস্টোক্রেট। বাজেট সেসন শুরু হবে। হয়তো শাসকদলের বিরুদ্ধে শাণিত প্রশ্নবাণ এবং পরি-সংখ্যানের বারুদে ঠাসা। টালমাটাল পর্বে, বলা যায় না, বর্তমান সরকার গদিচ্যুত হতে পারে বাজেটপর্বের লড়াইতে। ওঁর একটি ভোটই অত্যন্ত ফলবান। এবং সত্যিই যদি পার্লামেণ্টে ঘটে যায়—মিডিয়া ও জনমানসে টালমাটাল শুরু। কে ভাবতে পারছে ভারতের প্রত্যন্তে ধলঘাট বাস-স্ট্যাণ্ডে ফাল্গুনের সাড়ে তিনটায় যিনি দাঁড়িয়ে হাল্কা মুডে

পান চিবোচ্ছেন, যার পোষাক বলতে ফর্সা, ইস্তিরিপাটের খদ্দরের পাঞ্জাবী এবং ধুতি, কলকব্জা ও রক্ত-রসের সরু-মোটা পাইপ নিয়ে দৈহিক খোলটি চকচকে মেদের পাটিসাপটায় বিট-গাজর ও শশাপিঁয়াজ পাকানো পরোটা মনে হয় যাকে, সরকার পতনের সম্ভাব্য বিস্ফোরণের আগে কানাচের টাইমবমের মত সাধারণ মানুষটি সেজে দাঁড়িয়ে আছেন? এম. পি থেকেও স্ট্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষের কোন তাড়াহুড়ো নেই। ইতিমধ্যে ২৫ মিনিট লেট, এখনও গ্যারেজ থেকে বাস আসেনি। পৌনে আটটায় ট্রেন—তিনঘণ্টার জার্নির পর জংশন স্টেশন থেকে ধরতে হবে। তারপর কলকাতা এবং রাজধানী। বাজেট অধিবেশন। দায়িত্ববোধ আছে কর্তৃ-পক্ষের? কিন্তু এম. পির মধ্যেও হুটোপাটি লক্ষ করা যাচ্ছে না। হয়ত এ যাত্রীদের না নিয়ে ট্রেন যাবে না; যতই বিলম্ব হোক। অথবা এটাই গৌড়ভূমির ধারাবাহিকতা।

ভূজেন্দ্রর দলের অন্দরের ভাবনা বা মাথাব্যথা নেই এম. পি. কে নিয়ে। ও চোখে গগল্‌স চড়িয়ে আছে কিন্তু ভি. আই. পি. র ব্যাপারে নিরাসক্ত নয়। এককালে রাজনীতির ছোঁয়ায় থাকলে যা হয়। খুব ছোটবেলায় অম্বুজাক্ষর দলের সমর্থক ছিল। তাই চিঠির পরের অংশে উল্লেখ করেছিল।

…ঐ ছুটিতেছিল ৭০, ৮০ কিলোমিটার বেগে। হঠাৎ ইচ্ছা হইল, কোন সিটে, কী ভাবে আপনি বসিয়া আছেন। এক্সপ্রেস বাসে গদিতে ডুবিয়া থাকার লুকাচুরিতে আপনাকে পাইলাম না। অবশ্য আমি চেষ্টায় পরিপূর্ণ ছিলাম না, কারণ বেলাশেষের দীর্ঘ গতিপথে আমার সমস্ত মনপ্রাণ দুই পাশের বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রে নিবিড় হইয়াছিল। গৌড়ভূমিতে কেবলমাত্র, আমার অদেখা, এই জিলাটি। জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতায় সব কিছুই মুখোমুখি আকর্ষণীয়। ছোটখাট নদী—দেশদেশান্তরে বহমান, কংক্রিটের নতুন সেতু, ছবির মত লেপা-পোঁছা আদিবাসী কুটির, মাঠের মাঝে টিউব-ওয়েলের 'হাইপারবোলিক' জলের ধারা, মাঝেমাঝে জনপদ, হাট বা পঞ্চায়েতের ক্ষমতার পাকাদালান, জাতীয়পথের দুইপাশে সামাজিক বনস্বজনের বাবলা, ইউক্যালিপটাস—সর্বোপরি দিগন্তখোলা পথে ছুটিবার গম্ভীরতায় মনে হয় কিছুই থামিয়া নাই; বদলাইতেছে।

হঠাৎ দেখিলাম সামনের একটি জোড়া-আসনে আপনি আরামে মাথা সঁপিয়া ঝিমাইতেছেন। আপনার পাটনারটি নেহাৎই কিশোর—ব্যাগ, ব্রিফকেস পাহারা ও টানিবার জন্য আছে। বুঝিলাম এ্যাটেনড্যাণ্ট। জনা দুইযাত্রী—গ্রামের উঠতি পয়সাওয়ালা বোধ করিলাম—মাঝপথ হইতে উঠিয়া ঠিক আপনার ঘাড়ের কাছে ঢুশাইতেছে। যত্রতত্র থামিবার আইন নাই বাসটির। তবু যেন প্রথা হইয়াছে। ড্রাইভার কণ্ডাকটরদের 'টু-পাইস' হয়। কিছু বলিলে উল্টা শুনায়, পরিবহনের দুর্মূল্যে গ্রামের মানুষের জন্য অত আইন মানিলে হয় না। আইনের জন্য মানুষ, না মানুষের জন্য আইন?

আপনি ক্লান্তির ভারে তন্দ্রায় ডুবিতে বদ্ধ পরিকর অথচ বাহিরের পৃথিবীর মানুষ মুক্ত বেলাশেষে শস্যের দানার মত রহস্যময়—হাটে, রাস্তায়, পল্লীতে, দোকানে বা মাঠঘাটের আলপথ ধরিয়া কোথাও পাড়ি দিতেছে।

কখনও বা বিস্ময়ে আমাদের বাসটি দেখিতেছে; জানে না আপনি—নির্বাচিত এম. পি. টি—এই গাড়িতেই আছেন, সঙ্গে ব্রিফকেস—ভিতরে প্রশ্নবাণ ও কাগজপত্রের বারুদ। ভোটাভুটিতে সরকারের পতন ঘটিতে পারে। আপনাকে ঝিমন্ত দেখিতে মন চাহিল না। তাই দেখিলাম আমার পাশেই বসিয়া। এতক্ষণে খুঁটিয়া দেখিবার সুযোগ হইল। আপনার দেহের সুন্দর গন্ধ আছে—যা মাখিলেই 'ইম্‌পরট্যাণ্ট' 'ইম্‌পরট্যাণ্ট' মনে করাইয়া দেয়। আবার ঘাম ও ধুলার ঘ্রাণও পূর্ণ লোপ পায় নাই। বুকময় কাঁচা-পাকা চুল, ফুলো-ফুলো তর্জনীর নিকোটিনে হলুদ নখ; মেট্রোপলিসের ক্লোরিন আর্দ্র জল পান করিলে চামড়ায় যেমন জৌলুস ফোটে, আপনার শ্যামল স্কিন ও তেমন নিভাঁজ, টানটান, স্বাস্থ্যময়। চুল অতীতের বস্তু; করোটিবেষ্টিত কিছু শিরা-উপশিরা সর্বদা তেজোময় হওয়ায়, বুঝি হাই-প্রেসারের রুগী আপনি। নিশ্চয়ই সর্বিট্রেট সঙ্গে রাখেন। আপনার চক্ষুর দানা দুইটিতে গ্রাম্যধূর্ততার প্রলেপ থাকিলেও, পাতাযুগল মেদে ফুলিয়া মানুষের প্রতি ক্ষমার্হ দৃষ্টি প্রতীয়মান হয়। বাস আপনার লোকসভার এলাকা দিয়া ছুটিতেছে। আমার কৌতূহলে জবাব দিলেন—এই নদীটা? ধরলা।

—আগেরটা?

—পুনর্ভবা। ব্রীজ ৮৮তে তৈরি··মুখ্যমন্ত্রী, আমি উদ্বোধনে ছিলাম।·· তখন

বাসের গতিতে, বডি-কম্পনে পরস্পর আলাপের শেষ শব্দটি হারাইয়া যায়। অদ্ভুত!

—বা দিকটা?

শুনিয়া বলিলেন—বর্ডার……কোথাও কোথাও ৪।৫ কিলোমিটার···অনুপ্রবেশ আছে···ধুৎ সম্ভব না'কি···!

—বিরোধীরা যে···

—ভোট !···ওরাও জানে···

বলিলাম—দারুণ আঁখ ফলেছে···চিনিকল···?

—পার্লামেন্টে আমি প্রস্তাব···হবে···বাধ্য···!

—এ পঞ্চায়েৎটা ?···কার দখলে···?

—গতবার লুজ্ করেছি···খারাপ এলাকা···খুন-খারাপি

—কেন ?

—ধানকাটা, স্মাগলিং, গরু···যা হয় !···হ্যাঁ হ্যাঁ, পয়সা আছে কিছু মানুষের···তারাই তো—!

আগামীকাল দোলপূর্ণিমা। মাঝেমধ্যে দুইচারিটা 'বুড়ির ঘরে'র প্রজ্বলিত আগুন। গোধূলিতেই পশ্চিমের লালিমায় চোখ রাখিয়া নির্ভেজাল চাঁদ চলিল বাসের সঙ্গে।

—এই, এই গ্রামটি···দেখুন···!

তাকাইলাম।

—এমন ডোগরা শিল্পের কাজ সারা ভারতে···আমি ঘরে ঘরে ব্যাঙ্কলোনের ব্যবস্থা···পাই-পয়সা শোধ হয়ে·····

—ব্যাঙ্কের গজ্জা যায় না ?

—যায় !···তবে শিল্পপতিরা···তুলনায়···খুবই, খুবই··· এই জেলা ফুরোচ্ছে, আমার এক্তিয়ারও···হ্যাঁ, মানুষ ঝুট-ঝামেলা চায় না···পিস্‌ফুল···ক্ষমতার ঘাঁটি তো আমরা ভাঙতে পেরেছি···নিশ্চয় পাল্টেছে···দেখুন হাটের দোকানে ···লিপস্টিক থেকে ক্যাসেট···সব···

আমি চপলতায় কানেকানে জিজ্ঞাসা করিলাম—কনডোম ?

আপনি হাসিয়া ইংরাজিতে জবাব দিলেন—আপনি কি মনে করেন ইহা ব্যবহারের বিশেষ অধিকার উচ্চবিত্তরাই ভোগ করিবে ?

বলিলাম—স্যার, তারা এ অধিকারকে ভোগের বাধা বলে মনে করে।

ঘনিষ্ঠ মুখভঙ্গিতে বুঝিলাম উত্তরটি মনে ধরিয়াছে। তখনই অনুরোধটি জানাইলাম—ওপার থেকে একটা বিদেশী মাল···

—ধলঘাটের বাজারে খোঁজেন নি ?

—অচেনা বলে সাহস পেলাম না।

—কি ধরনের ?

—ইউমেটিক লেন্স ! বহুদিনের শখ।

—কি করবেন ?

—ডক্যুমেন্টরি বা অডিও-ভিস্যুয়াল কাজকম্ম···

আমার পরিচয় জানিয়া বলিলেন—কবি মানুষ ত ! ভাবজগৎ নিয়ে কারবার ! আমার সুপারিশ চাচ্ছেন কেন ?

—ভুল হল ?

—আমি মন্ত্রী-ফন্ত্রী নই মশাই ! সামান্য এম. পি.।

—ফারাক কোথায় ? সব মন্ত্রীরাই এম. পি.।

—কিন্তু সব এম. পি. তো মন্ত্রী নয়।···এখন ফ্যাশান হয়েছে রাজনীতিকদের পারলেই একটু চিমটি কাটা···দেখুন, আপনিও সামান্য বিদেশী মালের জন্য তেল দিচ্ছেন··· সামলাতে পারলেন না···লোভ কেবল আমাদের জন্যই অন্যায় ?

দেখিতে পাইলাম আপনি তন্দ্রাছন্নই এবং রডধরা যাত্রীটি ক্রমাগত আপনাকে চাপিতেছে। মনে হইল প্রথম অভিজ্ঞতায় এই দেশ, মানুষ এবং বৈচিত্র্য আমাকে নাড়া দিতেছে। আপনি কয়েক শত বার এই পথে ছুটিয়াছেন, জিপ্ বা হাঁটিয়া নির্বাচনী বক্তৃতা দিয়াছেন, সামাজিক-বিন্যাস মুখস্থ করিয়াছেন, মানুষের জীবন-জীবিকার লড়াইতে পাশে দাঁড়াইয়াছেন, লাইসেন্স-প্রশাসন-সেতু-কালভার্ট-হাসপাতাল-খেলার মাঠ-পুষ্করিণী উদ্বোধনে উপস্থিত হইয়াছেন —আজ তাই ঘুম বা জাগরণের বিশেষ হেরফের নাই। কণ্ডাকটরটিকে বলিলাম—দেখুন, দেখুন ! ঘাড়ে পড়ছে যে !···আপনার এলাকার এম. পি. !

কণ্ডাকটর জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় নামবেন, এই যে ভাই !

—পীরতলা ! লোকটি জবাব দিল।

—ফাঁকায় দাঁড়ান···আরাম পাবেন।

লোকটি কী বুঝিল, মালসহ দরজার কাছে বাসভাড়ার সুবাদে হেলায় বাহির করিল একগাদা একশত টাকার নোট।···

জংশন স্টেশনে পৌনে আট। হাতে মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময়। একরাতের জার্নি ; কিছু খেয়ে না উঠলে পথে সুযোগ কম। দীপালি বলে—টানা-ঝানা যাবে না।···বসে খেয়ে নি কোথাও !

দলের বাকি তিনজন নিরুদ্বেগে তিনমুখো হয়ে সিগারেট টানছে। প্রস্তাবে কেউ সাড়া না দেয়ায় শাসনের ভঙ্গিতে বলল—যদি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনারা দুজন—হ্যাঁ আপনারা—ভুজেন্দ্র, মানবেশ—নরম্যাল না হতে পারেন,

আমি আর বিশ্বজিৎ কুইট্ করব ···অসম্ভব !

বিশ্বজিৎ বলে—ওদের ক্রাইসিসে আমরা কুইট করব কেন ?

—সারা বাস উনি জানলার বাইরে···ইনি স্রেফ ঘুম··· কথা নেই, মজা নেই···এ জন্য কলকাতা ছেড়ে এসেছিলাম ?

—তা কেন ? কবিতা পড়তে।

—রাখো। ক-বি-তা !

—ওয়াইফ্ বলে কথা !···আপনি জানেন না কী তুচ্ছ করিলেন ! বিশ্বজিৎ হেসে লঘু হতে চায়। দীপালি বলে —এই যে এত মানুষ স্টেশনে, কে চেনে, কে নাম শুনেছে তোমাদের ?···কার ক্রাইসিসের জন্য তোমাদের কবিতা ? ··ভেবে দেখেছ ?··স্রেফ ঘুঁটের মত ইগোর চাপড়ায় নিজেদের ঢেকে রেখেছ !

—সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছ যে !···ঘুঁটে ? বাড়াবাড়ি ! বিশ্বজিৎ বলে।

—কেন ? ইগো ছাড়া কী ? কাল রাতের ব্যাপারটা স্রেফ নেশা ?

হঠাৎ মানবেশ বাণীর মত উচ্চারণ করে—সামনেই সমুদ্র !

ভুজেন্দ্র জবাব দেয়—আইস, আমরা সমুদ্রের শাসন উপেক্ষা করিয়া পবিত্রভূমি ইজ্রায়েলে চলিয়া যাই !···ডিমের কারি আর রুটির ভালো দোকান···আমি চিনি ··১৫ মিনিটে খেয়েই ট্রেন, ব্যাস !···দীপালি যেভাবে প্রেক্টিজে পেস্টিসাইডস্ ছড়াচ্ছিল ! বাব্বাঃ !

গতরাতে দু জন রক্তারক্তি ঘটিয়েছিল। সকালে সেমিনার, বিকেলে কবিতা পাঠ এবং রাতে ছোট্ট শহরটা ঘুরে বড্ড শ্রান্ত ছিল এরা। দলটা ছিল সার্কিট হাউজে। দুটো কামড়া। মানবেশ এবং ভুজেন্দ্র। দীপালি ও বিশ্বজিৎ—স্বামী-স্ত্রী। কবিতা পাঠে মানবেশ ছিল শ্রোতাদের বিচারে শ্রেষ্ঠ। হাততালি, অনুরোধ এবং কিছু যুবক-যুবতীর অটোগ্রাফ সংগ্রহ। খুশিতে এ ঘরে তাই মানবেশ একটি রেড-লেবেল ভদ্‌কার বোতল নিয়ে বসে। একটু পর, টুং টং শব্দে, চুপিচুপি বিশ্বজিৎ। রাত একটায় সব উজাড় হয়ে গেলে, খালি গ্লাস তুলে মানবেশ বলে এই মুহূর্তে তাকে কিছু আনিয়ে দিতে হবে। ক্রমশ গোঁয়ার হতে থাকে।

—এনে দেবে শালা ! আমাকে ! হ্যাঁ আমাকে !

—অনেক রাত হয়েছে ! মা-ন-ব ! ভুজেন্দ্র সাবধান করে।

—ড্যাম্ ইওর রাত ! আমি মাল চাই !

—চ্যাঁচাস না ! সার্কিট হাউজ জেগে যাবে !

মানবেশের চোখজোড়া ঘোলা এবং ভাওলেন্ট। সামান্য শর্ট্‌স্ পরা। গেঞ্জি। মোটা বুকের লোম। গেলাসটা টেবিলে ঠুকে বলে—আমাকে···এনে দাও !

—মানব !···আমি বলছি···তুমি চ্যাঁচাবে না।···গেট্ আউট করে দেব।

—বাইরে ? ভয় দেখাচ্ছিস, শালা।

—মোটমাট চ্যাঁচাবে না। আমি রেগে যাচ্ছি।

—ফো—ট্ ! এক্ষুনি মাল চাই···বিশ্বজিৎ, এই বিশ্বজিৎ !

স্বামী-স্ত্রী অনুশোচনায় চুপ।

গ্লাসটা দাও···দাও বলছি···ওটা ভাঙবে ! ভুজেন্দ্র দৈহিক ক্ষমতায় হাতটা মুচড়ে বলে—দাও বলছি ! আমিও কম গিলিনি ! মাতলামো করবে না রাত্রে !

—ধ্যাৎ বাঞ্চোৎ ! গ্লাস দেব কেন ? মাল কৈ ?

—তুমি···চেনো না·· আমায় ! হাতের স্ক্রু-প্যাঁচটি কষে ঘুরোতেই মানবেশ শেষ চেষ্টায় একখাবলা কামড় বসিয়ে দিল এবং রক্ত। পার্সোনাল রক্তের লালে, ভুজেন্দ্র দ্রুত দরজা ধাক্কায়—বিশ্বজিৎ ! বিশ্বজিৎ।

স্বামী-স্ত্রী ছুটে আসতেই, 'ধর তো' বলে গ্লাসটা ছিনিয়ে 'রক্ত বার করেছিস ? তালে ছাখ বাঞ্চোৎ' ! বলেই পেশাদারী মারকুটের মত কান, জিনয়ন এবং ভাইটাল স্পট্ খুঁজে স্লো কষাতেই, মাথা নুয়ে মানবেশ পড়ে যায় এবং অসহায় পশুর দৃষ্টিতে, চোখের জল নিয়ে ভুজেন্দ্রকে অনুরোধ জানায়—মেরে ফেলো !···আমায় মেরে ফেলো !...মানুষের জীবনে কিচ্ছু নেই, জিন্ এবং নার্ভ ছাড়া।···অতীত আর বর্তমান।···আমার দুটোই পচে গেছে।···তোমরা কেউ খুন কর আমাকে।

সমস্ত শরীর দিয়ে মানবেশ কাঁদতে, ভুজেন্দ্রর গোঁ থামে। 'জল !' বলতেই, বিশ্বজিৎ, বাথরুম এবং ভরা একটি বালতি।

—এখানে নয়। দরজা খুলে লাশের মত টেনে এনে গ্রিল ঘেরা বারান্দায় ভুজেন্দ্র বলে—ঢাল !

—সারা রাত থাকবে এখানে ?

—তালা আছে।

ফিরে দরজা দিতেই বারান্দায় বমি, গোঙানি, প্রিয়-জনদের স্মরণে মানবেশের কান্নার শব্দ ক্রমশ মফঃস্বলের

রাতপোকার ঝঙ্কার একটু একটু খেয়ে ফেলতেই গভীর শুনশান। সামান্য তুলো-ডেটলে ভূজেন্দ্র আশ্রয় নিয়েছে বিছানায়। এবং আরও ঘণ্টাখানেক বিশ্বজিৎ বাড়াবাড়ির জন্য ধিক্কার দিতে দিতে হঠাৎ গভীর চমকের মত দীপালির মুখে শুনতে পেল—শুধুই নেশার জন্য মারল? নাকি শ্রোতার হাততালি…

বিশ্বজিৎ নেশায় গ্লানির ঝলকানিতে বলে—মাথা নোয়াবার সুখ আমরা হারাতে বসেছি দীপু!

ট্রেনপর্বের শুরুতেই মানবেশ আর ভূজেন্দ্র নতুন বন্ধুতায় ফের পান করল। দীপালির নিষেধে পান-বঞ্চিত বিশ্বজিৎ জানলার ধারে। এবং দীপালি মৃদু কণ্ঠে ধরল গান। ইতি মধ্যে বিশাল নদী, দীর্ঘ বালিগর্ভ এবং সেতুর তলায় জলের ঝমঝম ওরা পেছনে ফেলে এসেছে। বাইরে চাঁদের আলো নিঃঝুম। ভরা পূর্ণিমা। ধূ ধূ মাঠ একা কিংবা দলবাঁধা গাছগুলোকে মনে হয় পায়ের কাছে ছায়ার ফাঁদ পেতে কোনও রহস্য ধরবার মুহূর্ত গুনছে।

ভূজেন্দ্র বার দুই টয়লেটের পথে লক্ষ করল পাশের ক্যুপেতে এম. পি. অম্বুজাক্ষ প্রধান। পাজামা ও গেঞ্জিতে, স্লিপারটি প্রায় জুড়েই টানটান। অতি সস্তা একটি ফিল্ম ম্যাগাজিন পড়ছেন। একেবারে ওপর তলায় সঙ্গের ছেলেটি। ঢুকে সামান্য কুশল বিনিময়ের ইচ্ছে হল ভূজেন্দ্রর; সংকোচে পারা গেল না। উনি কবিতা পড়েন? কে জানে!

—পাশের ক্যুপেতে!…সেই এম. পি.। ভূজেন্দ্র হাসল।

মানবেশ বলে—চাপবি? সেই বাসস্ট্যাণ্ড থেকে… ট্রেনে-বাসে একসাথে কবি, চোর, সাধু, এম. পি. ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, যাদুকর থাকতেই পারে…কে কার খোঁজ রাখছে? …বাইরেটা দেখ, রোমান্টিক!…ঘুম চলবে না কারও!

দীপালি হাসে—কান ভোঁ ভোঁ গেছে? সকাল থেকে বলছিলে যে?

—কাল রাতে সত্যি বল তো, পড়ে গেছলাম?…নাকি অন্য কিছু…?

চারজন হাসির বোমায় যাত্রীদের চমকে দিল।

হঠাৎ গাড়িটা থামল। মাঝে মাঝেই হ্যাঁচকা আটকে পড়ছিল। এবার প্রায় আধঘণ্টা পেরিয়ে গেল। নামগন্ধ নেই।

—এক ঘেয়ে!—মানবেশ বলে—চলো জ্যোৎস্নায় মাঠে বসি।…ছাড়লে উঠে পড়ব।

—তা মন্দ নয়। অভিজ্ঞতা! চলো, সতরঞ্চ ও বোতল গ্লাস নিয়ে…এম. পি.কেও ডাকি।

দীপালি বলে—ওনার ক্যুপ লক।…টয়লেটে যেতে গিয়ে দেখলাম।

বিশ্বজিৎ হেসে বলে—ধরো, আমরা মাঠে গল্প করতে করতে…গাড়ি আওয়াজ করল…ছুটলাম…ধরতে পারলাম না!

—আমি একবার গাঁয়ের মাঠে ঝড়ের শুঁতোয় কপ্টার নামতে দেখেছিলাম।…তেমনই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মানবেশ বলে। ভূজেন্দ্র দেখল সত্যিই পাশের ক্যুপটিতে লক। ভেতরে এম. পি. তারও ভেতরে ব্রিফকেস, তারও ভেতর কাগজপত্র…সরকার পতনের ভোট ও টাইমবম…ইত্যাদি।

দীর্ঘ চিঠির পরের অংশে ভূজেন্দ্র তাই লিখেছিল…

একঘণ্টা পর খবর আসিল সম্মুখে কোথাও মালগাড়ি উল্টাইয়াছে। সারা রাত আমাদের এই স্থানে কাটাইতে হইবে। এই বিড়ম্বনা এড়াইতে ঠিক হইল নামিয়া মাঠে বসিব। জ্যোৎস্নায় সুরাপান মন্দ নয়। আপনাকে অনুরোধ করিতে গন্ধীর হইলেন—উদোম খোলা মাঠে?…রাতে?… সিকিউরিটির কথা মাথায় আছে?

—গ্রাম নেই, গাঁ নেই…কেবল মাঠ আর বাগান…কে মশাই খবর পাবে গাড়ির বিভ্রাটে আপনি মাঠে বসে হাওয়া খাচ্ছেন?

—এটা আমার এলাকাও নয় যে কাউকে বোঝান যাবে কিছু…।

—এখানে ট্রেনপ্যাসেঞ্জার ছাড়া কেউ নেই।…আপনি যখন গাড়িতে, কর্তৃপক্ষ আর্ম-গার্ডও নিশ্চয় বাড়িয়েছে।

—শরীরটা কেমন ঘুমঘুম লাগচে!…আজ থাক…!

তখন আপনার পাঁজরে কাতুকুতু শুরু করিলাম।

—এই যা! কি হচ্ছে মাইরি! বলিয়াই আপনি ক্রমাগত গুট্‌লি পাকাইতে লাগিলেন। অবশেষে সমস্ত প্রতিরোধ বিসর্জন দিয়া পাঞ্জাবী চাপাইয়া বলিলেন—বাসের পরিচয় যে এত ঘনিষ্ঠ হবে বুঝিনি।…সঙ্গে কিছু নিয়েছেন?

—না।

—এটাও আমার ওপর?…বেশ, এক্সপোর্ট বস্তু খাওয়াব। …শর্ত, হাকুশ গিলবেন না…রয়ে-সয়ে সিপ্ দেবেন। কবিরা এ ব্যাপারে হাংরি…কিন্তু যথেষ্ট সাপ্লায়ের সুযোগ নেই এই মুহূর্তে।

সতরঞ্চে আপনি কুহকী-জ্যোৎস্নায় প্লুত হইলেন। আকাশ সামান্য নীলাভ। একটা কলি গুনগুন করিয়া উঠিলেন—এ রাত, এ চাঁদ…ফির কাঁহা!

বিস্মিত হইলাম—এই গান? আপনি গাইছেন?

—গাইব না?…বিয়ের পর হনিমুনে প্রথম এই বইটা দেখেছিলাম…খুব মনে আছে!

দীপালি বলিল—সাধু! সাধু! বিয়ের আগে কিছু?

—আমাদের যুগে সুযোগ কম ছিল।

—তবু ছিল। কিন্তু আপনি নেননি, কেমন?

—ঠিক!…কিছু গন্ধ গাচ্ছেন বাতাসে?

বলিলাম—মুকুলের।…আমের সিজ্‌ন তো!

সত্যিই দূরাগত বাতাস উগ্র মাদকতায় ভরিয়া আছে।

আপনি প্রতিবাদ জানাইলেন—অসম্ভব! এ গোলাপের গন্ধ।

—গোলাপ? না, না। আমের মুকুল। মানবেশ বলিল।

—গোলাপ সম্পর্কে আপনার কতটুকু অভিজ্ঞতা? বলিয়াই আপনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে, হিলস্টেশনে, এমন কি হবুটিকালচারাল সংস্থার গোলাপ বিজ্ঞান সম্পর্কে ছোটখাট বক্তৃতা দিলেন। আমি বলিলাম—দূর ছাই! জেলাটা আমের জন্য বিখ্যাত…দেখছেন না দূরে দূরে আম-বাগান…এবার ফলন খুব ভালো…এখানের আমবাগানেই তো…এই জ্যোৎস্না আমাদের স্বাধীনতাকে বিট্রে করেছিল সেদিন।…নইলে ক্লাইভ গুণ্ডাটা থাকত কোথায়?

আপনি গোলাপের বক্তৃতা সংবরণ করিলেন। টের পাইতেছিলাম আপনার এক্সপোর্ট মালের বিস্ফোরক ক্ষমতা! দীপালি গানের পর গান গাহিতেছে, বিশ্বজিৎএর মুখের তবলা থামিতেছে না, মানবেশ চুপ থাকিবার মজা পাইতেছে, আমার মনে হইল দূরের বাগান, গাছপালা সহ আমি ডানা পরিয়া চাঁদের আলোয় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।

আপনি বলিলেন—যা হাল দেখছি, সারা রাতই জ্যোৎস্নায় থাকতে হবে। শুধু সুরা আর তর্কে কুলোবে?

—পার্লামেণ্টের গল্প বলুন।

—রাজনীতি কাজের বস্তু মশাই, গল্প নয়। সঙ্গে তাস আছে?

—কেন?

—খেলতাম। স্টেকে।…জেতা হারার টান বেটান থাকলে কখন যে সময় কাটে, টের পাওয়া যায় না।

—নার্ভে চাপ পড়ে না?

—ওটাই টনিক। মজা!…কোনও ইস্যুতে ভোটাভুটির পর, পার্লামেণ্টের বাইরে মুখ দেখাব কী করে? কিংবা ওরা?…পরে দেখলাম নার্ভের এই চাপটুকুর জন্যই পরে সম্পর্কটা ভালো থাকে।

—আপনারা ওখানে মোট সংখ্যায় কত?

—এখন? এই মুহূর্তে? বলা শক্ত।

—বিনে পয়সায় প্লেনে চড়তে পারেন?

—সারা ভারতবর্ষ আমি ঘুরতে পারি। ঘুরেছিও। যতই মন্দির-মসজিদের আগুন ছড়াক, দেখেছি দেশটা কেবল সমুদ্র বা পাহাড় ঘেরা নয়, ফুল ও ফলেরও স্বর্গরাজ্য!… ক'জন বিদেশী এ জেলার আমের মাহাত্ম্য জানে?…এম. পি.দের শুধু দুষলে হবে না, আসল ব্যাপারটা কী জানেন?

—বলুন।

—আপনার আমার মধ্যে ফারাক সামান্যই। আপনারা সমুদ্রের ডুবুরী, ফাইটার প্লেনের পাইলট, বুলফাইটার, প্যারাসুট বানানো ইঞ্জিনিয়ার, বিভিন্ন রাষ্ট্রদূত—নানা জীবিকার মানুষ দেখেন নি, চেনেন না; আমি সব দেখেছি। …বলতে পারেন পার্লামেণ্টে আছি বলে বাড়তি সুযোগ পেয়ে ওগুলো…ঠিক বাড়তি নয়, আইনের জোরেই…

—শুধু তাই বা কেন! আপনি হাত লম্বা করতে পারেন, পা মোটা করতে পারেন, নাকটা পারেন ছুঁচলো করতে, ইচ্ছেমত ভাঁজ ফেলতে……দরকার হলে কাঁধে দুটো মাথা নিয়েও চলতে ফিরতে পারেন।

—সারা রাত তর্কই করবেন? এ জন্য ডেকে আনলেন? সংসার, চাকরি, পাড়া-পট্টি, বউ ছেলেমেয়ের ওপর কে না ক্ষমতা ভোগ করছে? খুঁজে দেখুন, কেউ না কেউ কোথাও না কোথাও ঘাড়ে ডবল মাথা নিয়ে ঘুরতে পারে।

আপনি হাসিলেন এরপর। জিজ্ঞাসা করিলাম—কবিতা পড়েন?

—ছেলেবেলায় অভ্যাস ছিল।…এখন দারুন খারাপ এফেকট হয়।

—কিডনি? স্টমাক না হার্টে?

—তা নয়।…একবার শোনাতে পারলেই দরবার শুরু হবে যোগাযোগ কিংবা লবি ধরবার জন্য। আমার আবার ছুঁচো মেরে হাত গন্ধে রাগ হয়।…মনে হয় যেন শ্মশান যাত্রায় যাচ্ছি।

মানবেশ বলিল—জানেন কি পবিত্র গঙ্গা প্রতিবছর কত

মড়া বুকে ভাসিয়ে রাখে ?

—রাখুন মশাই। মরে গেলে কে কোথায় ভাসল ইনটারেস্ট নেই। জন্মালে মরতে হবে—ব্যাস।

প্রশ্নটা ছুঁড়লেন কেন? বুঝতে পেরেছি! আপনি নদীশুদ্ধিকরণের স্কিমটার কথা বলছেন, তাই না?

—চমৎকার!

—দেখলেন, কেমন ধরলুম।···আমি পশুপাখির ডাক শুনে মানুষের শুভ-অশুভ আন্দাজ করতে পারি।···ঠিক বর্ষার রাতে যদি মেয়ে কোকিলের ডাক শোনেন উঠোনে, বুঝবেন সে বছর আপনার চালে নতুন টিন উঠবে না।

—অম্বুজাক্ষ বাবু! আমি ডাকিতেই, 'বলুন' বলিয়া মনথারাপের ভঙ্গিতে দূর মাঠের দিকে চাহিয়া থাকিলেন। গাড়িটা আমাদের মৃত শুঁয়াপোকার মত; দূরে সিগনালের লাল নিষেধ।

—ইওরোপে কেউ মেয়ে কোকিলের ডাক শুনেছে? জিজ্ঞাসা করিলাম।

—আমি কোথাও যাইনি ভাই, মিথ্যে বলব না।··· আবোলতাবোল না বকে খুঁজুন না সারা গাড়িতে কেউ তাস এনেছে কিনা? একটু জুয়ো খেলি!

মানবেশ জিজ্ঞাসা করিল—পৃথিবীতে প্রতি সেকেণ্ডে কত টাকা জুয়োর জোঁকা হয়, জানেন? কাগজে বেরিয়েছিল।

—আপনি দেখছি ভাই রগুড়ে কুইজ মাস্টার!···এত জেনে কী লাভ? আমার দেশেই মৌমাছি সারা বছর মোট কত মধু সৃষ্টি করে এবং মানুষ কত অংশ প্রয়োজনে কুড়িয়ে পায় বলতে পারেন।···সংখ্যাতত্ত্ব একটি মস্ত ধাঁধাঁ।

মানবেশ আহত হইল। হঠাৎ গান থামাইয়া দীপালি দূর আলপথে আঙুল তুলিয়া বলিল—মানুষের দল মনে হচ্ছে? পাড়ি দিচ্ছে কোথাও?

—তাই ত! এভাবে বসে থাকা ঠিক নয়।···তখন বললাম, শুনলেন না কথা!···আমার এলাকাও নয় যে বললে তারা শুনবে। আমি জানি গ্রামের মানুষ মড়া পোড়াতে, ভূত খুঁজতে, সাপ ধরতে কি বর্ডার ক্রশ, স্মাগলিং বা লেবার খাটতে সারা রাত দলবেঁধে মাঠ ভাঙে। এ সব এলাকার নিয়ম।

আপনি উঠি-উঠি করিতেছিলেন। রাত তখন মধ্যপ্রহরে। ইতিমধ্যে অনেক পার্টিই ট্রেন হইতে নামিয়া জ্যোৎস্নায় হাওয়া খাইতেছে। যেন মহাকাশ যান হইতে অন্যগ্রহে পায়চারির অভিজ্ঞতা লইতেছে। বিশ্বজিৎ বলিল—না, না, মানুষের দল না! আলো ছায়ায় হালোসিনেসন! 'ইউ-রেকার' মত আপনি চিৎকার দিলেন—হতে পারে! আমার এ অভিজ্ঞতা আছে! খরা, বন্যা বা কোথাও পাহাড় টাহাড় উল্টে গেলে আমরা সরকারি কমিশনের মেম্বর হয়ে যখন সার্কিট হাউজে উঠি···সাহায্যের বিলাপে রাতে বিরেতে যত হাজির হয়···থানা-পুলিশ এবং চৌকিদার বলে তহশিলে অত জ্যান্ত লোকই নেই!···হালোসিনেসন ভারি বেকায়দায় ফেলে মানুষকে।

—কি খেলেন এক্ষুনি? বিশ্বজিৎ আপনার বড়ি মুখে পুরিবার ঘটনায় কৌতূহলী। হাসিয়া উত্তর দিলেন—শুকনো নেশার অভ্যেস নেই মশাই। এ্যাণ্টাসিড্ খেলাম।

—অম্বলের দোষ আছে?

—দারুন।·····রাতকাত জাগলে ভোরবেলা স্রেফ খুনোখুনি!

—অর্শেরও···

—প্রবল ভাবে। আমার দ্বিতীয় ব্যাধি, পিঠে নার্ভের যন্ত্রণা।···অজ্ঞান হয়ে যাই।···সব সময় হয় না, মানসিক আঘাত পেলেই।···নইলে সম্পূর্ণ সুস্থ।

হঠাৎ কথা বন্ধ, করতলটি মেলিয়া বলিলেন—দেখুন তো হাতটা! আপনি এ বিদ্যে জানেন মনে হচ্ছে।

—ধরেছেন ঠিক! এ আলোতে কিন্তু বলা যাবে না।

—তবু যা হোক!

—খুবই জরুরি?

—নিজের ভাগ্য জরুরি বটেই!

—ভাগ্য বিশ্বাস করেন? মানবেশ দংশনের সুযোগ পাইল।

—কে করে না মশাই? মানুষের প্রতিনিধি বলে অবাক হচ্ছেন?···জীবনটা সবারই নির্দিষ্ট। আমি এম. পি. হবই··· আপনি কবি হবেন বাঁধা···কেউ ডাক্তার, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ মহন্ত···আপনি না চাইলেও ঠেলে আপনাকে বানিয়ে দেবে···প্রতিনিধি বলে দশটা কাঁধ, দু মণ ব্যস্ততা, দশ কিলো শোক, দৌড়-ঝাঁপ, ৬ ডজন হাত-পা, ৩০ ঘণ্টায় একদিন, সব কিছু অবিশ্বাসের কালচার—কোনও দরকার নেই মশাই।

—কী জানতে চাচ্ছেন তবে? কবে মরবেন? বিপদ আসবে কি না? কে ল্যাং মারবে?

—আপনি বুঝবেন না। ভুজেন ভাই, দেখে দিন মশাই!

রাত্রি শেষ হইতে চলিল। আপনি বলিলেন—যন্ত্র আমাদের মূর্খ বানায়···আমরা কেউ আকাশ পড়ে সময় দেখতে জানিনা···দরকার হয় না বলে!

নেশা ছুটিতে শুরু করিয়াছে। ট্রেন তবু নড়ে না। কে বলে রাত্রি স্তব্ধ? কয়েক কোটি কীট-পতঙ্গের পুরুষ-রমণীরা সংগমে উতলা হইতেছে। গাছগুলি ফটাফট শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিতেছে—রাত্রি পোহাইলে বন্‌বন্ করিয়া খাদ্য প্রস্তুত করিতে হইবে।

দীপালি ধাঁধার মত বলিল—ধরুন গাড়িটা হঠাৎ ছাড়ল, আমরা গল্পে ব্যস্ত, ছুটলাম পড়ে, একটুর জন্য হ্যাণ্ডেল ফসকে গেল? কেউ উঠল, কেউ পারল না? আপনি হাসিলেন—চিন্তা করবেন না।···সব নতুন ঘটনাই মুখেমুখে জোড়া লেগে পুরনো নকশাটা বানিয়ে ফেলে। আমরাও যখন বিদেশ, প্রতিরক্ষা এবং গোয়েন্দাদের গোপন খবর পাই, দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ল-এন-অর্ডার লুঠমার চলে···ভাবি, এই বুঝি গেল! ডুবল সব কিছু!···আদৌ হয় না সেটা।···যেমন ছিল, তাই থাকে কিছু দিন পর···দেখবেন ঠিক পুরনো নকশাটাই ফিরে আসে।···বীজমন্ত্রটি শিখে, যাচাই করে নেবেন। হ্যাঁ, প্রথম রাতের বাতাসে মুকুলেরই গন্ধ ছিল, ভুলের জন্য ক্ষমা-প্রার্থী।···এখন কিন্তু আমার অনুমানই সত্য···পাচ্ছেন? নিশ্চয়ই কাছে পিঠে গোলাপের বাগান আছে!

জোয়ারে নৌকা খোলার মত, জ্যোৎস্নায় গুঞ্জন শুনিতে বুঝিলাম ট্রেন ছাড়িবে।···

গাড়িটা নগরীতে এল ভোর পোনে পাঁচটায়। গুছিয়ে ব্যাগ কাঁধে চারজন টয়লেট পথে দাঁড়াতে, এম. পি. পোষাক বদলে ব্যস্তগম্ভীর মুখে নেমে গেলেন। এ চারজন যে ধলঘাট থেকেই পাশে আছে, ছিঁটেফোঁটা স্বীকৃতিও ছিল না।

সবশেষে ভুজেন্দ্ররা নামল কামড়া থেকে। হঠাৎ দলা-পাকানো ক্ষোভ, কান্না ও বিলাপে চমকে উঠল। কয়েকটি বগি বাদ দিয়ে, সারা ট্রেনটাতেই ডাকাতি হয়েছে। ভোজালি, ল্যাপালা—আহত, অর্ধমৃত। চম্পট দিয়েছে সোনা-দানা, সম্পত্তি নিয়ে। শিশুর রক্ত, বৃদ্ধের জখম, মেয়েদের কোপ খাওয়া কাটা আঙুল, কনুই। একটি শিশুর পুরো কানটা কালি দিয়ে সোনা নিয়ে গেছে। এখন মায়ের কোলে মরণ-বাঁচন শঙ্কায়। রক্তের ভূমিকম্পে হিন্ধা উঠেছে।

আহতরা চ্যাঁচায়—চলো স্টেশন মাস্টারের কাছে!

একজন পাশ থেকে বলে—এম. পি.ও আছে গাড়িতে। ···সঙ্গে নিয়ে চলুন। শুনবে কথা!

—কোথায়? কোথায় তিনি?

—বেড়িয়ে গেলেন! একজন জবাব দিল।

—কখন?

—এই মাত্তর।

শব্দটা তলিয়ে গেল। সমস্ত স্টেশন, প্ল্যাটফর্ম, আনাচ-কানাচ গন্ধে ভরে উঠেছে। নিশ্চয়ই কাছে পিঠে গোলাপের বাগান আছে!

এখন রোদ্দুর

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

ইচ্ছে করেই সৌম্য সেনগুপ্ত কলকাতার এতদূরে বাড়িভাড়া নিলেন। গড়িয়া ছাড়িয়ে নরেন্দ্রপুর। তারপর রাজপুর। বৌয়ের তাড়নায়? কোনও সম্ভাবনাই নেই। সৌম্যবাবু নিশ্চিন্ত ব্যাচেলর। আত্মীয় স্বজনের কাছেপিঠে থাকবেন বলে? কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তিনকুলে খুঁজে পেতে দেখলে দু চারজন বেরোলেও বেরোতে পারে, কিন্তু তাদের সঙ্গে এমন সম্পর্ক নেই যাতে রিটায়ারমেণ্টের আর বছরচারেক বাকি থাকতে সৌম্যবাবু তাদের ছায়ায় এসে বাসা বাঁধবেন। এতদিন কাটিয়ে এসেছেন মানিকতলার এক মেসে। বাকি দিনগুলোও ওখানেই কাটানোর পক্ষে কোনও অসুবিধেই ছিল না। কিন্তু হঠাৎ একদিন বুঝতে পারলেন নাভিশ্বাস উঠছে। আর পোষাচ্ছে না। রুমমেট সমেত একচিলতে ঘর, চিটচিটে দেওয়াল আর অনিবার্য ক্ষয় রোগীর মত আলোপাখা, বারোভূতের বাথরুম আর আনন্দ ঠাকুরের ঘোর নিরানন্দময় রান্না তাঁকে যেন আটাত্রতম বসন্ত না-দেখানোর গভীরতম ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তাই এই সিদ্ধান্ত। সহকর্মী কুমুদ মল্লিক পাকা লোক। বলামাত্র দেড় মাসের মধ্যেই ঠিক করে দিয়েছে। "সেনগুপ্ত, তুমি কিন্তু জানো না আমি কতটা রিসোর্সফুল। চাইলে আরও অনেক কিছু জোগাড় করে দিতে পারি। আরে বাওয়া, হাউজ দেখে দিলুম আর হোম-এর ব্যবস্থা করে দিতে পারবো না, বলো কি?"

সৌম্যবাবু নিরিবিলি চেয়েছিলেন। সেই হিসেবে জায়গাটা ভালই। আর বাড়িটা নামেই ভাড়াবাড়ি। দু কামরার এই একতলা বাড়িটা বাড়িওয়ালার বোঝাবিশেষ। কবে কী কারণে করেছিলেন ভদ্রলোক, এখন ছেলে আর রাখতে চাইছে না। সৌম্য সেনগুপ্তকে কিনেই নিতে বলেছিলেন, উনি নেননি। কী হবে শুধুশুধু একটা গোটা বাড়ি কিনে।

বাড়ির সঙ্গে প্রায় লাগোয়া একটা পুকুর। পাশে যে এক চিলতে জমি আছে, বর্ষাকালে সেটা ডুবে যায়। তখন বারান্দা রান্নাঘরে ব্যাং আর শামুকের নির্ভীক যাতায়াত।

দুটো ঘর সৌম্যবাবুর পক্ষে একটু বেশিই। একটাতেই সব হয়ে যায়। আর একটা বলতে গেলে ফাঁকাই পড়ে আছে। রান্নাবান্না নিজেই করেন সৌম্যবাবু। ইদানীং আবিষ্কার করেছেন এ ব্যাপারে তাঁর এক সহজাত দক্ষতা আছে। গত পয়লা বৈশাখে যে মুরগির স্টু করেছিলেন (নিজেকে নেমতন্ন করে খাওয়াতে মাঝেমধ্যে মন্দ লাগে না) সেটা নিঃসন্দেহে আনন্দ ঠাকুরের গঙ্গাজলের চেয়ে শতগুণে ভাল।

সৌম্যবাবু যে ঘরটায় থাকেন, সেটা নেহাতই সাদামাটা। একটা চৌকি, দুটো চেয়ার আর একটা আলনা, একটা বেঁটে কাঠের আলমারি। দেয়ালে নেতাজির ছবিওয়ালা একটা ক্যালেণ্ডার আর তাকে বঙ্কিম-শরৎ-বিমল মিত্র, কয়েকটা বাঁধানো পুরনো শারদীয়া আর একটা কাশীদাসী মহাভারত সহাবস্থান করছে। কিছু বাজার চলতি পত্রপত্রিকা।

সৌম্য সেনগুপ্তকে মোটের ওপর দেখতে সুশ্রী। অন্ততপক্ষে করনিক কুলোদ্ভব ছাপ পড়েনি। মানে পড়তে দেননি। ছোট্টখাট্টো চেহারায় ধুতি-পাঞ্জাবিই পরে এসেছেন বরাবর। সিগারেট খান না, কিন্তু দিনে নিয়ম করে পাঁচটা পান খান। কিন্তু দাঁতে পানের ছোপ নেই। দুবেলা দাঁত মাজেন। ক্ষণে ক্ষণে চশমা নাকের ওপর ঠেলে তোলা তাঁর একটা বদ অভ্যেস। জামাকাপড় নিজেই ইস্তিরি করেন, তবে সেলাই করতে পারেন না। একটা বারো তেরো বছরের মেয়েকে ঠিকে কাজের জন্যে রেখেছেন। সেটা তার ওপর দিয়েই চালান। ভিখিরিকে কখ্খনো পয়সা দেন না।

সৌম্যবাবু চৌরঙ্গির একটা সরকারি অফিসে চাকরি করেন। এখান থেকে যেতে আসতে অনেকটা সময় যায় বটে, তবে পরিশ্রম হয় না তেমন। এখানে কাছেই একটা নতুন বাস গুমটি হয়েছে। বাসেই যাওয়া আসা যায়।

রোজ ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যে সৌম্যবাবু উঠে পড়েন। অলসভাবে হাঁটতে হাঁটতে কখনও কখনও

বাজার চলে যান। সাড়ে আটটার মধ্যে রান্না খাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়েন। সন্ধ্যেবেলা ফিরে এসে খানিক গা গড়াগড়ি। খবরের কাগজ ওলটানো পালটানো। ট্রানজিসটরের নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কৃষিকথার আসর থেকে শুরু করে জয়মালা কার্যক্রম অন্যমনস্কভাবে শোনেন। রাত্রে রান্নাবান্নার দরকার থাকে না তেমন। সকালের কোনও পদ পড়ে থাকলে একমুঠো ভাত ফুটিয়ে নেন শুধু। কদিন হল দুধ খই কিংবা দুধ মুড়ির ওপর দিয়ে সারছেন। প্রতি শুক্রবার অফিস থেকে ফেরার পথে নিয়ম করে একটা ইংরিজি ছবি দেখেন আর পাঞ্জাবি ধাবায় খান। প্রত্যেকটা কাজের মত শুক্রবারের এই ব্যাপারটাতেও তিনি খুবই নিয়মনিষ্ঠ।

এক শুক্রবার তিনি নিয়মটা ভাঙলেন।

নতুন পাড়ায় সৌম্যবাবু কারও সঙ্গে বড় একটা মেলামেশা করেন না। সপ্তাহের এমনি দিনগুলো ত বাইরেই কেটে যায়। সুতরাং মেলামেশার কোনও প্রশ্ন নেই। আর শনিরবি বাড়িতেই থাকেন। এখানে আসার পরই একটা টেপ রেকর্ডার কিনেছেন। গোটা দশ বারো ক্যাসেট আছে। মেলানো মেশানো। রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল গীতি, পুরনো বাংলা হিন্দি সিনেমার গান, এইসবই। তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শোনেন।

সেদিন সকালে সৌম্যবাবু খবরের কাগজ পড়তে পড়তে অতুলপ্রসাদ শুনছিলেন। আগেরদিন ক্যাসেটটা ফেরার পথে ধর্মতলা স্ট্রীট থেকে কিনেছেন রাত্রে, আর শোনা হয়নি। রান্নাঘরে দুধ জ্বাল হচ্ছে। চাল ভেজানো। আজ আর বাজার যাবেন না। ভাত আলুসেদ্ধ ডিমসেদ্ধ খেয়ে নেবেন। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। এখন সবে সাতটা সোয়া সাতটা হবে বড়জোর। এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

"কাকাবাবু।"

সৌম্য সেনগুপ্ত প্রথমে খেয়াল করেননি। বার দুয়েক ডাকার পর ভুরু কুঁচকে পায়ে চটি গলালেন। উনি ঘরেও সবসময় চটি পরে থাকেন। খালিপায়ে হাঁটতে কেমন অস্বস্তি হয়। বহুদিনের অভ্যেস।

দরজা খুলতেই দেখেন এক কিশোরী, না তরুণীই বলা যায়, দাঁড়িয়ে। দুটো বিনুনি। শাড়ি পরা। হাতে কয়েকটা ফুল।

"আপনার বাড়ির পাশ থেকে রোজ কুড়িয়ে নিয়ে যাই।" বলতে বলতে ও ফুলগুলো সৌম্যবাবুর হাতে তুলে দেয়। আর উনিও লক্ষ করেন, কোনও উচ্চবাচ্য না করে হাত বাড়িয়ে নিলেন সেগুলো।

"কাঁঠালিচাঁপা," মেয়েটির চোখে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। "রোজ সকালে কুড়োতে আসার সময় ভাবি আপনাকে ডেকে দিয়ে যাব। আপনার এত কাছে এমন সুন্দর ফুল মাটির ওপর পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু ভয় হয়। আপনি যদি রাগ করেন। আপনি ত চেনেন না আমাকে। অবশ্য আমার বাবার সঙ্গে আপনার আলাপ আছে।" সপ্রতিভভাবে মেয়েটি একটানা বলে গেল। ও একটা সাধারণ ছাপা শাড়ি পরে, চুল উসকো খুসকো। ডান ভুরুর কোণে এক চিলতে কাটা দাগ।

সৌম্য সেনগুপ্ত চিনতে পারলেন না। এবং ওর বাবার সঙ্গে আলাপ আছে শুনে আরও অস্বস্তি বোধ করলেন। এখানে ত কারও সঙ্গেই তেমন করে তাঁর পরিচয় নেই।

"আমার বাবার নাম অমর মণ্ডল। ওই মুদিখানার পাশের দোতলা বাড়িটায় আমরা ভাড়া থাকি। বাবা বলছিলেন আপনি গত দুদিন ওঁর জন্যে বাসে জায়গা রেখেছিলেন।"

এবার সৌম্যবাবু বুঝতে পারলেন। গত মঙ্গলবার উনি বাসে কিছুটা ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছিলেন একটা কুড়ি টাকা নোটের ভাঙানি নিয়ে। অথচ সত্যিসত্যিই তখন পকেটে খুচরো ছিল না। বেরোনোর সময় বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। ছোকরা কণ্ডাকটরটা বেশ রগচটা। দু একবার ঝাঁঝিয়ে উঠে নেমে যেতে বলেছিল। অপমানজনক পরিস্থিতি থেকে তখন ওই ভদ্রলোক বাঁচান। উনিই সৌম্যবাবুর টিকিট কেটে দেন। আরও লজ্জাকর পরিস্থিতি। "না না, ও কিছু না। আপনি ত আমার পড়শি, হাজার হোক।" অপরিচিত একজনের কাছ থেকে এরকম অবস্থায় এহেন কথা শোনা নিশ্চয়ই স্বস্তিদায়ক। সৌম্যবাবু হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। তারপর দুদিন উনি যা কখনও কারও জন্যে করেননি এবং একরকম অপছন্দই করেন বলা যায়, অমরবাবুর জন্যে পাশে জায়গা রেখেছিলেন। এ অঞ্চলে বাসে 'জায়গা রাখা' নীতিবিরুদ্ধ নয়।

"আজ সন্ধ্যেবেলা আপনি আসবেন আমাদের বাড়ি চা খেতে। বাবা বলেছেন। অবশ্য দেখা হলে বাবাও বলবেন আপনাকে।"

ফুলগুলো দিয়ে দেওয়ার পর খালি হাতদুটো নিয়ে মেয়েটি কী করবে বুঝতে পারছিল না। একবার সামনে জড়ো করে রইল, একবার দরজার পাল্লায় আঁচড় কাটার চেষ্টা

করল, অবশেষে আঙুলে আঁচল জড়ানোর মধ্যে ব্যস্ত রাখল নিজেকে।

"আচ্ছা, আমি আসি এখন।" হালকা পায়ে, একরকম দৌড়েই বলা যায়, ও চলে গেল। চলে যাওয়ার পর সৌম্যবাবু খেয়াল করলেন ওর মুখের সবচেয়ে দেখার মত ওই একরাশ হাসিটুকু। আরও খেয়াল করলেন উনি এতক্ষণ মেয়েটির সঙ্গে একটাও কথা বলেননি। দরজা বন্ধ করে রান্নাঘর থেকে একটা কাচের প্লেট নিয়ে ফুলগুলো ওতে রাখলেন। তারপর প্লেটসুদ্ধ তুলে গন্ধ শুঁকলেন। ভীষণ হালকা গন্ধ। ভীষণ মিষ্টি। অনেক ছোটবেলায় ছোড়দি স্কুলে কী একটা ফাংশানের পর মেক-আপ আর ফুলের গয়না সুদ্ধ বাড়ি ফিরলে মনে আছে উনি বলেছিলেন, "কী দারুণ গন্ধ রে, ঠিক যেন খেয়ে নিতে ইচ্ছে করে।" তারপর ছোড়দিকে জড়িয়ে ধরে শাড়িজামায় মুখ ঘষতে যেতেই ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল। "অ্যাই ভাই, কী হচ্ছে, ছাড়।" সৌম্যবাবু প্লেটটা ঘরে এনে বেঁটে আলমারির মাথায় রাখলেন।

সেদিন আর সিনেমা দেখা বা ধাবার খাওয়া হল না। অফিস থেকে ফিরে জামাকাপড় ছেড়ে গা ধুয়ে সৌম্যবাবু ধুতি পাঞ্জাবি পরলেন। পাঞ্জাবির হাতায় কীভাবে কে জানে মরচের দাগ লেগেছে। সাবধানে সেটুকু গুটিয়ে নিলেন।

বাসে অমরবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আজ উনি জায়গা রেখেছিলেন। দেখামাত্রই বললেন, "পুতুল সকালে গিয়ে খুব বিরক্ত করেছিল ত? আপনার সঙ্গে আমার আলাপ হওয়ার আগে ওই বেশি বলত আপনার কথা। আপনি নাকি গান শুনতে ভালবাসেন। ও সকালে ফুল কুড়োতে গিয়ে শোনে। পঙ্কজ মল্লিকের রবীন্দ্রসংগীত ওর দারুণ লাগে। মেয়েটা আমার একটু পিক্যুলিয়র। যাই হোক, আজ সন্ধ্যেবেলা আসবেন আমাদের বাড়ি। না না, কিছু না। আমরাও এখানে এসে অবধি প্রায় একঘরেই বলতে পারেন। কথা বলার লোক কোথায় বলুন? আজহো বাগবাজারে কাটিয়ে শেষমেশ কিনা এখানে—বলুন না, পারা যায়?" অমরবাবু হেসে ওঠেন।

সৌম্য সেনগুপ্ত এই কদিনে জেনেছেন অমরবাবু কয়লাঘাটায় ইস্টার্ন রেলে চাকরি করেন। স্ত্রী, বৃদ্ধ ও বিপত্নীক দাদা এবং এক মেয়ে নিয়ে সংসার। সোনারপুরের কাছে কোথায় জমি কেনা আছে। এখন বাড়ি তুলছেন। দেখাশোনার সুবিধে হবে বলে এখানে চলে এসেছেন।

সৌম্যবাবু যেতে অমর মণ্ডলই দরজা খুলে দিলেন। পাশে সেই মেয়েটি, মানে পুতুল, একটা হারিকেন নিয়ে দাঁড়িয়ে। একটু আগে আলো নিভে গেছে। "আসুন আসুন,···অসুবিধে হয়নি ত· উরু, বাড়ির সামনে এমন একটা গর্ত হয়ে রয়েছে না···এই যে, একটু দেখে···।" মেয়ের হাত থেকে আলো নিয়ে এগিয়ে ধরলেন অমর মণ্ডল।

যে ঘরে ওঁরা এসে বসলেন, সেটা দেখেই সৌম্যবাবু বুঝতে পারলেন উনি আসবেন বলে তা বিশেষভাবে সাজানো হয়েছে। নতুন টেবিল ক্লথ আর বিছানার চাদর। এমনকি টেবিলের ওপর বইখাতা আর নিচে খবরের কাগজগুলোও নিশ্চয়ই প্রতিদিন এরকম গোছানো থাকে না। সৌম্যবাবু রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলেন।

"হাতপাখাটা নিয়ে আয় ত মা। যা গুরু হয়েছে না আজকাল। এই গরম, তার থেকে থেকে লোডশেডিং।" অমর মণ্ডল আর একবার শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

পুতুল কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। বাবার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়াতেই সৌম্যবাবু থামালেন। এবার কথা না বললে সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

"না না, লাগবে না। তুমি দাঁড়িয়ে কেন, বোসো। কী পড়ো তুমি?"

এক কোণে একটা ছোট্ট টুলের ওপর জড়োসড়ো হয়ে বসল পুতুল। সৌম্যবাবু লক্ষ করলেন, সকালের থেকে ওকে অনেক স্তিমিত লাগছে এখন।

"এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক দিয়েছি।"

"বাঃ, এবার ত তা হলে কলেজ।" সৌম্য সেনগুপ্ত আলাপ জমানোর চেষ্টা করলেন।

অমরবাবু বললেন, "এখন ওটা আমার আর এক দুশ্চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোথায় ভর্তি করা যায় বলুন ত? এদিকে ত একটাও ভাল কলেজ টলেজ নেই। আর এখান থেকে কলকাতায় রোজ যাওয়া আসা—।"

"তাতে কী হয়েছে? কতজনই ত করে এমন।" সৌম্য সেনগুপ্ত ঘাড় ঘুরিয়ে অমরবাবুকে কথাটা বলতে গিয়ে দেখলেন টেবিলের ওপর কয়েকটা শুকনো কাঁঠালি চাঁপা পড়ে। সকালবেলা নিয়ে আসা নিশ্চয়ই। আবার পুতুলের দিকে তাকালেন। "তুমি ফুল ভালবাসো খুব?"

"কুড়োতে আরও বেশি ভাল্লাগে।"

অমরবাবু ও সৌম্য সেনগুপ্ত একসঙ্গে হেসে উঠলেন।

"এখানে এমনিতে ফাঁকা ফাঁকা মনে হলেও নিজের পছন্দমত দুটো গাছ লাগানোর জায়গা নেই। আর আমার ত ভাড়াবাড়ি—আরও অসুবিধে। বুঝতেই পারছেন। তবে নতুন বাড়িতে দু এক হাত ফাঁকা জমি রাখার ইচ্ছে আছে।" অমরবাবু বললেন।

"বাবা বলছিলেন তুমি গান শুনতে ভালবাসো। তুমি নিজে করো না?" পুতুলকে অতটা শান্তভাবে বসে থাকতে দেখে সৌম্য সেনগুপ্তর ভাল লাগছিল না।

"উঁহু। শুধু শুনতেই ভাল্লাগে।"

"তা হলে ওই হারমনিয়মটা যে পড়ে আছে—।" চৌকির মাথার কাছে কাপড়ে ঢাকা জিনিসটার দিকে সৌম্যবাবু একবার আড়চোখে তাকিয়ে হাসলেন।

এবার বাবা ও মেয়ের হাসির পালা। সঙ্গেসঙ্গে আলো চলে এল।

"দেখ, হাসির সুফল দেখ।"

সন্ধ্যেটা সৌম্যবাবু প্রায় একাই জমিয়ে দিলেন। আর একটু একটু করে পুতুলও সহজও হতে লাগল। ওর সেই সকালের চেহারাটা আবার ফিরে এল ধীরে ধীরে। অমর মণ্ডলের স্ত্রীর সঙ্গেও একটু পরে আলাপ হল। চা খাওয়ানোর নাম করে ওরা অনেক কিছুরই আয়োজন করেছিলেন। লুচি, তরকারি, মিষ্টি। অবশ্য অমরবাবুর দাদার সঙ্গে আলাপ হল না। উনি সন্ধ্যে সন্ধ্যেই শুয়ে পড়েন।

আসার আগে একরকম জোর করেই সৌম্যবাবু পুতুলের কাছ থেকে একটা গান আদায় করে নিলেন। "না শোনালে কিন্তু কাল থেকে নো কাঁঠালি চাঁপা অ্যাণ্ড নো পঙ্কজ মল্লিক।" পুতুল মাথা নিচু করে ঠোঁট টিপে হেসে ফেলল। সৌম্যবাবু দেখলেন বাবার চেয়ে মায়ের সঙ্গেই ওর বেশি মিল।

পুতুল গাইল। 'ঠুমক চলত রামচন্দ্র।' আহামরি কিছু গলা নয়। কিন্তু চোখ বন্ধ করে সামান্য দুলে দুলে গাইবার ভঙ্গির সঙ্গে গলাটা মিশে যাওয়ার ফলে শুনতে খারাপ লাগছিল না। সৌম্যবাবু বুঝলেন ওর আড়ষ্টতা সত্যি-সত্যিই কেটে গেছে। সকালবেলা হঠাৎ ওভাবে চলে গিয়ে পরে নিশ্চয়ই লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল খুব।

দিন দুয়েক বাদে সৌম্যবাবু আবার এলেন অমর মণ্ডলদের বাড়ি। এবার নিজের থেকেই। হাতে একটা বইয়ের প্যাকেট। পুতুলের জন্যে। তারাশঙ্করের 'কবি'।

"জানি না তুমি গল্পের বই ভালবাসো কিনা। তবে আমি এক সময় খুব পড়তুম। যদিও তেমনভাবে কিনে ওঠা হয়নি। রাখব কোথায়। আর এটা আমার তোমার বয়সের প্রিয় বই। পড়ার পর আমার বোলো কেমন লাগল।" পুতুলের হাতে তুলে দিয়ে বললেন সৌম্যবাবু।

সেদিন গান শোনা হল না। অমরবাবুর সঙ্গে দাবা নিয়ে বসলেন। এবং হেরে গেলেন।

পরের পরেরদিনই সকালে পুতুল এল। সৌম্যবাবু সেদিন কী কারণে অফিস যাননি। গা ম্যাজম্যাজ করছে। খাওয়া দাওয়ারও ইচ্ছে নেই। শুয়ে বসে সময় কাটাচ্ছিলেন।

"খুব ভাল লেগেছে, কিন্তু এত কষ্টের। আপনি কষ্টের বই পড়তে বুঝি খুব ভালবাসেন?" পুতুলের কথাটা সৌম্যবাবুর কানে অদ্ভুত মিষ্টি শোনাল। প্রশ্নটা পুতুলের বয়সের পক্ষে একটু বেশি সরল। কিন্তু কী সুন্দর, সহজ। সৌম্যবাবু সামান্য হাসলেন।

"কষ্টের কথাই ত বেশিক্ষণ মন জুড়ে থাকে, তাই না?"

"কিন্তু আমরা ত দুঃখ কষ্ট সব সময় ভুলে থাকতে চাই—আমরা সকলেই।" হঠাৎ আবার পুতুল যেন বড় হয়ে উঠল।

"সব দুঃখ কষ্ট নয় তা বলে। বেশির ভাগই অবশ্য ভুলে যেতে চাই। কিন্তু কিছু কিছু মনে রাখি। সেটাই আমাদের আনন্দ।" সৌম্যবাবু থামলেন। নিজেকে একটু বেশি ভারিভারি শোনাচ্ছে কি? একটু যেন বেশি বড় বড় ভাব একটা ছোট, বাচ্চাই বলা যায়, মেয়ের সামনে।

"আপনার এই কথাটা কিন্তু আমিও বিশ্বাস করি। যেমন ধরুন", পুতুল সৌম্যবাবুর বইয়ের তাকের দিকে তাকাল, "যখন 'সাহেব বিবি গোলাম'-এর ছোট বৌ রাণীর কথা পড়ি, তখন ভীষণ কষ্ট হয়। কিন্তু সেটা বেশিক্ষণ থাকে না। পড়ার পর আর ভাবি না তাকে নিয়ে। যদিও প্রথমবার পড়ার পর খুব কেঁদে ছিলাম। কিন্তু তখন ত—" পুতুল একটু থামল। ওর চোখ দুটো একটু ঝিলিক দিয়ে উঠল যেন।"—আমি অনেক ছোট।"

"আর এখন—আশি বছরের বুড়ি, তাই ত?" সৌম্যবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন।

কেটে গেল বেশ কিছুদিন। এক মাস। দু মাস। তিন মাস। পুতুলের উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট বের হল।

ওর ফার্স্ট ডিভিশনের জন্যে সৌম্যবাবু যেচে নেমন্তন্ন নিলেন। দু খণ্ড শরৎ রচনাবলী উপহার দিলেন পুতুলকে। দু দিন কলকাতার দুটো কলেজে লাইন দিয়ে ভর্তির ফর্ম নিয়ে এলেন। এমনকি ওরই সঙ্গে পুতুল গিয়ে একদিন ভর্তি হয়ে এল।

"আপনাকে যে কী বলে আমি—।" হাত কচলে অমর মণ্ডল কৃতজ্ঞতার হাসি দেন। "মেয়েটা আমার ছোটবেলা থেকেই পড়াশুনোয় ভাল। আমিই তেমন গা করিনি কোনওদিন। চলছে চলুক। বেশি পড়ে কী হবে? মেয়ে ত হাজার হোক।"

সৌম্যবাবু ধমকে থামিয়ে দেন।

"কী বলছেন কি। এত ভাল রেজাল্ট করল আপনার মেয়ে—। ওকে আরও পড়তে দিন। ও অনেকের থেকে বেশি ব্রাইট।"

প্রথম যেদিন কলেজ যায়, পুতুল সৌম্যবাবুকে প্রণাম করতে এল। দু বেণীর জায়গায় এক বেণী এখন। কাঁধে নকশা করা কাপড়ের ব্যাগ।

"এবারও যেন ভাল রেজাল্ট দেখি। তা হলে এবার তারাশঙ্করের পুরো সেট।" সৌম্যবাবু ওর মাথায় হাত রাখলেন।

এখন পুতুল আর ফুল কুড়োতে আসে না। কখনও সখনও রোববার সকালে আসে কিছুক্ষণের জন্যে। ও এখন একটা ট্যুশন করে। কদিন আগে সৌম্যবাবুকে পার্থ ঘোষ গৌরী ঘোষের একটা ক্যাসেট উপহার দিয়েছে। "এর মধ্যে আমার কয়েকটা সাংঘাতিক প্রিয় কবিতা আছে। শুনে বলবেন ত কোনটা কোনটা হতে পারে?"

ডিসেম্বরে সৌম্যবাবু টানা পনেরো দিনের ছুটি নিলেন। কোথাও ঘুরে আসা দরকার। শেষ গিয়েছিলেন দেওঘর, তা-ও বছর পাঁচেক হয়ে গেল। বেড়ানোর জন্যে সৌম্যবাবুর এমন জায়গা পছন্দ যেখানে গিয়ে চারপাশের খুচরো 'দর্শনীয় স্থান' দেখার জন্যে ছুটে বেড়াতে হবে না। সেখানেই যেন চুপচাপ বসে থাকার সুযোগ মেলে—অথচ সেটা যেন ক্লান্তি-করও না হয়। অর্থাৎ সেখানে মন কাড়ার উপাদান থাকা চাই। আর সেরকম জায়গা বলতে পুরীর চেয়ে ভাল আর কী আছে?

সৌম্যবাবুর পনেরো দিনের জায়গায় তেইশদিন হয়ে গেল। সকাল বিকেল বালির ওপর বসে থাকা, কিংবা আন-মনে জলের রেখা ধরে হাঁটতে হাঁটতে কোথায় কোন সুদূরে চলে যাওয়া, হুলিয়াদের অবলীলায় ঢেউ টপকানো আর উচ্ছল মানুষজনের হুটোপুটি, সূর্য ওঠা আর ডোবা খেলা—আর সন্ধ্যেবেলা সমুদ্রের সাদা ফেনা আর নরম ঝিকিমিকি আলোর নাচানাচি দেখতে দেখতে সৌম্যবাবু একবার, দুবার বারবার ভাবলেন কেন এখানে আসেননি এতদিন, কেন জীবনটা এতটা ছোট।

অমরবাবুর স্ত্রী খুব করে বলে দিয়েছিলেন জগন্নাথের প্রসাদ আনার জন্যে। বাড়ি পৌঁছে সৌম্যবাবু তাড়াতাড়ি সেটা দিতে গেলেন। এই প্রসাদ আনার জন্যেই শুধু এত-দিনের মধ্যে একবার তিনি মন্দির চত্বরে গিয়েছিলেন। পুরীতে সৌম্যবাবু কিছু কেনেননি। ব্যাপারটা কেমন বোকা বোকা মনে হয়। যেন বাইরে কোথাও গেলেই, সেখান থেকে কিছু কিনতে হবে। অবশ্য পুতুলের জন্যে একটা অদ্ভুত জিনিস এনেছেন। একটুকরো জমাট কেনা। সমুদ্রের ফেনা। জমাট। শক্ত।

অমরবাবু শুয়ে শুয়ে কাগজ পড়ছিলেন। সৌম্য সেন-গুপ্তকে দেখে উঠে বসলেন। চশমা খুলে রাখলেন পাশে। সৌম্যবাবু প্রসাদের প্যাকেকটা এগিয়ে দিলেন। "বৌঠান পুতুল কোথায় সব?"

অমরবাবু হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নিলেন। "আপনি কি একটু বসবেন দয়া করে? অনেক কথা আছে।" অমর-বাবুর হাত কাঁপছে। মুখ ক্যাকাসে।

সৌম্য সেনগুপ্ত ওর পাশে বসলেন। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছেন না। অমরবাবু উঠে গিয়ে টেবিলে প্যাকেটটা রাখলেন।

"পুতুল চ'লে গেছে।" মুখে হাত চাপা দিয়ে কাশলেন অমরবাবু।

"চ'লে গেছে—মানে?" সৌম্যবাবু বিছানায় দুহাত ভর দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। অমরবাবুর কথার কিছুই তাঁর মাথায় ঢুকল না।

"আপনি চ'লে যাওয়ার দিন চারেকের মাথায় ও দুপুর বিকেল নাগাদ কলেজ থেকে ফিরে এল। সঙ্গে একটি ছেলে। আগের দিন ওরা বিয়ে করেছে। সেদিন আমাদের জানাল।" কোনও রকমে তথ্যটা জানিয়ে অমরবাবু বিছানায় বসে পড়েন। মাথা এত নিচু যে থুতনিটা প্রায় বুকে এসে লেগেছে।

সৌম্য সেনগুপ্ত এবারও কিছু বুঝে উঠতে পারলেন না। খানিক বোকার মত তাকিয়ে রইলেন অমরবাবুর দিকে। যেন ভদ্রলোক খুব জটিল কোনও বিষয় বলছেন।

"আপনি তখন বাড়ি ছিলেন?"

"হ্যাঁ, অফিস যাইনি। পুতুলের মায়ের শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না ক-দিন ধরে।" ভাঁজ করা খবরের কাগজের ওপর পড়ে থাকা চশমাটা তুলে অমরবাবু খাপে ঢোকালেন। "বুঝতেই ত পারছেন এরকম অবস্থায় মাথার ঠিক থাকে না। যা মুখে এসেছে বলে গেছি। ওর মা-ও কান্নাকাটি করেছে। বাড়িতে অসুস্থ দাদা—কতটাই বা অশান্তি করা যায়। আর হাজার হোক—নিজেদেরই মেয়ে ত। মান সম্মান বলেও ত একটা ব্যাপার আছে।"

"ছেলে কী করে?" সৌম্য সেনগুপ্ত সামান্য অবাক হলেন যে কী করে এত ঠাণ্ডা মাথায় এরকম বাস্তববুদ্ধি নির্ভর একটা প্রশ্ন করলেন।

"জানি না। ওসব কিছু জিগ্যেস করিনি। পরিস্থিতিও ছিল না। তবে ওরা কলকাতাতেই আছে এখন। পুতুল যাওয়ার আগে ঠিকানা দিয়ে গেছে। আমি নিইনি। ওর মাকে দিয়ে গেছে। ও মেয়েকে আমি আর ফিরে দেখতে চাই না।" অমরবাবু কথা বলতে বলতে একবার উঠলেন। শুধু শুধু একবার জানলার ধারে গেলেন। আবার এসে বসলেন। এইটুকুতেই হাঁপিয়ে উঠেছেন।

"আমি কি একবার ঠিকানাটা পেতে পারি?" সৌম্য-বাবুর গলা এখন আগের থেকে আরও শান্ত।

"আপনি কিন্তু ওদের আনতে যাবেন না। ওই মেয়েকে আমি—।"

"চুপ করুন।"

অমরবাবুর স্ত্রী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। চোখ ফোলা। বোঝাই যাচ্ছে এতক্ষণ কাঁদছিলেন।

"বৌঠান, ঠিকানাটা দেবেন কি?"

ভদ্রমহিলা যেন প্রস্তুত হয়েই ছিলেন।

পরের দিন বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ অমরবাবুর বাড়ির দরজার সামনে যখন ট্যাক্সিটা এসে থামল তখন উনি সবে ফতুয়া গায়ে চড়িয়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন।

সৌম্যবাবুই আগেই নামলেন। হাতে বিশাল মিষ্টির প্যাকেট। পেছনের সীটে পুতুল সমীর মুখ নিচু করে বসে। সৌম্যবাবু ওদের দরজা খুলে দিলেন। "এসো।"

চৌকাঠে অমরবাবুর স্ত্রী বরণডালা নিয়ে দাঁড়িয়ে। পেছনে লাঠিতে ভর দিয়ে অমরবাবুর দাদা। এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে দু'চারজন উৎসুক প্রতিবেশী-প্রতিবেশিনী।

প্রথমে সমীর তারপর পুতুল বাবা-মা কে প্রণাম করল। সৌম্যবাবু ওদের পাশ কাটিয়ে ভেতরে চলে এলেন। "তোমরা কি সব দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবে? ভেতরে এসো।"

সকালে বেরোনোর আগে সৌম্যবাবুই বাজার করে দিয়ে গেছেন। মাংস, তরিতরকারি, দই।

পার্ক সার্কাসের কাছে ওদের এক কামরার বাড়িটা খুঁজে বের করতে অসুবিধে হয়নি। উনি যখন গিয়ে পৌঁছলেন, এক চিলতে বারান্দায় সমীর দু-চারটে ছেলেকে মেঝেয় মাদুর পেতে পড়াচ্ছিল। পুতুল টুকিটাকি কাজ করছিল রান্নাঘরে। সৌম্যবাবুকে দেখে কেঁদে ফেলল।

"বোকা মেয়ে।" সৌম্যবাবু দ্বিতীয়বার ওর মাথায় হাত রেখেছিলেন। সমীর একটা স্কুলে পড়ায়।

পুতুল মায়ের কাঁধে মুখ গুঁজে এখনও কাঁদছে। সমীর আর অমরবাবু আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে।

"এবেলা কি আমরা শুধু দই মিষ্টি খেয়ে থাকব বৌঠান? অমরবাবু, জামাইকে বসাবেন না? পুতুল, জেঠুকে প্রণাম করেছ তোমরা? যাও, মুখ হাত ধুয়ে মাকে গিয়ে একটু সাহায্য করো। এভাবে দাঁড়িয়ে থেকো না এখন।" সৌম্য-বাবু আপাতত কর্তার ভূমিকায়। তারপর সমীরের দিকে তাকালেন। ও ভেতরে এসে বসেছে ততক্ষণে। "তোমার বাবা জানেন ত? ওঁদের একটা খবর—।"

"মা ভাইয়ের সঙ্গে বাংলাদেশে থাকেন। বাবা নেই।" সমীরের এখনও মুখ নিচু। পাতলা চেহারার, শ্যামলা রঙের, বিশেষত্বহীন চেহারার যুবকটির কান যে লাল হয়ে উঠেছে, সৌম্যবাবু সেটা দেখতে পেলেন।

"অমরবাবু, আপনার যদি চানটান হয়ে গিয়ে থাকে, এখানে বসুন। আগে প্লিজ একটু ভেতরে গিয়ে তাড়া দিয়ে আসুন। কখন থেকে এককাপ চা পেটে পড়েনি মশাই। গলা শুকিয়ে কাঠ।...সমীর, তুমি কি দাবা খেলতে পারো?"

সমীর মৃদু হেসে মাথা ঝোঁকায়।

"বটে? আচ্ছা দেখব'খন ওবেলা। আমাকে যদি হারাতে পার, তবে শ্বশুরের সঙ্গে হয়ে যাবে এক হাত। আমার বন্ধুটি কিন্তু,—" অমরবাবু যেতে গিয়ে দরজার কাছে

দাঁড়িয়ে চোখ বড় বড় করে সৌম্য সেনগুপ্তর কাণ্ড কারখানা দেখেছিলেন। চোখের কোলে হাসির রেখা। "—দুর্দান্ত খেলে, বুঝেছো?" কথা শেষ করে হাসতে হাসতে সমীরের পিঠে সৌম্যবাবু আলতো চাপড় মারেন।

খাওয়া দাওয়া সারতে সারতে বেলা সাড়ে তিনটে বেজে গেল। পুতুলের মা মেয়ে জামাইকে একসঙ্গে বসিয়ে খাওয়াতে চেয়েছিলেন। সৌম্যবাবু থামিয়ে দিয়েছেন। "আজ আপনি আগে বসবেন। স্বামী জামাইয়ের সঙ্গে। মেয়ে বেড়ে খাওয়াবে আপনাদের। আমি দেখতে চাই। বসুন আপনি।" আবার ধমক। এবার সবাই হেসেছে। এক সঙ্গে।

সন্ধ্যে নাগাদ সৌম্যবাবু বাড়ি ফিরলেন। বেশি বেলা করে খাওয়া দাওয়ার অভ্যেস নেই। শরীর ভার ভার লাগছে। আসার আগে পুতুল পান সেজে দিয়েছিল। ওরা আজ থাকছে।

বিছানায় টানটান হওয়ার আগে সৌম্যবাবু সায়গলের ক্যাসেটটা চালাতে গেলেন। তারপর কী ভেবে চালালেন না। আর কিছু ভাল লাগছে না এখন।

এতসব করতে যাওয়ার কী দরকার ছিল? বদান্যতা, পরোপকার, সামাজিকতা? নাকি পুতুলের প্রতি স্নেহের টান? কিন্তু কদিনই বা দেখছেন ওকে—বড় জোর বছরখানেক। তবে? অমরবাবু, বৌঠান, বৃদ্ধ ও অসুস্থ দাদা কিংবা সমীর—এদের সঙ্গে সৌম্যবাবুর কতখানি গভীর সম্পর্ক? কিস্যু না। অ্যাদ্দিন পুরীতে কাটানোর সময় একবারের জন্যেও ওদের অভাববোধ করেননি। তা হলে কেন এই ছুটোছুটি, মিশে যাওয়া?

অন্ধকারে একটা জোনাকি দপ্‌দপ্‌ করছে। সারা ঘরে ওটা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেরোনোর পথ পাচ্ছে না বুঝি? জানলাগুলো ত সব খোলাই আছে। কাঁঠালিচাঁপার গাছটা আবছা হয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে। সাদা ফুলগুলো এখনও স্পষ্ট। নাকি সৌম্যবাবু ধরেই নিয়েছেন ফুলগুলো ওখানেই আছে?

এই ছোট্ট নাটকটায় সত্যিই সৌম্যবাবুর কোনও দরকার ছিল না। উনি না থাকলেও সব ঠিকঠাক ভাবেই চলত। পুতুল সমীরকে এমনিতেই অমরবাবু মেনে নিতেন। এক মেয়ে—যাবেন কোথায়। হয়ত বড়জোর ক'টা দিন আগে পরে। এই যা। ধুস, কী আদিখ্যেতা দেখালুম কাল থেকে। রাবিশ। নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে সৌম্যবাবু পাশ ফিরলেন।

আর পাশ ফিরেই দেখলেন মেঝেয় স্লাটকেসটা পড়ে। একইভাবে গতকাল থেকে। আসার পর খোলা হয়নি এখন অবধি। এমনকি জামাকাপড়ও কাল থেকে ছাড়া হয়নি। সাতরাজ্যের ধুলো ময়লা মাখা জামাকাপড় দু'দিন ধরে ঠায় পরে আছেন। হঠাৎ খেয়াল হল আলমারি থেকে পরিষ্কার গেঞ্জি পাজামাটা তাঁকেই উঠে বের করতে হবে। কাল আবার সেই অফিস, আবার আলুসেদ্ধ ভাত, খই দুধ। একমুহূর্তের জন্যে অমর মণ্ডলের প্রতি ঈর্ষাবোধ করলেন সৌম্য সেনগুপ্ত। অমরবাবুর মত তার ঘরে কেউ হাসে না। কাঁদে না। তাঁর চারপাশে খুশি হওয়ার, দুঃখ পাওয়ার কেউ নেই। তাঁর ছাদের নিচে সেরকম কোনও ঘটনাই যে ঘটে না।

জোনাকিটা এখনও উড়ে বেড়াচ্ছে। ও আসলে বাইরে বেরোতে চাইছে না এখন। কাঁঠালিচাপা গাছটায় ফুলগুলো উনি সত্যিসত্যিই দেখতে পাচ্ছেন এবার।

আচ্ছা, এই দুঃখটা—যেটা এক্ষুনি তাঁর মনে চেপে বসেছিল—কিংবা কষ্ট, যাই বলা যাক-না কেন—সত্যিই কি মনে রাখার মত? পুতুলের সঙ্গে অনেকদিন আগে মিষ্টি তর্কটার কথা সৌম্যবাবুর মনে পড়ল। অন্ধকারে শুয়ে সৌম্যবাবু একাএকা হাসলেন।

মাটি

সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

মাটির উৎপাদন ক্ষমতা ঃ

মাটির সর্বাধিক প্রয়োগ কৃষিকর্মে। মৃত্তিকাশ্রয়ী স্থায়ী বনসম্পদ বাদ দিয়েও প্রতি বছর নানা রকমের যে ফসল উৎপাদন হয় তার মূল্য জাতীয় আয়ের একটি বড় অংশ। ষাট দশকের শেষ থেকে এই উৎপাদন সামগ্রিকভাবে অনেক বেড়েছে। কোন কোন ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে আশাতীত, আবার কোন ফসলের উৎপাদন আশানুরূপ বাড়েনি। আমাদের দেশে ধানের উৎপাদন হেকটেয়ার প্রতি গড়ে দুই টনের বেশি হয় না, অথচ অন্যান্য দেশে যেমন মিশর, চীন, থাইল্যাণ্ডে, গড়ে চার-পাঁচ টন ফলন পাওয়া যায়। উৎপাদন বাড়ানো যায় চাষের জমির আয়তন বাড়িয়ে এবং জমির প্রতি বর্গক্ষেত্রের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে। যেহেতু চাষযোগ্য জমির আয়তন সর্বদেশেই সীমিত, কৃষি বিজ্ঞানীদের উদ্যোগ কেন্দ্রীভূত হয়েছে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে। মাটির উৎপাদন ক্ষমতা অল্প কথায় ব্যক্ত করা সহজ নয়। বরং গুটিকয়েক তথ্যের দ্বারা বিষয়টি বোঝানো সহজ হতে পারে। বৃষ্টি নির্ভর কৃষিকর্মের তুলনায় সেচ প্রয়োগে উৎপাদন বাড়ে। শস্যের উন্নততর প্রজাতি নির্বাচন করে উৎপাদন বাড়ানো যায়। শস্যের প্রয়োজনীয় পুষ্টিদ্রব্যের চাহিদা মেটালে উৎপাদন বাড়ে। প্রশ্ন হতে পারে এই সব পরিস্থিতিতে মাটির স্থান কোথায়? এই প্রসঙ্গে আর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, মাটিতে উপযুক্ত অনুপাতে কাদা, পলি ও বালি আছে, তার গ্রথন এমন হবে যে জলধারণ এবং পুষ্টিদ্রব্য আহরণ ক্ষমতা শস্যোৎপাদনের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। তুলনায় বালি গ্রথন-যুক্ত মাটি অনুপযোগী। সে ক্ষেত্রে বার বার অল্পমাত্রায় সেচ ও পুষ্টি দ্রব্য ব্যবহার করে শস্যোৎপাদন বাড়ানো সম্ভব।

মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়িয়ে যদি জীবাণুদের সংখ্যা যথেষ্ট করা যায় তা হলে উৎপাদন আরও বাড়ানো যায়। যে মাটিতে কাদাকণার অনুপাত বেশি সেখানে সেচের সঙ্গে যদি বাড়তি জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থায় ঘাটতি থাকে তাহলে জমি ক্রমশ জলমগ্ন ও পরিশেষে লবণাক্ত হতে বাধ্য। এই রকম ঘটনা থেকে এই শিক্ষা লাভ করা যায় যে শস্যোৎপাদন ও মাটির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে মাটির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদন পদ্ধতির অদলবদলের প্রয়োজন হয়। জল, আবহাওয়া, আলো, তাপমাত্রা ইত্যাদি সম্পূর্ণ অনুকূল অবস্থায় হলে নির্বাচিত কোন শস্যের বীজ প্রতি হেকটেয়ারে যে পরিমাণ ফলন দেয় তাই হল মাটির উর্বরতার মাপ। অতএব মাটির উৎপাদন ক্ষমতা তার উর্বরতার বাস্তবরূপ। এখানে বলা দরকার যে উৎপাদন বলতে সাধারণত ফসলের কাম্য অংশকেই বোঝানো হয়। বর্জনীয় অংশ যথা খড়, পাতা শিকড় ইত্যাদি ধরা হয় না। অথচ এরাও উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত এবং এরাও মাটি থেকে যথারীতি পুষ্টি আহরণ করে। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা দরকার। ধান, গম, ইক্ষু, আলু ইত্যাদির পরিপক্কতার সময় বিভিন্ন। অতএব মাটি থেকে পুষ্টি আহরণের সময়ও কম বেশি। অতএব মাটির প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতা কিংবা উর্বরতার পরিমাপ জানতে হলে কাম্য অংশের পরিমাণকে প্রতি হেকটেয়ার প্রতি দিন এই এককে প্রকাশ করা উচিত। কিন্তু সাধারণত তা করা হয় না।

মাটি থেকে উদ্ভিদ কী কী পুষ্টি দ্রব্য আহরণ করে

যে কোন উদ্ভিদের দেহ অথবা দেহাংশের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে প্রায় নব্বই শতাংশই জল। বাকি দশ শতাংশের মধ্যে আছে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও ফসফরাস ঘটিত বহুবিধ জটিল বৃহদণু জৈবযৌগ এবং অনেকগুলি মৌল উপাদান, যথা পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, জিঙ্ক, কপার, মলিব্‌ডেনাম, বোরন এবং ক্লোরিন। ক্রমশঃ আরও কয়েকটি উপাদান তালিকাভুক্ত হয়েছে। তাদের

মধ্যে সোডিয়াম, কোবল্ট, ভ্যানেডিয়াম, সিলিকন, সেলেনিয়াম, গ্যালিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম এবং আয়োডিন উল্লেখযোগ্য। উদ্ভিদদেহে বিশেষ বিশেষ বিক্রিয়া ঘটাবার জন্য এদের আবশ্যকতা প্রমাণিত হয়েছে। অতি অল্প পরিমাণে এদের উপস্থিতি বহুরকম জটিল যৌগের সংশ্লেষণে অনুঘটকের কাজ করে। রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে মাটিতে এই সব কটি মৌল উপাদান পাওয়া যায়, হয়ত আরও কিছু বেশি আছে।

উদ্ভিদদেহে ও মাটিতে একই প্রকার মৌল উপাদান থাকার তাৎপর্য এই নয় যে উদ্ভিদ দেহ গঠনে এবং নানাবিধ বিক্রিয়া ঘটাতে এই সব কটিই আবশ্যক। আবশ্যকতা প্রমাণ করতে হলে পরীক্ষা করা দরকার। তার জন্য একটি ছোট গামলায় পরিচ্ছন্ন বালি রাখা হল এবং তাতে উপরি-উক্ত উপাদানগুলির একটি রাসায়নিক মিশ্রণ যোগ করা হল। এই 'কৃত্রিম মাটিতে' দু-তিনটি চারাগাছ লাগিয়ে তাদের দৈনন্দিন বৃদ্ধি ও সুস্থতা লক্ষ করা হল। যদি কোন রকম বৈষম্য না ঘটে তা হলে বুঝতে হবে যে মিশ্রণটির মধ্যে আবশ্যক উপাদানগুলি আছে। তার অর্থ এই নয় যে সব কটিই আবশ্যক। ঐ মিশ্রণ থেকে যে কোন একটি উপাদান বাদ দিয়ে পরীক্ষাটি একইভাবে পরিচালনা করে যদি কোন প্রকার বৈষম্য না ঘটে, তা হলে বুঝতে হবে বাদ দেওয়া উপাদানটি প্রকৃত আবশ্যক নয়। যদি বৈষম্য ঘটে তা হলে আবশ্যকতা প্রমাণিত হল। এমনি করে সব কটি উপাদান নিয়ে পরীক্ষার ভিত্তিতে উদ্ভিদের পুষ্টি হিসাবে এইগুলির আবশ্যকতা-অনাবশ্যকতা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। সব রকম উদ্ভিদ উল্লেখিত ষোলটি উপাদানের মধ্যে সর্বাধিক আহরণ করে নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাসিয়াম। এই জন্য এই তিনটি হল মুখ্য পুষ্টি খাদ্য। এর পরই উল্লেখযোগ্য হল ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং বোরন। বাকি আর সব অনুখাদ্য হিসাবে পরিচিত এবং মাটিতে থাকেও অল্প পরিমাণে। এদের প্রয়োজনও অল্প কিন্তু তা হলেও অত্যন্ত জরুরি। নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাসিয়াম কেবল অত্যাবশ্যকই নয়, এরা উপযুক্ত পরিমাণে মাটিতে থাকলে অথবা বাইরে থেকে প্রয়োগ করলে ফলনও বাড়ায়।

উদ্ভিদেরা প্রয়োজনীয় কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন প্রধানত পাতার মাধ্যমে আলোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং জল হিসাবে গ্রহণ করে। মাটিতে অবস্থিত জল ও অক্সিজেন এবং বাকি সব পুষ্টিখাদ্য উদ্ভিদরা শিকড়ের সাহায্যে শোষণ করে। তবে সবক্ষেত্রে শোষণ পদ্ধতি একরকম নয়। নাইট্রোজেন মাটিতে অল্প মাত্রায় বিনিময়যোগ্য অ্যামোনিয়াম আয়ন এবং বেশি মাত্রায় জৈব যৌগরূপে থাকে। জীবাণুদের প্রভাবে জৈবযৌগ ভেঙে অ্যামোনিয়া তৈরি হয় এবং পরিশেষে নাইট্রোজেন অক্সাইড ও নাইট্রেড তৈরি হয়। জলীয় দ্রবণে নাইট্রেট শিকড়ের মাধ্যমে উদ্ভিদদেহে প্রবেশ করে। ফসফরাস মাটিতে প্রধানত অজৈব অদ্রবনীয় ফসফেট এবং জৈব যৌগরূপে থাকে। উপযুক্ত জীবাণুর সাহায্যে উভয় শ্রেণীর যৌগ দ্রবনীয় ফসফেটে রূপান্তরিত হয়। এরাও শিকড়ের মাধ্যমে উদ্ভিদদেহে প্রবেশ করে। পটাসিয়াম ক্যাটায়নরূপে মাটির কাদাকণার সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং আয়ন বিনিময় বিক্রিয়ার মাধ্যমেই উদ্ভিদ দেহে প্রবেশ করে। ধাতব মৌলগুলির বেশির ভাগই, যেমন, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, আয়রন, জিঙ্ক, কপার কোবল্ট, ম্যাঙ্গানিজ ক্যাটায়ন হিসাবে পটাসিয়ামের মত উদ্ভিদ দেহে প্রবেশ করে। অধাতব মৌলের সবকটিই, যথা বোরন, সালফার এবং ক্লোরিন, যথাক্রমে বোরেট, সালফেট এবং ক্লোরাইডে রূপান্তরিত হয়ে নাইট্রেট এবং ফসফেটের শোষণ পদ্ধতি অনুসরণ করে। ধাতব মৌলের মধ্যে মোলিবডেনাম্ মলিবডেট অ্যানায়ন হিসাবে শিকড় মাধ্যমে উদ্ভিদ দেহে প্রবেশ করে। ধাতব ও অধাতব মৌলগুলির রূপান্তর ঘটে প্রধানত বিশেষ বিশেষ জীবাণুর সাহায্যে।

মাটিতে পুষ্টি খাদ্যের পরিমাণ ও লভ্যতা

উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি খাদ্য প্রধানত বিভিন্ন দ্বিমাত্রিক ও কিছু ত্রিমাত্রিক মিনারেল-এর সঙ্গে কোন না কোন রকমে যুক্ত। পুষ্টি খাদ্যের মোট পরিমাণ রাসায়নিক বিশ্লেষণের দ্বারা জানা যায়। তার জন্য হয় মাটির নমুনাকে ঘন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে ফুটিয়ে নিতে হয়, নয়ত উচ্চতাপে মাটি ও সোডিয়াম কার্বনেট মিশ্রণকে গলিয়ে নিতে হয়। এই প্রকার বিশ্লেষণলব্ধ পুষ্টি খাদ্যের পরিমাণের সঙ্গে মাটির উৎপাদন ক্ষমতা কিংবা উর্বরতার কোন সম্পর্ক পাওয়া যায় না। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে পুষ্টি খাদ্যের মোট পরিমাণ যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও উদ্ভিদ গ্রহণ করতে পারছে না। অন্যভাবে বলা যায় যে মাটিতে যে পরিমাণ পুষ্টি খাদ্য আছে, তার মাত্র অল্প অংশই লভ্য, বাকিটা অলভ্য। ধরে নেওয়া হচ্ছে যে লভ্য অংশই উদ্ভিদের দ্বারা গ্রহণীয়। লভ্য অংশের সঙ্গে যদি

উদ্ভিদের বৃদ্ধির সম্পর্ক স্থাপন করা যায় তা হলে পুষ্টি আহরণ বিষয়ে কিছু অনুমান করা যেতে পারে। লভ্য অংশ জানার জন্য কোন নির্ধারিত পদ্ধতি নেই। সুতরাং প্রয়াস-ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে সঠিক পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। তবে এটি বোঝা সহজ যে শিকড়ের মাধ্যমে পুষ্টিখাদ্য গ্রহণযোগ্য করতে হলে মাটিতে তাদের জলে দ্রবণীয় অবস্থায় থাকতে হবে। অতএব দেখা যাক বিশুদ্ধ জলে দ্রবণীয় অংশের সঙ্গে উদ্ভিদের বৃদ্ধির কোন সম্পর্ক পাওয়া যায় কিনা। অথবা উদ্ভিদের যে অংশে সংশ্লেষ ক্রিয়া চলছে, যেমন ডগার দিকের পাতায়, সেখানে পুষ্টিখাদ্য পৌঁছেছে কিনা। রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে এই তথ্য জানা যায়। এই দুই ভাবেই পুষ্টিখাদ্যের গ্রহণীয়তা নির্ণয় করা যায়। বিশুদ্ধ জলের পরিবর্তে ব্যবহার করা যেতে পারে বিভিন্ন ঘনত্ববিশিষ্ট নানারকমের অজৈব জৈব অম্ল ক্ষারীয় দ্রব্য এবং প্রশম লবণের দ্রবণ। দীর্ঘকাল ধরে বিশ্বের মৃৎবিজ্ঞানীরা এই ধরণের পরীক্ষা করে এসেছেন এবং যেসব পরীক্ষায় দ্রবণীয় অংশের সঙ্গে উদ্ভিদের বৃদ্ধির সম্পর্ক পাওয়া গেছে সেইসব পরীক্ষা লিপিবদ্ধ করেছেন। এরকম সহস্রাধিক প্রচেষ্টার তথ্যাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে হয়ত স্থানীয় ক্ষেত্রে কোন কোন পদ্ধতি উপযুক্ত হলেও পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবহার যোগ্য প্রচেষ্টার সংখ্যা অতি অল্প। তাছাড়া এমন কোন দ্রবণ পাওয়া কঠিন হবে যাকে সবরকম মাটিতে সবরকম পুষ্টিখাদ্যের লভ্যাংশ নির্ণয় করতে ব্যবহার করা যায়। তা সত্ত্বেও যে কয়েকটি পদ্ধতি বর্তমানে বহুদেশে (ভারতবর্ষ সহ) ব্যবহৃত হচ্ছে তাদের সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। মনে রাখতে হবে যে বিভিন্ন দ্রবণে যে পরিমাণ পুষ্টিখাদ্য মুক্ত হয় তার তাৎপর্য এই যে এই হারে মাটি থেকে ঐ পরিমাণ পুষ্টিখাদ্য উদ্ভিদের চাহিদা অনুসারে পাওয়া যায়।

নাইট্রোজেন: নাইট্রোজেন মূলত জৈব যৌগরূপে মাটিতে থাকে। জীবাণু সহযোগে নাইট্রেটে রূপান্তরিত হয়। সাধারণত কার্বনের পরিমাণের এক দশমাংশ মোট লভ্য নাইট্রোজেনের সমান ধরা হয়। এই হিসাবের ভিত্তি এই যে মাটির সুস্থিত জৈবপদার্থের কার্বন-নাইট্রোজেনের অনুপাত দশের কাছাকাছি। এই বিষয়টি হিউমাস প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে মাটির কার্বন শতাংশ জেনে তার দশমাংশ নাইট্রোজেন বলে ধরা হয়। শতাংশ থেকে প্রতি হেকটেয়ারে কেজিতে প্রকাশ করতে হলে 2.25×10^6 দিয়ে গুণ করতে হয়। অতএব 0.01% নাইট্রোজেন হবে প্রতি হেকটেয়ারে 225 কেজি। মধ্যম মানের মাটির নাইট্রোজেন শতাংশ ধরা হয় 0.06%, অর্থাৎ প্রতি হেকটেয়ারে 1350 কেজি। এই পরিমাণ শস্যোৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট হলেও বাইরে থেকে নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করতে হয়, কারণ লভ্য নাইট্রোজেনের অতি অল্প অংশ ধীরে ধীরে মুক্তিলাভ করে—এত ধীরে যে গাছের চাহিদা মেটাতে অক্ষম।

ফসফরাস: অম্লমাটি বাদে সবরকম মাটির বেলায় 0·5M সোডিয়াম বাইকার্বনেট দ্রবণ, PH 8·5 প্রযোজ্য। একে অল্‌সেন পদ্ধতি বলা হয়। অম্লমাটির বেলায় ত্রে পদ্ধতি প্রযোজ্য। এই পদ্ধতিতে 0·025N হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং 0·05N অ্যামোনিয়াম বাইফ্লুয়োরাইড মিশ্র দ্রবণ ব্যবহার্য।

পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম: প্রশম 1 N অ্যামোনিয়াম অ্যাসিটেট দ্রবণে (PH 7·0) ক্যাটায়ন বিনিময় প্রক্রিয়ায় মুক্ত অংশ।

বোরন: গরম জলে দ্রবণীয় অংশ।

সালফার: 1% সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণে মুক্ত অংশ।

ম্যাঙ্গানিজ, কপার, জিঙ্ক, আয়রন: 0·005M DTPA (ডাই ইথিলিন ট্রাই অ্যামিন পেন্টা অ্যাসেটিক অ্যাসিড) দ্রবণে (PH 7·3) মুক্ত অংশ।

মলিবডেনাম: 1 N অ্যামোনিয়াম অ্যাসিটেট দ্রবণে (PH3·0) মুক্ত অংশ।

পুষ্টিখাদ্যগুলি একযোগে কাজ করে। তার মধ্যে যে তিনটি উদ্ভিদের বৃদ্ধির এবং প্রত্যাশিত ফলনের পরিমাণ নির্ধারণ করে তারা হল নাইট্রোজেন ফসফরাস এবং পটাসিয়াম। মাটিতে এদের পরিমাণ ক্রমশ বাড়িয়ে ফলন বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু তারও সীমা আছে এবং তার বেশি বাড়ালে ফলন কমে। সুতরাং সর্বোচ্চ ফলনের জন্য পুষ্টি খাদ্যের পরিমাণ সীমিত এবং নির্ধারিত। অবশ্য পুষ্টি খাদ্যের সদ্ব্যবহার নির্ভর করে উপযুক্ত জল, তাপমাত্রা, আলো, মাটির জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার উপর। এদের মধ্যে একটি পুষ্টি খাদ্যও নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে কম হলে ফলনের আনুপাতিক হ্রাস ঘটে। যথারীতি ঘাটতি পূরণ করলেই ফলন বাড়ে। সাধারণভাবে বলা যায় যে মাটির উর্বরতা সম্পর্কে এই নিয়মগুলি সর্বত্র খাটে।

মাটির উর্বরতা নির্ণয়ের পদ্ধতি

অল্পপরিসরে পরীক্ষার জন্য 5—10 কেজি মাটি একাধিক

গামলায় রেখে তাতে একই বয়সের তিন-চারটি দানা শস্যের চারাগাছ লাগানো হল। চারাগাছ সহ গামলাগুলি একটি গ্রীন হাউসে রাখা হল। সেখানকার আলোর পরিমাণ, তাপমাত্রা এবং বাতাসের আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রিত থাকার দরুন গাছের বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। উপযুক্ত সময়ে পরিপক্ক দানার পরিমাণ মেপে একটি গাছের গড় ফলন জানা যায়। বিভিন্ন মাটি নিয়ে একইরকম পরীক্ষা করে মাটিগুলির তুলনামূলক উর্বরতা নির্ণয় করা যায়।

এবার তিনচারটি মাটি ভরতি পাত্র বাদে অন্য তিন-চারটিতে মাটির সঙ্গে বিভিন্ন পরিমাণ নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করা হল। এইরকম ভাবে পৃথক পৃথক তিন-চারটিতে ব্যবহার করা হল বিভিন্ন পরিমাণ ফসফরাস সার, পটাশ সার, নাইট্রোজেন-ফসফরাস, নাইট্রোজেন-পটাশ, ফসফরাস-পটাশ, এবং নাইট্রোজেন-ফসফরাস-পটাশ সারের বিভিন্ন আনুপাতিক মিশ্রণ। এইসব পাত্রগুলিতে চারা গাছ লাগিয়ে, পরিশেষে ফলনের পরিমাণ মাপলে জানা যাবে সার প্রয়োগে ফলন কতখানি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সর্বাধিক ফলন কোন মিশ্রণের বেলায় পাওয়া গেল। সর্বাধিক ফলনই যে আর্থিক বিচারে সুবিধাজনক হবে, তা বলা যায় না। অতএব ফলনের সারের মূল্য এবং অন্যান্য খরচের সঙ্গে ফলনের মূল্যের যাচাই করে বুঝতে হবে কোন মিশ্রণটি সর্বাধিক লাভজনক।

অল্প পরিসরে যে ফল পাওয়া গেল তাকে মাঠে বিস্তৃত পরিসরে একই পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রমাণিত না করা পর্যন্ত কৃষকের কাছে সুপারিশ করা যায় না। এই ধরনের পরীক্ষার জন্য পরিসংখ্যানবিদের পরামর্শ বিধেয়।

পুষ্টিখাদ্যের ঘাটতি এবং বাড়তির পরিণাম

যে মাটিতে বিনা সার প্রয়োগে সুফলফল পাওয়া যায় তার পুষ্টিখাদ্যগুলির মধ্যে আনুপাতিক সামঞ্জস্য বর্তমান। কোন একটি পুষ্টিখাদ্যের অভাব ঘটলে গাছের পাতায়, ফুলে কিংবা ফলে অসুস্থতার চিহ্ন কোন না কোন রকমে প্রকট হয়। যেমন, পাতার রং বদলায়, অথবা পাতা, বোঁটা নয়ত ডগা থেকে শুকোতে থাকে, অথবা ফুল বা ফল অকালে ঝরে পড়ে। উপযুক্ত সময়ে ঘাটতি পূরণ করলে গাছ সুস্থ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে মাটিতে পুষ্টিখাদ্যের বাড়তি ঘটলে ফলন কম হতে পারে এবং তার সঙ্গে গাছের চেহারায় পাতা ফল ফুলে কিছু বৈষম্য দেখা দেয়। মুখ্য পুষ্টি খাদ্যগুলির মত অনুখাদ্যের ঘাটতি অথবা বাড়তি ঘটলেও গাছের চেহারায় অসুস্থতার লক্ষণ প্রকট হয়। গাছের কোন বিশেষ অংশের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করলে পুষ্টি ও অনুখাদ্যের ঘাটতি কিংবা বাড়তি ধরা পড়ে।

মাটির উৎপাদন ক্ষমতা নির্ণয় পদ্ধতি এবং তার সীমাবদ্ধতা

মাটির উৎপাদন ক্ষমতার একটি সামগ্রিক চিত্র পেতে হলে অনেক দিক থেকে বিচারের প্রয়োজন হয়। মাটির রঙ, গ্রথন, গঠন, অম্লত্ব, ক্ষারত্ব লবণাক্ততা, হিউমাসের পরিমাণ, কেঁচো জাতীয় জন্তুর উপস্থিতি, কাদাকণার মিনারেল, আয়ন বিনিময় ক্ষমতা ইত্যাদি। আমরা জেনেছি যে মোট পুষ্টি খাদ্যের অতিসামান্য অংশই গাছের পক্ষে লভ্য। সেই লভ্যাংশের পরিমাণ নির্ণয় করার পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। পুষ্টি খাদ্যের ঘাটতি, জ্যায্যতা, কিংবা বাড়তি কীভাবে জানা যায় এবং কীভাবে বৈষম্যের প্রতিকার সম্ভব সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করা দরকার। কেবল লভ্যাংশের পরিমাণ জেনে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যায় না। জানতে হবে মাটিতে সার ব্যবহার করে ফলনের পরিমাণ, হোক তা অল্পপরিসরে গামলায় অথবা বড় পরিসরে মাঠে। এই পদ্ধতি কিছু আগেই বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বহুরকম মাটির লভ্যাংশ নির্ণয় করে এবং সার প্রয়োগের ফলে তাদের ফলন ক্ষমতার তারতম্য লক্ষ করে এবং মাটির গ্রথন PH-এর সঙ্গে মিল রেখে সুপারিশগুলি প্রয়োগ করা হয়। পরীক্ষালব্ধ নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশের পরিমাণের ভিত্তিতে, অনেক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ফলে এবং কিছুটা আন্দাজে, মাটির মানকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়: উঁচু, মধ্যম, নিচু। একটি পরীক্ষিত মাটির দৃষ্টান্তই ধরা যাক। এই মাটির নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশের লভ্যাংশ প্রতি হেকটেয়ারে যথাক্রমে 1350, 30 এবং 300 কেজি। অর্থাৎ এই মাটির নাইট্রোজেন মধ্যম মানের, ফসফরাস নিচু মানের এবং পটাশ উচ্চ মানের। অতএব সুপারিশ অনুসারে ফলন যথোপযুক্ত বাড়াতে হলে নাইট্রোজেন ও ফসফরাস যথাক্রমে হেকটেয়ার প্রতি 25 এবং 20 কেজি প্রয়োগ করতে হবে। পটাশ যথেষ্ট আছে সুতরাং বাইরে থেকে প্রয়োগ করার দরকার হবে না। আশ্চর্য লাগছে যে নাইট্রোজেনের পরিমাণ অতিমাত্রায় বেশি থাকা সত্ত্বেও বাইরে থেকে তুলনায় অতি নগণ্য হলেও 25 কেজি প্রয়োগ করতে হচ্ছে। যে নাইট্রোজেন লভ্য হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে তা গাছের তাৎক্ষণিক

চাহিদা মেটাতে পারছেনা, সুতরাং বাইরে থেকে প্রয়োগ আবশ্যক হয়ে পড়ছে। প্রশ্ন হতে পারে দুর্লভ নাইট্রোজেনকে সহজলভ্য করা সম্ভব কিনা। মনে হয় উপযুক্ত জীবাণু এই কাজটি করতে পারে। আপাত দৃষ্টিতে মাটিতে এই ধরনের জীবাণু হয়ত নেই। এই প্রকার আবদ্ধ নাইট্রোজেনকে ভেঙে ফেলতে পারে এমন জীবাণু কি তৈরি করা যায় না? মৃৎবিজ্ঞানীদের দায়িত্ব হওয়া উচিত এই কঠিন সমস্যার সমাধান করা।

এই পদ্ধতিটির সীমাবদ্ধতা এই যে দুটি বিভিন্ন গ্রথনের মাটির লভ্যাংশের পরিমাণ এক হলেও সার প্রয়োগ এক রকমের হবে না। প্রধানত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে পরিমাণ ঠিক করতে হয়। মাটি হালকা হলে প্রয়োগমাত্রা কমাতে হবে এবং সারের কার্যকারিতা বজায় রাখতে হলে সার প্রয়োগ একাধিক পর্যায়ে বণ্টন করা বাঞ্ছনীয় হবে। দ্বিতীয় সীমাবদ্ধতা এই যে সার প্রয়োগের মাত্রা বিভিন্ন শস্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হবেই, এমন কি একই শস্যের অন্য প্রজাতির ক্ষেত্রেও প্রয়োগমাত্রা বিচার করে ঠিক করতে হবে। এখানেও পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যায় কিংবা পৃথক পরীক্ষার সাহায্যে ঠিক করা উচিত। সীমাবদ্ধতা আরও রয়েছে। যে মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ অতিসামান্য সে মাটিতে কৃত্রিম সার প্রয়োগের মাত্রা কিছুটা কম হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আরও কয়েকটি সীমাবদ্ধতার উল্লেখ করা যেতে পারে, তা হল মাটির অম্লত্ব, ক্ষারত্ব এবং লবণাক্ততা। এই তিনটি সীমাবদ্ধতার প্রতিকার না করে সার প্রয়োগে ফলন বাড়তে পারে না। অম্লত্ব দূর করার জন্য চুনপ্রয়োগ অবশ্য প্রয়োজনীয়। এক্ষেত্রে PH-ই একমাত্র নির্দেশক নয়। এখানে মাটির গ্রথন এবং জৈবপদার্থের উপর ভিত্তি করে চুনের পরিমাণ ঠিক করতে হয়। ক্ষারত্ব দূর করায় জন্য সালফার অথবা পাইরাইটিস (আয়রণ ও সালফার যৌগ) ব্যবহার্য। লবণাক্ততা দূর করার জন্য জিপসাম প্রয়োগ সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু লবণকে বিশেষ করে সোডিয়াম লবণকে, গাছের শিকড়ের গণ্ডির বাইরে রাখতে প্রচুর পরিমাণ জলের প্রয়োজন। এছাড়া কোন উপায় নেই।

অন্যান্য পুষ্টিখাদ্য

মাটি পরীক্ষার ক্ষেত্রে কেবল নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশের কথাই উল্লেখ করা হল। বলা বাহুল্য যে এই তিনটিই হল প্রধান পুষ্টিখাদ্য। কিন্তু অপ্রধান অন্যান্য পুষ্টিখাদ্যের অভাব ঘটলেও ফলন কমে যায়। এদের পরিমাণগত প্রয়োজন অল্প হলেও উপযুক্ত ফলন পেতে হলে এদের প্রতিও দৃষ্টি রাখতে হয়। তাছাড়া উদ্ভিদের সম্পূর্ণ ও সুস্থ পুষ্টির জন্য চাই কতকগুলি অনুখাদ্য। সাধারণত মাটিতে এরা যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। এদের অভাবে উদ্ভিদ পূর্ণ স্বাস্থ্য নিয়ে বাড়তে পারে না। অসুস্থতার নিদর্শন হল পাতার রং বদলানো কিংবা ক্রমশ শুকিয়ে যাওয়া। অসুস্থতার প্রথম পর্বে খুব লঘুমনত্ব বিশিষ্ট অনুখাদ্যের দ্রবণ ছিটিয়ে দিলে অনেক ক্ষেত্রে সুস্থতা ফিরে আসে। পরবর্তী ফসলের জন্য মাটিতে অনুখাদ্য প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।

অন্যান্য অনুখাদ্যের মধ্যে সালফার এবং জিঙ্কের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। অ্যামোনিয়াম সালফেট-এর পরিবর্তে ইউরিয়া ব্যবহার চালু হওয়ার কয়েক বছর বাদেই অনেক মাটিতে সালফারের অভাব লক্ষ করা হয়। তাছাড়া সিঙ্গল সুপারফসফেটের ব্যবহার কমে যাওয়ার দরুন এর সঙ্গে যুক্ত জিপসাম (ক্যালসিয়াম সালফেট) মাটিতে দেওয়া হচ্ছে না। এই কারণে সালফারের অভাব খুব ব্যাপক দেখা যাচ্ছে। উচ্চফলনশীল জাতের শস্যোৎপাদন যত বেড়ে যাচ্ছে ততই জিঙ্কের অভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। অতএব ফলন উচ্চমানে রাখতে জিঙ্ক ও সালফার প্রয়োগ আবশ্যিক হয়ে পড়েছে।

মাটি পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে সার প্রয়োগের পদ্ধতি সঠিক ও কার্যকর করতে হলে উল্লিখিত জটিলতা ও সীমাবদ্ধতার বিষয়টি মনে রাখতে হবে, কারণ সঠিক সার প্রয়োগের উপর নির্ভর করছে কৃষিজাত দ্রব্যাদির ফলন লাভবান কিনা।

দেশে এখন প্রায় দশ কোটি মেট্রিক টন নাইট্রোজেন সার তৈরি হয়, বেশির ভাগ ইয়ুরিয়া হিসাবে। আড়াই কোটি টন ফসফরাস সার তৈরি হয়, অধিকাংশ সিঙ্গল সুপার ফসফেট রূপে। পটাসিয়াম আমদানি করতে হয় এক কোটি টন। বর্তমানে নাইট্রোজেন ও ফসফরাস আমদানি করতে হয় যথাক্রমে প্রায় এককোটি টন এবং পঁচিশ লক্ষ টন। সারের ব্যবহার দ্রুত হারে বাড়ছে। প্রতি হেকটেয়ারে 1970-71 সালে (তখন সবেমাত্র উচ্চফলনশীল জাতের বীজ চালু হয়েছে) নাইট্রোজেন, ফসফরাস (P_2O_5) এবং পটাশ (K_2O) প্রয়োগ করা হত যথাক্রমে 8.9, 3·3 এবং 1.4 কেজি। সেই তুলনায় 1987-88-এ ব্যবহৃত হচ্ছে যথাক্রমে

32.8, 12.0 এবং 4.9 কেজি প্রতি হেকটেয়ারে। অথচ তথ্যাদি বিচার করে জানা গেছে যে বাইরে থেকে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করা হয়, তার মাত্র 25-30 শতাংশ শস্যাদি ব্যবহার করে, বাকি অংশের বেশির ভাগ সেচ ও বৃষ্টির জলে ধুয়ে বেরিয়ে যায় নদী নালায়, এবং কিছু পরিমাণ জীবাণুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে নাইট্রোজেন অক্সাইড এবং পরিশেষে নাইট্রোজেন গ্যাস হিসাবে বাতাসে মিশে যায়। ওজোন গহ্বর তৈরি করতে যে সব গ্যাস দায়ী নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O) অন্যতম। অতএব শস্যাদির মোট নাইট্রোজেন চাহিদার অধিকাংশ (70-75%) মেটায় মাটি এই তথ্যটি মনে রাখা দরকার। এই কাজে মাটিস্থিত জীবাণুদের অবদান সর্বাধিক।

ইয়ুরিয়া বাদে আরও দুটি নাইট্রোজেন সার, যথা অ্যামোনিয়াম সালফেট এবং ক্যালসিয়াম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (CAN) অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করা হয়। ইয়ুরিয়ার তুলনায় এদের তৈরির পরিমাণও খুবই কম। ইয়ুরিয়ার বেলায় আর্দ্র বিশ্লেষণ বিক্রিয়ার দ্বারা অ্যামোনিয়াম আয়ন তৈরি হয়। অন্তদুটি সরাসরি জলের সান্নিধ্যে অ্যামোনিয়াম এবং নাইট্রেট আয়ন তৈরি করে। অক্সিজেনের উপস্থিতিতে নাইট্রোসোমোনাস এবং অ্যাজোটোব্যাকটার জীবাণুরা প্রথমে অ্যামোনিয়াম থেকে নাইট্রাইট এবং পরিশেষে নাইট্রেট তৈরি করে। নাইট্রেট রূপেই উদ্ভিদ নাইট্রোজেন আহরণ করে। যেহেতু ইয়ুরিয়া থেকে অ্যামোনিয়া তৈরি হতে একটু সময় লাগে সেই কারণে ইয়ুরিয়া থেকে নাইট্রেটে রূপান্তর অন্যদুটির তুলনায় কিছুটা মন্দগতি। নাইট্রেট জলে দ্রুত দ্রবণীয় এবং উদ্ভিদ প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করার পর বাকি অংশ জলের সঙ্গে মাটি থেকে বেরিয়ে যায়। মাটি ক্যাটায়নদের যেমন ধরে রাখে অ্যানায়নদের তেমন ধরে রাখতে পারে না। নাইট্রেট একটি অ্যানায়ন। অতএব মাটিতে নাইট্রেট তৈরির হার যত শ্লথ হবে নাইট্রেট আহরণের সম্ভাবনা তত বেড়ে যাবে এবং সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে। এই জন্য নাইট্রোজেন সার হিসাবে অ্যামোনিয়াম লবণাদির প্রয়োগ ক্রমশ কমছে। ধান চাষের বেলায় ইয়ুরিয়া থেকে অ্যামোনিয়াম আয়ন তৈরির হার শ্লথ হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করে কয়েকটি পদ্ধতির ব্যবহার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তার মধ্যে তিনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (১) কাদার গোলায় ইয়ুরিয়ার দানা ভরে উপযুক্ত দূরত্বে মাটিতে পুঁতে দেওয়া। কাদায় ঢাকা থাকার দরুন বিক্রিয়াগুলি শ্লথ হতে বাধ্য। পদ্ধতিটি সহজ কিন্তু হাতে করতে হলে খরচ বেশি পড়ে। (২) নাইট্রোজেনজ এনজাইমের সাহায্যে অ্যাজোটোব্যাকটার নাইট্রেট তৈরি করে। এই এনজাইমের কার্যকারিতা কমিয়ে দেওয়া যায় কৃত্রিম রাসায়নিক বস্তুর দ্বারা। একই ফল পাওয়া গেছে নিমের খোলের সঙ্গে ইয়ুরিয়া মিশিয়ে। (৩) ইয়ুরিয়ার দানা খুব বড় হলে তার দ্রবণীয়তা হ্রাস পায় এবং সেই অনুপাতে অ্যামোনিয়াম আয়নে রূপান্তরও মন্দগতি হয়। পদ্ধতিটি সহজ বটে কিন্তু বড় দানা তৈরির খরচ খুব বেশি। নিমের খোল-ইয়ুরিয়া মিশ্রণ পদ্ধতিটি ভারতীয় বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার। অন্য দুটির তুলনায় খরচ কম।

জৈব সার

উচ্চফলনশীল জাতের বীজ ব্যবহার করে উৎপাদন বাড়াতে এবং মান বজায় রাখতে ক্রমশ অধিক থেকে অধিকতর রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হচ্ছে। বর্তমান উৎপাদনের মাত্রা বজায় রাখতে প্রায় 12 মিলিয়ন টন (মি. ট.) নাইট্রোজেন-ফসফরাস-পটাশ সারের প্রয়োজন হচ্ছে। জনসংখ্যার সঙ্গে তাল রেখে উৎপাদন বাড়াতে 1994-95-এ দরকার হবে 16 মি.ট. এবং 1999-2000-এ দরকার হবে 20 মি.ট.। এত অধিক চাহিদা মেটাতে আরও সার কারখানা স্থাপিত করতে এবং আমদানি করতে হবে। তাছাড়া অধিকমাত্রায় রাসায়নিক সার প্রয়োগে মাটির যে ক্ষতি হচ্ছে তাও বাড়তে থাকবে। প্রয়োগের মাত্রা বাড়ালে অব্যবহৃত অংশের মাত্রাও বাড়বে। তার ফলে একদিকে যেমন আর্থিক ক্ষতি; অন্যদিকে ঐ অংশ নদী নালায় মিশে মাছ ইত্যাদির ক্ষতি সাধন করবে, জলজ উদ্ভিদাদি সংখ্যায় বহুগুণ বাড়বে এবং জল পানের অযোগ্য হয়ে পড়বে। এই সমস্যাগুলি প্রধানত ধান চাষের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে দেখা যাচ্ছে।

উৎপাদন বাড়াতে সারপ্রয়োগ অনিবার্য। কিন্তু উপরি উক্ত সমস্যাগুলির প্রতিকার করতে বিকল্প অবলম্বনের ভাবনা জরুরি হয়েছে। এই বিকল্প হল জৈব সার। এটা ঠিক নয় যে এটি একটি নতুন ভাবনা। সারের উৎপাদন যখন চাহিদার তুলনায় কম ছিল তখন নানাবিধ জৈব সারের প্রয়োগ ব্যাপক ছিল। অবশ্য জৈব সার ব্যবহারে উৎপাদন কম হত। ক্রমশ সার তৈরি ও প্রয়োগের মাত্রা বাড়তে থাকার দরুন জৈব সারের প্রয়োগ কমতে থাকে। এই অবস্থায়

জৈব সার প্রয়োগের বিস্তার ঘটাতে হলে এমন পন্থার কথা ভাবতে হবে যাতে জৈবসার প্রয়োগের দ্বারা উৎপাদন অপেক্ষাকৃত তুলনামূলক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

বিগত দশ-বারো বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কৃষি বিজ্ঞানীরা জৈবসার নিয়ে গভীর ও বিস্তারিত গবেষণা কর্ম করেছেন এবং যে সব তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে আশা করা যেতে পারে যে কৃত্রিম সার প্রয়োগের ফলে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে তার একটি সুস্থ সমাধান পাওয়া যাবে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে গবেষণাকর্ম সাধারণত ছোট মাপে করা হয়, তাকে বড় মাপে প্রয়োগ করতে যে সব নতুন সমস্যা আসতে বাধ্য তার মোকাবিলা করা খুব সহজ হবে না একথা বলাই বাহুল্য।

জৈব সারের রকমারি

জৈব সার মূলত কার্বনঋদ্ধ বহুবিধ বৃহদণু যৌগের সমষ্টি। এরা উদ্ভিদ জগতের সৃষ্টি। মূল্য খাদ্য কার্বন ডাই অক্সাইড ও জল ব্যবহার করে মাটি থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে উদ্ভিদ দেহে কত রকমারি যৌগের সৃষ্টি হয় তার ইয়ত্তা নেই। পরভোজী জীবজন্তুরা উদ্ভিদকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করে তাদের দেহ গঠন, পোষণ ও বৃদ্ধির জন্য। কিছু অংশ তারা বর্জন করে। এই বর্জ্যপদার্থও কার্বনঋদ্ধ এবং কোন না কোন জীবজন্তুর খাদ্যের যোগান দিতে পারে। মোটামুটি দুধরনের জৈব পদার্থ পাই যাদের জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। প্রথম শ্রেণীর হল আদি উদ্ভিদ পদার্থ, দ্বিতীয়টি হল পরভোজী জীবজন্তুর বর্জ্য পদার্থ।

শস্যাদির এবং অন্যান্য উদ্ভিদাদির অব্যবহৃত অংশ, শিম জাতের সবুজ সার, নীলসবুজ শেওলা, অ্যাজোলা, হরেক রকম জীবাণু এবং নানাপ্রকার ক্ষুদ্রাকার জীবজন্তুর দেহাবশেষ প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হল পচানো খড় ইত্যাদি সহ জীবজন্তুর মল মূত্রাদি, শহরের ময়লা, চিনিকলের বর্জ্যপদার্থ। সার হিসাবে এদের উপযোগিতা সম্পর্কে সন্দেহের কারণ নেই, যেহেতু এদের উৎসই হল মাটি থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদাদি। স্থান কাল পাত্র বিশেষে প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে পুষ্টি খাদ্যের পরিমাণগত পার্থক্য রয়েছে। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন জৈব সারের মধ্যে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন ফসফরাস এবং পটাশিয়াম পাওয়া যায় তার একটা গড় হিসাব পরের কলমে দেওয়া হল।

জৈব সার	মোট পরিমাণ (হাজার টন) মি: ট:	N	P_2O_5	K_2O
গোবর সার	280	2800	2000	2070
শস্যাদির অবশেষ	270	1300	1950	3900
বনবৃক্ষাদির অবশেষ	19	100	37	100
খড় ইত্যাদি পচানো সার	285	1430	860	1420
শহরের বর্জ্য পদার্থ	15	95	80	110
চিনিকলের বর্জ পদার্থ	3	35	80	55

সর্বসাকুল্যে প্রায় 19 মি.ট. নাইট্রোজেন-ফসফরাস-পটাশ পাওয়া যেতে পারে যদি সংগ্রহের কাজ ঠিক মত করা যায়। এছাড়া প্রতিটন সবুজ সার, নীল সবুজ সার এবং অ্যাজোলা থেকে প্রধানত পাওয়া যায় যথাক্রমে 4·5, 2·5 এবং 3 কেজি নাইট্রোজেন। শিম জাতীয় শস্যের বাতাস থেকে নাইট্রোজেন আহরণ করার ক্ষমতা নির্ভর করে মাটিতে উপযুক্ত পরিমাণে রাইজোবিয়াম থাকার উপর। প্রতিটি শিম জাতের জন্য বিশেষ বিশেষ রাইজোবিয়াম দরকার। রাইজোবিয়াম প্রয়োগ করে প্রতি হেকটেয়ারে প্রায় 20 কেজি নাইট্রোজেন মাটিতে যোগ হতে পারে। বর্তমানে ভারতবর্ষে প্রায় এক হাজার টন রাইজোবিয়াম প্রত্যেক বছর উৎপাদন করা হচ্ছে, বিশেষ করে রাজ্য সরকারের এবং কয়েকটি শিল্পসংস্থার আনুকূল্যে।

বর্তমানে প্রতিবছর প্রায় 200 টন নীল সবুজ সার পাওয়া যাচ্ছে রাজ্যস্তরের জৈব সার প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের বায়োটেকনোলজি বিভাগ কয়েকটি রাজ্যে বায়োফার্টিলাইজার, বিশেষ করে নীলসবুজ শেওলা এবং অ্যাজোলা সম্পর্কে গবেষণা সংস্থা স্থাপন করেছে। নীলসবুজ শেওলা, অ্যাজোলা এবং শিম জাতীয় শস্যাদির মোট পরিমাণ সঠিক জানা কঠিন, কারণ এখন পর্যন্ত এদের প্রয়োগ ব্যাপকতা লাভ করেনি এবং কৃষকদের পছন্দের উপর এই জাতীয় সারের ব্যবহার নির্ভর করছে।

জৈব সারের কার্যকারিতা

বর্তমানে শস্যোৎপাদনে জৈব সারের কার্যকারিতা সম্পর্কে নতুন করে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছে, বিশেষ করে রাসায়নিক সার প্রয়োগের ফলে ক্রমশ মাটির স্বকীয় উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে জেনে। কেবল জৈব সার অথবা আংশিক জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগে শস্যের উৎপাদন কতখানি প্রভাবিত হয় তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল।

হেকটেয়ার প্রতি 12 টন গোবর সার ব্যবহার করে ধান

গম এবং তুলার ক্ষেত্রে যথাক্রমে 100·210, 80·290 এবং 50-90 কেজি উৎপাদন বেশি পাওয়া গেছে। অন্যত্র ভুট্টা, গম ও ধানের বেলায় রাসায়নিক সারের সঙ্গে গোবর সার ব্যবহার করে হেকটেয়ার প্রতি 300-500 কেজি বেশি ফলন পাওয়া গেছে।

শিম জাতীয় সবুজসার প্রধানত নাইট্রোজেন যোগ করে। অতএব সবুজসারের সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ ফসফরাস ও পটাশ প্রয়োগ করলে হেকটেয়ার প্রতি ফলন 2000 থেকে 3100 কেজি বৃদ্ধি পায়। তার উপর যদি 60 কেজি নাইট্রোজেন সার যোগ করা হয় তাহলে ফলন আরও বৃদ্ধি পেয়ে 4600 কেজি হতে পারে। জৈব সারের তুলনায় সবুজ সার প্রায় তিনগুণ বেশি কার্যকর।

অ্যাজোলা এবং নীলসবুজ শেওলা উভয়ে মাটিতে নাইট্রোজেন যোগ করে। কেবল অ্যাজোলা এবং কেবল 30 কেজি নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করে হেকটেয়ার প্রতি ধানের ফলন পাওয়া গেছে যথাক্রমে 2600 এবং 3000 কেজি। অ্যাজোলার সঙ্গে 30 কেজি নাইট্রোজেন সার যোগ করলে ফলন বেড়ে 3400 কেজি হতে পারে। নীলসবুজ শেওলার প্রয়োগে অনুরূপ ফলন লক্ষ করা গেছে। কোন সার, জৈব কিংবা রাসায়নিক, ব্যবহার না করে হেকটেয়ার প্রতি পাওয়া গেল 2400 কেজি। কেবল নীলসবুজ শেওলা প্রয়োগে ফলন বেড়ে হল 2800 কেজি, এবং কেবল 60 কেজি নাইট্রোজেন সার প্রয়োগে ফলন হল 3500 কেজি। তার বদলে 40 কেজি রাসায়নিক নাইট্রোজেন সারের সঙ্গে নীলসবুজ শেওলা প্রয়োগে ফলন বেড়ে হল 3600 কেজি। শস্যাদির অবশেষ মাটির সঙ্গে চাষ করে দিলে সারের কাজ করে। যেমন ধানের খড়, ভুট্টার খড় এবং আখের বর্জ্য অংশ হেকটেয়ার প্রতি 5 টন হিসাবে ব্যবহার করে গমের ফলন যথাক্রমে 38, 26 এবং 12 শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। বায়োগ্যাস তৈরির পাত্রে অবশিষ্ট অংশ সারের কাজ করে। বস্তুত গোবর সারের তুলনায় এই অংশ অধিকতর কার্যকর। জৈব সারের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে এই সার প্রথম ফসল ছাড়া পরবর্তী ফসলের উৎপাদনও বাড়ায়।

শহরাদির বেলায় আবাসিক অঞ্চল থেকে নির্গত ময়লা এবং ময়লাবাহী জল উভয়ই কৃষিকার্যে ব্যবহার্য। এই সব জলে প্রায়শ ধাতব আয়ন এবং রোগবাহী বীজাণু থাকে। ধাতব আয়নদের মধ্যে কপার, জিঙ্ক, ম্যাঙ্গানিজ, ক্যাড্‌মিয়াম, ক্রোমিয়াম, নিকেল এবং প্ল্যাটিনাম বিভিন্ন পরিমাণে থাকে। এদের মধ্যে কপার, জিঙ্ক ও ম্যাঙ্গানিজ অনুখাদ্যের কাজ করে বটে, কিন্তু পরিমাণ বেশি হলে বিষবৎ ক্রিয়া করে। সাধারণত এই তিনটির পরিমাণ অন্যগুলির তুলনায় বেশিই থাকে। ময়লা জলকে সংশোধিত করে ব্যবহার করলে দেখা যায় ফলন যেমন বাড়ে, শস্যাদির মধ্যে দূষিত দ্রব্যাদিও অনেক কমে যায়। সংশোধন করার দুটি পদ্ধতির উল্লেখ করা যেতে পারে। একটি হল সামান্য চাপে বাতাস প্রবেশ করিয়ে রোগবাহী বীজাণুদের ধ্বংস করা এবং ধাতব আয়নদের জারিত করে হাইড্রকসাইড রূপে নিষ্ক্রিয় করা। দ্বিতীয় পদ্ধতি হল মাছের চাষ করা। মাছ চাষের ফলে জল সংশোধিত হয় এবং সেচের পক্ষে উপযুক্ত হয়। কলকাতার পূর্বাঞ্চলের ভেড়িগুলিতে দ্বিতীয় পদ্ধতিটি প্রচলিত। এসব সত্ত্বেও বিষাক্ত ধাতব আয়নগুলির পরিমাণ যথেষ্ট কমাতে না পারলে দূষণের সম্ভাবনা থাকছে।

মাটির অপমৃত্যু

মাটি পরীক্ষাকে ভিত্তি করে সঠিক পরিমাণে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করলে উপযুক্ত ফলন লাভ করা যায়। ভর্তুকি সত্ত্বেও সারপ্রয়োগ বহু কৃষকের সাধ্যের বাইরে। সেইকারণে তারা সুপারিশের কম সার ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। অন্য দিকে যাদের সাধ্য আছে তারা সঠিকেরও বেশি সার ব্যবহার করে। এই অবস্থা বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় উচ্চফলনশীল জাতের বেলায়। যথেষ্ট লাভ হয় বলে বেশি পরিমাণ সার প্রয়োগের প্রতি ঝোঁক থাকে। গত তিরিশ বছরে ক্রমশ অধিকতর সার প্রয়োগের ফল এই হয়েছে যে পাঁচ-সাতগুণ সার ব্যবহার করেও ফলন দুই-তিন গুণের বেশি বাড়ছে না। এর কারণ কী? যে সব জীবাণুরা মাটিতে অবস্থিত পুষ্টি খাদ্যাদিকে লভ্য অবস্থায় গাছের শিকড়ের নিকট পৌঁছে দেয় তাদের দায়িত্ব ফুরিয়েছে। বিভিন্ন কার্বন যৌগকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে যারা এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পন্ন করে, যারা মাটির সজীবতা এবং মাটিত্ব বজায় রাখে মাটিতে তাদের আর স্থান নেই। অধিক মাত্রায় সার প্রয়োগের ফলে এবং আনুষঙ্গিক কীটনাশক রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করে ঐ জীবাণুদের অবলুপ্তি ঘটিয়ে মাটি যে অবস্থায় পৌঁছেছে তাকে অপমৃত্যু ছাড়া আর কীই বা বলা যায়!

মাটির আর একরকম অপমৃত্যু ঘটে যখন এক জায়গার মাটি বৃষ্টির জলে ধুয়ে নদীনালা এবং শেষ পর্যন্ত সমুদ্রে আশ্রয় লাভ করে। ঢালু জমিতে এই রকম ক্ষয়ের সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু যে মাটিতে জৈব পদার্থ জীবাণুদের দ্বারা রূপান্তরিত হয়ে দৃঢ় গঠন দানা সৃষ্টি করে সেখানকার মাটির অপমৃত্যু ঘটে না।

গ্রন্থসমালোচনা

তসলিমা নাসরিনের "লজ্জা"

শিবনারায়ণ রায়

প্রবাসীর পৃষ্ঠায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত 'সেখ আন্দু' উপন্যাসটি কিছুকাল আগে আবিষ্কার করে খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম। সেই বইটির কথা অন্যত্র লিখেছি। নিতান্ত রক্ষণশীল হিন্দুপরিবারের তরুণী বধূ শৈলবালা ঘোষজায়ার এই প্রথম উপন্যাস—নায়ক একটি মুসলমান যুবক, দুটি হিন্দু মেয়ে তাকে ভালবেসেছে, স্বভাবতই সে ভালবাসা বিবাহে পরিণতি পায় নি। এই উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল আমার জন্মের আগে, ১৯১৫ সালে। সে যুগে শৈলবালার সেই তুলনাবিহীন দুঃসাহস—যতদূর স্মরণ করতে পারি যে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র এ জাতীয় কোনো কাহিনী কল্পনা করেন নি—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। আয়েষা ভালবেসেছিলেন জগৎসিংহকে, বজ্রাওনের নবাবপুত্রী আত্মনিবেদন করতে গিয়েছিলেন ব্রাহ্মণ কেশর লালের কাছে, বৈষ্ণবী কমললতা পর্যন্ত ফকির কবি গহরের প্রেমে পড়েন নি, প্রেমে পড়েছিলেন শ্রীকান্তের। মুসলমান নায়কের প্রতি উচ্চবর্ণের শিক্ষিত হিন্দু রমণীর অনুরাগের কাহিনী নিয়ে উপন্যাস শৈলবালার আগে কেউ লিখেছেন বলে আমার জানা নেই। অথচ আজও শৈলবালা বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস রচয়িতাদের দ্বারা অবহেলিত—তাঁর সেই বইটির কপি এ পর্যন্ত কোনো গ্রন্থাগারে খুঁজে পাই নি।

'সেখ আন্দু' প্রকাশের আটাত্তর বছর পরে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সংক্ষিপ্তকায় উপন্যাস আমাকে একই ভাবে চমৎকৃত করেছে। তবে এই লেখিকা মোটেই উপেক্ষিতা নন—দু মাসের ভিতরে তাঁর বইটির চতুর্থ মুদ্রণ ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। শৈলবালা যখন সেখ আন্দু লেখেন তখন তাঁর বয়স কুড়ি কি একুশ। তসলিমা নাসরিনের বয়স এখন কত আমার জানা নেই—সম্ভবত ত্রিশের ধারেকাছে। এই স্বাধীনচেতা কবি এবং কলামনিস্টকে নিয়ে বাংলাদেশে বিতর্কের অন্ত নেই। ১৯৮৩ সালের শেষ দিকে তিনি গদ্য লেখা শুরু করেন, এবং নরনারী সাম্যের প্রতিষ্ঠায় সমর্পিতপ্রাণ এই লেখিকার প্রখর এবং প্রোজ্জ্বল কলাম দেশের রক্ষণশীল গোষ্ঠীর মনে গভীর আতঙ্ক এবং প্রচণ্ড বিরূপতার উদ্রেক করে। ১৯৯২ সালের গোড়ায় আমি যখন ঢাকায় তখন তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'বালিকার গোল্লাছুট' এবং ব্যক্তিগত প্রবন্ধ সংকলন 'যাবো না কেন? যাবো' পড়ে মুগ্ধ হই। জানতে পারি তাঁকে নানা ভাবে অপমানিত এবং বিপর্যস্ত করবার চেষ্টার কথা। তাঁর আপসহীন র‍্যাডিক্যালিজ্‌ম্, তাঁর সাহস এবং সততা, তাঁর ক্ষিপ্র, নির্মেদ তড়িন্ময় গদ্য আমাকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে। ব্যক্তিগত পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও আমার মনে সন্দেহ থাকে না, মনের দিক থেকে তিনি আমার একজন যথার্থ আত্মীয়। তাঁর বক্তব্য এবং ভাষাকে তারিফ করে লিখি 'চতুরঙ্গে' এবং 'জিজ্ঞাসা'য়।

তারপর গত একবছরে তসলিমার বেশ কয়েকটি কবিতার বই এবং প্রবন্ধ সংকলন পড়েছি।* জিজ্ঞাসা পত্রিকায় এ তাবৎ তাঁর গুটি দুই প্রবন্ধও বেরিয়েছে। তাঁর অধিকাংশ লেখার মূল কথা হল, দীর্ঘযুগের শিকড়গাড়া পুরুষশাসিত অসাম্যভিত্তিক সমাজের উৎপাটন ঘটিয়ে সাম্য ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে সুস্থ নতুন সমাজ গড়া আজ নিতান্ত জরুরি, যে সমাজে মেয়েরা "মানুষ" হিসেবে পূর্ণ স্বীকৃতি পাবে, আর পুরুষরাও "মানুষ" হয়ে উঠবে। তসলিমা প্রচলিত ধর্মকে, সমাজ ব্যবস্থাকে, বদ্ধমূল সংস্কারকে প্রবল ভাবে আক্রমণ করেছেন, নারীদের বলেছেন, "তুমি যদি মানুষ হও শিকল ছিঁড়ে একবার দাঁড়াও"। এ জন্য স্বদেশে তাঁর নিগ্রহের অন্ত নেই, অপরপক্ষে তাঁর বক্তব্য যে বহু পাঠক-পাঠিকার কাছে পৌঁছাচ্ছে তার প্রমাণ তাঁর গদ্যগ্রন্থগুলির দ্রুত পুনর্মুদ্রণ। অর্থাৎ আমরা যা পারিনি, তিনি তা পেরেছেন। আমাদের র‍্যাডিক্যালিজ্‌ম্ মুষ্টিমেয় পাঠকদের ভিতরে আবদ্ধ—তসলিমার র‍্যাডিক্যালিজ্‌ম্ স্বদেশে বিদেশে বহু বাঙালি পাঠকপাঠিকার মনে সাড়া তুলেছে—যাঁরা নানা কারণে তাঁর বক্তব্যের কড়া সমালোচক অথবা বিরোধী তাঁরাও তাঁর সম্পর্কে অজ্ঞ অথবা উদাসীন থাকতে পারেন নি। বস্তুত দূর দেশ থেকে কোনো কোনো বিদেশিনী আমাকে পত্র লিখে জানিয়েছেন, তাঁরাও তসলিমার বিভিন্ন রচনার অনুবাদে আগ্রহী। বিবেকী, নির্ভীক এবং আত্মপ্রত্যয়ী তসলিমা নাসরিনের নিরন্তর প্রয়াসের ফলে বাংলার গদ্যসাহিত্যে এবং সমাজচিন্তায় এক নতুন পর্বের সূচনা দেখে আমার মনে যুগপৎ যা সঞ্চারিত হয়েছে তার নাম আশা এবং আনন্দ।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ আশঙ্কাও ছিল, হয়ত বা তসলিমার র‍্যাডিক্যালিজ্‌ম্ একটি বিশেষ অন্যায়ের উচ্ছেদেই একাগ্র-

* আলোচনার শেষ পৃষ্ঠায় তালিকা দ্রষ্টব্য।

চিত্ত হয়ে থাকবে, এবং ফলে তাঁর লেখায় পৌনঃপুনিকতা দেখা দেবে। এমন সময়ে হাতে এল তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস **লজ্জা**। হাওড়া থেকে শান্তিনিকেতনে আসবার পথে ট্রেনে ৭৯ পৃষ্ঠার এই আখ্যায়িকাটি পড়ে সন্দেহ রইল না, তাঁর আবেগস্কন্ধ বিবেকিতা, পরিবেশসচেতন মুক্তবুদ্ধি, এবং সমস্ত প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে সত্যকথনের অমিত সাহস একেবারেই অক্ষুণ্ণ। এই কাহিনীর বিষয়বস্তু তাঁর আগেকার রচনা থেকে স্পষ্টতই ভিন্ন। বিশুদ্ধ শিল্পনিপুণতার অথবা সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নতার বিচারে তসলিমাকে এখন পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীর কাহিনীকার বলা চলে না। ভার্জিনিয়া উলফ্ বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এখনি তাঁর তুলনা অসঙ্গত। কিন্তু বিশের দশকে যেমন নজরুল ইসলাম তাঁর বৈপ্লবিক প্রাণপ্রাবল্যে এবং গোষ্ঠীমুক্ত কল্পনার সামর্থ্যে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিকে সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে উত্তরণের সম্ভাবনা দেখিয়েছিলেন শতাব্দীর শেষ দশকে তসলিমা নাসরিন তেমনি আমাদের দেখালেন সাম্প্রদায়িকতার ট্রাজেডি কত ভয়ঙ্কর, হয়ত বা অপ্রতিরোধ্য, কিন্তু বিবেকবান শিল্পীর চেতনা তার ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম। এই ট্রাজেডিই **লজ্জার** কাহিনী, কিন্তু সে কাহিনী যিনি লিখেছেন সাম্প্রদায়িকতা তাঁর মুক্তবুদ্ধিতে এবং হৃদয়বত্তায় কিঞ্চিৎমাত্রও সংক্রামিত হয় নি। সমকালীন পশ্চিমবঙ্গে ঠিক এই ধরনের বই কেউ লিখেছেন বলে আমার অন্তত জানা নেই। হয়ত ভাগলপুরের বৃত্তান্ত নিয়ে 'প্রেম নেই'-এর কাহিনীকার গৌরকিশোর ঘোষ একদিন লিখবেন।

শৈলবালার কাহিনীর নায়ক একটি মুসলমান তরুণ; তসলিমার কাহিনীর নায়ক এক হিন্দু যুবক। নাম সুরঞ্জন দত্ত। অথবা তার বাবাকেও কাহিনীর নায়ক বলা চলে। কাহিনীর শুরু সাতই ডিসেম্বর, বাবরি মসজিদ ভাঙার পরের দিন। স্থান ঢাকা শহর। সুরঞ্জন "পদার্থ বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নিয়ে ঘরে বসে আছে।" তার বাবা সুধাময় দত্ত "ছিলেন মেডিক্যাল কলেজের এসিস্ট্যাণ্ট প্রফেসর, এসোসিয়েট প্রফেসর হবার তাঁর বড় ইচ্ছে ছিল", কিন্তু তিনি হিন্দু বলে তা সম্ভব হয় নি। সুধাময় বায়ান্নোর আন্দোলনে ছিলেন, উনসত্তরে ঘরে বসে থাকেন নি, হিন্দু আত্মীয় বন্ধু প্রতিবেশীরা ইণ্ডিয়ায় চলে গেছে, তাঁকেও সপরিবারে যাবার জন্য বারবার অনুরোধ করেছে, তিনি তাঁর জন্মভূমি ছেড়ে যেতে রাজি হন নি। সুরঞ্জনের জন্ম আটান্নয়। "সে তার বাবার দেশপ্রেমের উপর আচমকা একটি বালির বস্তা দেখেছে মুখ থুবড়ে পড়তে।" পাকিস্তানী মিলিটারিরা সুধাময়কে ধরে তাঁর লুঙ্গি খুলে তাঁর পুরুষাঙ্গ দা দিয়ে কেটে নিয়েছে, বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়েছে, রাইফেলের বাট দিয়ে তাঁর ডান পাটা ভেঙে দিয়েছে, কিন্তু তাঁকে মেরে ফেলে নি। লুটপাট হয়ে যাওয়া পৈত্রিক বাড়ি বাপঠাকুর্দার ভিটে পঁচাত্তর সালে জলের দরে বিক্রি করে দিয়ে সুধাময় ঢাকায় এসে বাড়ি ভাড়া নিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করেছেন। নব্বই-এর তিরিশ ও একত্রিশে অক্টোবর সে বাড়িও "তছনছ হয়েছে, লুট হয়েছে, পুড়েছে"। এখন সম্পদ বলতে সুধাময়ের আছে শুধু স্ত্রী কিরণময়ী, ছেলে সুরঞ্জন আর মেয়ে মায়া। সুধাময়ের ব্লাডপ্রেসার বেড়ে স্ট্রোক হয়, ডান হাত পা অবশ, তবু সুধাময় স্বদেশ ছেড়ে ইণ্ডিয়ায় যেতে রাজি নন। তিনি "এককালের বামপন্থী বিশ্বাসের মানুষ। সুরঞ্জনকেও গড়ে তুলেছিলেন একই ধারায়"।

বাবরি মসজিদ হিন্দু করসেবকরা ধ্বংস করার মানে "সমগ্র কল্যাণবোধের ওপর, সমবেত বিবেকের ওপর আঘাত"; আর তারই প্রতিক্রিয়ায় এই উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে "শুরু হয়ে গেছে প্রচণ্ড-তাণ্ডব"। "ভারতে শুরু হয়ে গেছে প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।" "বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মন্দিরগুলো ধূলিসাৎ হয়ে যাবে, সংখ্যালঘু হিন্দুদের ঘরবাড়ি পুড়বে, দোকানপাট লুট হবে।" তসলিমা তাঁর কাহিনীর মধ্যে বিস্তর তথ্য এবং পরিসংখ্যান বুনে দিয়েছেন, কখনো নিপুণ ভাবে, কখনো মোটা হাতে। যতদূর মনে পড়ে সমকালীন ঘটনাপুঞ্জকে সরাসরি ভাবে উপন্যাসের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করতে প্রথম দেখি ডস প্যাসসকে—হয়ত আগেও কেউ করেছেন—তবে তাৎক্ষণিকে ব্যঞ্জনার গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী রণন সঞ্চারের জন্য আরো শৈল্পিক অনুশীলন দরকার মনে হয়। ডস প্যাসস নিজে ফকনারের সম্পন্নতা অর্জন করেন নি, "চাঁদের অমাবস্যা"কে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনার জন্য তসলিমাকে আরো সাধনা করতে হবে।

লজ্জা উপন্যাসের মূল বিষয় হল কী ভাবে সাম্প্রদায়িকতার চাপে সংখ্যালঘুদের ভিতরে যাঁরা অসাম্প্রদায়িক এবং বিবেকবান তাঁদের পক্ষেও মানবিক আদর্শের প্রতি আনুগত্য টিঁকিয়ে রাখা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। সুধাময় অধ্যাপক এবং চিকিৎসক, পরোপকারী, সৎ এবং সাহসী, সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি থেকে মুক্ত, ধর্মীয় আচার আচরণ মানেন না, স্বদেশকে গভীর ভাবে ভালবাসেন, কিন্তু "১৯৪৭-এ সাম্প্রদায়িক

ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে এ দেশের শাসক শক্তির পক্ষ থেকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, এটি মুসলমানের আবাসভূমি", এবং যেহেতু তাঁর নাম সুধাময় দত্ত ধর্মান্তর ছাড়া তাঁর কোনো বর্তমান বা ভবিষ্যৎ নেই। এটা তিনি মানতে রাজি নন, আর তাই তাঁকে নির্যাতন সইতে হয়। ভারতে হিন্দুরা মসজিদ ভাঙলে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় বাংলাদেশের হিন্দুদের। সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত সুধাময়রা তা থেকে ছাড়া পান না, বরং যেহেতু তাঁরা জন্মভূমি ত্যাগ করতে গররাজি, তাই তাঁদের শাস্তি এবং যন্ত্রণা মর্মান্তিক।

আদর্শবাদী বাপের ছেলে সুরঞ্জন—এই কাহিনীর যে নায়ক—ছাত্রাবস্থায় যে সমাজতন্ত্রের কথা শিখেছে, কম্যুনিস্ট দলে যোগ দিয়ে আন্দোলন করেছে, যার অধিকাংশ বন্ধুবান্ধব মুসলমান—ছোট বড় নানা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সে ক্রমেই অনুভব করছে যে নিজে নাস্তিক হওয়া সত্ত্বেও অন্য-দেরও চোখে সে হিন্দু, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধলে তাকে এবং তার পরিবারকে বারবার ইঁদুরের মত কোনো না কোনো গর্তের আশ্রয়ে লুকিয়ে থাকতে হয়, তার বন্ধু কামালের মত "সে দাবি করতে পারে না আমি এই মাটির সন্তান", "বিশেষ করে নব্বই-এর পর তার মনে হয়েছে···এই দেশ যেন তার নয়, সে এখানে পরবাসী।" তবু নিজের দেশ ছেড়ে "কলকাতা যাবার কথা শুনলে সুরঞ্জনের মাথায় রক্ত উঠে যায়। কেন যাবে সে কলকাতায়?···সুরঞ্জনের কখনও মনে হয় না কলকাতা তার দেশ।" টিঁকে থাকবার প্রয়োজনে সুধাময় বারবার বাসা বদল করেছেন, কিন্তু এখন সুরঞ্জন "সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবার আর সে বাড়ি ছেড়ে কোথাও পালাবে না। মুসলমানরা যদি বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে, তাদের সবাইকে কেটে রেখে চলে যায় তবুও সুরঞ্জন নড়বে না"।

কেন, কী চাপে, কী যন্ত্রণায় শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত ছাড়তে হল গভীর সহানুভূতির সঙ্গে তারই বিবরণ দিয়েছেন এই সংক্ষিপ্ত উপন্যাসে সমকালীনতার বিবেকী কথক তসলিমা নাসরিন। সুরঞ্জনের সঙ্গে পারভিন নামে যে মেয়েটির ভালবাসা শিকড় ছড়িয়ে ছিল, হিন্দু ছেলেকে বিয়ে করবার ঝুট ঝামেলা এড়াতে সে একটি মুসলমান ছেলেকেই বিয়ে করে। পরে যে হিন্দু মেয়েটির সঙ্গে সংসার পাতবার স্বপ্ন সুরঞ্জন দেখে সেই রত্নাও দাঙ্গা কবলিত দেশে নিরাপত্তার ব্যবস্থা হিসেবে হুমায়ুনকে স্বামী হিসেবে বেছে নেয়। পদে পদেই ব্যর্থতা, বন্ধুরাও ক্রমশ সরে যায়। অবশেষে চরম অভিজ্ঞতা ঘটে যখন তার অনুপস্থিতিতে সুরঞ্জনের শান্ত, নির্বিরোধ, অসহায় বোন মায়াকে লুট করে নিয়ে যায় পাড়ার কিছু ছেলে ছোকরা মস্তান। মায়াকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। যেহেতু সুরঞ্জনের নাম সুরঞ্জন তার আর্ত আবেদনেও থানার লোক তাই গা করে না, তার বামপন্থী মুসলমান বন্ধু হায়দার দায়সারা গোছের খোঁজ করে অন্য নানা ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। "তার জন্য এখন পুলক, হায়দার, কামাল, লুৎফর, কাজল—কেউ সহায় নয়।" তার মা "কিরণময়ী ঘরের দেওয়ালে মাথা রেখে যখন কাঁদছে, সুরঞ্জনের সাহস হয় না এই কান্না থামাতে, সুধাময়েরও হয় না"। কিরণময়ী কলকাতায় যাবার কথা আগে বলেছেন, স্বামী পুত্র রাজি হয় নি, কিন্তু এখন? "কিরণময়ীর কান্না তখনও থামেনি। সুরঞ্জন চেঁচিয়ে বলে, বাবা কাল সারারাত একটি কথা ভেবেছি, তোমাকে বলবার সাহস পাচ্ছিনা, তুমি আমার কথা রাখবে না জানি। তবু তোমাকে অনুরোধ করছি তুমি আমার কথা রাখ। চল আমরা চলে যাই।

কোথায়? সুধাময় জিজ্ঞাসা করেন।

ইণ্ডিয়া।

ইণ্ডিয়া?"

বাপ ছেলেতে কিছুক্ষণ আলোচনা হয়। তারপর সুধাময় বলেন, "না। আমি যাব না। তোর ইচ্ছে হয়, তুই চলে যা।" "সুরঞ্জন আশাহীনতার অন্ধকারে একা একা সাঁতরায়।" শেষ রাতের দিকে সুরঞ্জন যখন স্বপ্ন দেখে যে "নদীর একটা ঢেউ তাকে নিয়ে যাচ্ছে গভীরে, সে পাকে পড়ছে, তলিয়ে যাচ্ছে···ফুঁসে ওঠা অচেনা জলে", তখন তার আতঙ্কে ঘেমে ওঠা শরীরে হাত রাখেন কিরণময়ীর কাঁধে ভর দিয়ে উঠে আসা সুধাময়।

"সুধাময় বলেন, সুরঞ্জন চল, আমরা চলেই যাই।

অবাক হয়ে সুরঞ্জন জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাব বাবা?

সুধাময় বলেন—ইণ্ডিয়া।

সুধাময়ের বলতে লজ্জা হয়, তাঁর কণ্ঠ কাঁপে, তবু তিনি চলে যাবার কথা বলেন; কারণ এতদিনে তাঁর ভেতরে গড়ে তোলা শক্ত পাহাড়টিও দিনে দিনে ধসে পড়েছে।"

এ লজ্জা কি সুধাময়ের, না আমাদের যারা বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা ঠেকাতে পারি নি, না দুই দেশের সেই নেতাদের যারা সময়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে বক্তৃতা করে এসেছেন কিন্তু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপরে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের হিংস্র আক্রমণ রোখবার জন্য কার্যকর কোনো

ব্যবস্থা করেন নি, যাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আওড়েছেন, কিন্তু নিজেদের মন থেকে সাম্প্রদায়িকতার শেকড় উপড়ে না ফেলতে পারার ফলে উগ্র প্রমত্ত সাম্প্রদায়িকতার আক্রমণের কাছে প্রায় বিনা প্রতিরোধে আত্মসমর্পণ করেছেন? আমি যেটুকু বুঝতে পারি, তসলিমা এই কাহিনীতে উদ্‌ঘাটিত করেছেন তাঁর স্বদেশের ট্রাজেডি, যা ভারতেরও ট্রাজেডি। বিবেকী ব্যক্তির পক্ষে আজ দুই দেশেই বাস করা কঠিন, বিশেষ করে যদি সে ব্যক্তি নিজের দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন বলে চিহ্নিত হন। পার্কসার্কাস বা ভাগলপুরের ট্রাজেডি তো সমানভাবেই মর্মান্তিক। কত রশীদ, ফাতেমা এই পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু মাফিয়ার আক্রমণে সর্বহারা হয়েছেন, অনিচ্ছায় দেশ ছেড়েছেন, অথবা নিহত হয়েছেন, তাঁদের কাহিনী মায়া-কিরণময়ী-সুধাময়-সুরঞ্জনের কাহিনীর চাইতেও কম মর্মন্তুদ নয়। এই রশীদ, ফাতেমাদের মধ্যে কেউ কেউ আমার চেনা। যে সমাজ তাঁদের স্বদেশ থেকে উৎপাটিত করেছে তাকে বদলাতে পারি নি বলে আমার কি কম যন্ত্রণা, কম লজ্জা!

আঠারো শতকে ফরাসী দেশে, উনিশ শতকে রাশিয়ায় র‍্যাডিক্যাল ভাবুকদের মধ্যে অনেকে তাঁদের সমাজের নানা নানা গূঢ় এবং বহুবিস্তৃত ব্যাধি-উদ্‌ঘাটন করবার জন্য ধারালো কাহিনী লিখতেন। তসলিমা নাসরিনকে আমার মনে হয় সেই পরম্পরার একজন র‍্যাডিক্যাল, বাংলা যাঁর মাতৃভাষা, বাংলাদেশের এবং ভারতের সমাজকে যিনি সুস্থতার দিকে চালিত করতে চান। এই লেখার ফলে স্বদেশে মৌলবাদীরা তাঁকে প্রবলভাবে দেশদ্রোহী ও ধর্মদ্রোহী আখ্যা দিয়ে আক্রমণ করবে। এদেশেও হয়ত তথাকথিত "হিন্দুত্বে"র প্রবক্তারা তাঁর বইটিকে নিজেদের হীন উদ্দেশ্যসাধনে লাগাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু দুই দেশেই যাঁরা যথার্থ সেকিউল্যারিস্ট এবং গণতন্ত্রী, যাঁরা অন্তরের গভীর থেকে চান যে দুই দেশেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষরা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গে সমান অধিকার এবং মর্যাদা ভোগ করুক, যাঁরা ধর্ম এবং সম্প্রদায়ের চাইতে বিবেক এবং মনুষ্যত্বকে অনেক বেশি মূল্য দেন, তসলিমার এই সংক্ষিপ্ত উপন্যাসটি তাঁদের যেমন দুঃসহ কষ্ট দেবে তেমনই প্রেরণা যোগাবে। কারণ সুধাময়-সুরঞ্জনের উৎপাটন যেমন নিষ্করুণ সত্য, বাংলাদেশের এই দায়বদ্ধ লেখিকার বিবেকিতা, অভীক সত্যাগ্রহ এবং সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত সমবেদনা তেমনই এই কাহিনীতে প্রত্যক্ষ। বাংলাদেশে কয়েকবার যাবার অভিজ্ঞতা থেকে জানি সে দেশে শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের মধ্যে অনেকেই গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতায় আস্থাশীল, যদিও হয়ত তসলিমার মত সাহস অথবা প্রকাশের শক্তি তাঁরা এখনো অর্জন করেন নি। প্রকাশের দুমাসের মধ্যে **লজ্জা**র চতুর্থ মুদ্রণ থেকে অনুমান হয় বাংলাদেশে তাঁর বিরোধীরাও যেমন প্রবল তেমনই তাঁর কথা শুনতে আগ্রহীরাও সংখ্যায় নগণ্য নয়। বাংলাদেশের পক্ষে, সেখানকার সংখ্যালঘুদের পক্ষে বাংলা এবং ভারতের সম্পর্কের পক্ষে এবং ভারতে সেকিউলারিস্টদের পক্ষে এটি আশার কথা, মুখ্যত বাংলা-ভাষার প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসার ফলে বাংলাদেশের শিক্ষিত তরুণতরুণীদের মধ্যে আমি সেকিউল্যার প্রতিষ্ঠাসের যেমন ব্যাপক এবং গভীর প্রভাব দেখেছি পশ্চিমবঙ্গে তার সঙ্গে তুলনীয় কিছুই নজরে আসে না। তসলিমা বাংলাদেশের বিবেকী এবং নির্ভীক তারুণ্যের আজ মুখ্য প্রতিনিধি। আমার কিশোর বয়সে যেমন বয়োজ্যেষ্ঠ অম্লদাশঙ্করকে তেমনই জীবনের সায়াহ্নে বয়ঃকনিষ্ঠ তসলিমা নাসরিনকে অবুর্ণচিত্তে স্বাগত জানাই।

লজ্জা—তসলিমা নাসরিন / প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ চতুর্থ মুদ্রণ মার্চ ১৯৯৩ পার্ল পাবলিকেশনস, ৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০ / ৪৫ টাকা (বাংলাদেশ মুদ্রায়)

তসলিমা নাসরিনের অন্যান্য বই যা আমি সংগ্রহ করে পড়েছি; সঙ্গে প্রথম প্রকাশের তারিখ:

নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে (কবিতা), ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯ পৃষ্ঠা ৫৬

আমার কিছু যায় আসে না (কবিতা), ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ পৃষ্ঠা ৫৬

অতলে অন্তরীণ (কবিতা), ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ পৃষ্ঠা ৫৬

যাবো না কেন? যাবো (প্রবন্ধ), ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ পৃষ্ঠা ৮৮

বালিকার গোল্লাছুট (কবিতা), ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ পৃষ্ঠা ৫৬

নির্বাচিত নারী (কবিতা), সেপ্টেম্বর ১৯৯২ পৃষ্ঠা ৭২

নিমন্ত্রণ (উপন্যাস), জানুয়ারি ১৯৯৩ পৃষ্ঠা ৬৪

বেহুলা একা ভাসিয়েছিল ভেলা (কবিতা), ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ পৃষ্ঠা ৬৮

প্রসঙ্গ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজিতকুমার দত্ত

'অপু এ গ্রন্থের নায়ক। কিন্তু অন্তরালে একজন অতি-নায়ক আছে। যুগযুগান্তব্যাপী জীবনপ্রবাহ সেই অতি-নায়ক'। শঙ্খ ঘোষের 'পথের পাঁচালী' দিয়ে পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সংকলন গ্রন্থ 'বিভূতিভূষণ: বিচার ও বিশ্লেষণ' শুরু। আর বলা বাহুল্য সংকলন গ্রন্থের লেখকবৃন্দ 'পথের পাঁচালী'র প্রসঙ্গ বারে বারে এনেছেন। যেমন চিত্তরঞ্জন ঘোষ 'পথের পাঁচালী': কাঠামো ও কারিগরি' পথের পাঁচালীর নির্মাণকলার কারিগরি চিরে চিরে দেখিয়েছেন। জ্যোতির্ময় ঘোষ অন্য সমালোচকবৃন্দের পথের পাঁচালী সম্বন্ধে মন্তব্যগুলি সংগ্রহ করে দিয়েছেন। সত্যজিৎ রায় অভিনেত্রী চুনীবালার অভিনয় দক্ষতার বিবরণ পথের পাঁচালী প্রসঙ্গেই এসেছে। দুলেদ্র ভৌমিক 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস আর সিনেমায় তার রূপান্তরে ছোটো খাটো পরিবর্তন দেখিয়ে সত্যজিৎ প্রতিভার চকিত উদ্‌ঘাটন করেছেন, গোপিকানাথ রায় চৌধুরী সময়ের টানাপোড়েন লক্ষ করেন 'পথের পাঁচালী'তে। 'পথের পাঁচালী'র সৃষ্টিকর্তার টুকিটাকি এই সংকলন গ্রন্থে আরও ছড়িয়ে আছে।

তারপরেই গুরুত্ব পেয়েছে 'আরণ্যক' উপন্যাসটি। তিন-জন আরণ্যকের কথা বলেছেন। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, জহর সেন মজুমদার আর কাননবিহারী গোস্বামী। উজ্জ্বল মজুমদার আরণ্যক উপন্যাসে অরণ্যজীবনের কথা বলতে গিয়ে কেবলই নষ্ট অরণ্যের প্রসঙ্গকে বিস্তৃত করেছেন। এবং তাঁর কাছে বিভূতিভূষণের চরিত্রগুলির টানাপোড়েনই গুরুত্ব পেয়েছে বেশি। কাননবাবু একেবারে অ্যাকাডেমিক পদ্ধতিতে আরণ্যকের কাহিনীবৃত্তকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন। আর জহরবাবু অরণ্যবাসী নিম্নবর্গের প্রতি বিভূতিবাবুর সহানুভূতিকে পরিস্ফুট করেছেন।

বিভূতিভূষণের ছোট গল্প নিয়ে লিখেছেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বাঁধা ছক থেকে মানুষ কি করে ছিটকে যায় অন্য আর একটি আবহে তার কথা বলেছেন। দেখিয়েছেন এর ফলে গল্পে গঠনগত বৈচিত্র্যও অনিবার্যভাবে দেখা দিতে থাকে। প্রত্যাশিত ছকটি বাঁধা পথে না গিয়ে নূতন পথে ধাবিত হয়। বিখ্যাত পুঁইমাচা গল্পটিতে তিনি লক্ষ করেন এ কেবল ক্ষেত্রির গল্প হয়ে উঠল না, জীবন প্রবাহের বাঁকে বাঁকে যত বুদ্‌বুদ ওঠে এ গল্পও সেই রকম একটি বুদ্‌বুদ। কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী ছোট গল্প বিচার করে খুঁজে পান বিভূতি-ভূষণের খাঁটি, সুন্দর, ধর্মপরায়ণ চিত্তটিকে। অর্ধেন্দু বিশ্বাস ছোটগল্পে প্রকৃতি প্রেমিক বিভূতিভূষণকে আবিষ্কার করেন। বিষয়টি বহু আলোচিত। অর্ধেন্দুবাবু মনোযোগী বলেই কিছু নূতনত্ব খুঁজে পেয়েছেন।

বিভূতিভূষণের রচনায় প্রকৃতিভাবুকতা বাংলাসাহিত্যের একটি বড় সঞ্চয়। অতএব প্রসঙ্গটি ঘুরে ফিরে এসেছে বিভূতি আলোচনায়। এই সূত্রেই বোধ করি বিভূতিভূষণের অধ্যাত্ম-চেতনার কথা, যা সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের দেবযান না মাধবী-যান রচনায় চকিত হয়েছে। তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও পিতার অতিপ্রাকৃত এবং অধ্যাত্মভাবনার প্রসঙ্গে সেই রকমই ইঙ্গিত করেন। এই সূত্রে মিস্টিসিজমের কথাও এসে পড়েছে কারও কারও রচনায়। সেটাই স্বাভাবিক। ঈশ্বরানুভূতি এবং অধ্যাত্মভাবনা যেমন পত্নী রমাদেবীর লেখায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আর তা বিশ্লেষিত হয় পম্পা মজুমদারের ইছামতী আলোচনায়। আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে বিভূতিভূষণের জীবনবৃত্তান্ত উঠে এসেছে। প্রায় প্রত্যেকেই উল্লেখ করেছেন বিভূতিভূষণের চরিত্রের সরলতা, নম্রতা, সাধাসিধে জীবন-যাপনের কথা। প্রকৃতি পড়ুয়া বিভূতিভূষণের কথা 'ত ঘন ঘন উচ্চারিত হয়েছে। এ সবকে ছাপিয়ে বিভূতিচরিত্রের অল্পে সন্তুষ্টি এবং আত্মতৃপ্তির কথা বড় করে দেখা হয়েছে নানা লেখায়। বৃহতের মুখোমুখি হয়ে বিভূতিভূষণ যেমন বিস্মিত হয়েছেন তেমনি তাঁর কাছে তিনি হয়েছেন নতজানু। এই বৃহৎকে তিনি পেয়েছেন কলমীর লতায়, ঘেঁটুফুলের সৌন্দর্যে আর ফড়িং-এর নাচে।

পার্থ বসু স্বল্প আলোকিত একটি বিষয় অবলম্বন করে-ছেন—বিভূতিভূষণের কিশোর সাহিত্য। কোন কোন আলোচকের লেখায় বিভূতিভূষণের শিশুচিত্তের প্রসঙ্গ এসেছে নিশ্চয়ই কিন্তু তাঁর সৃষ্ট শিশুচরিত্র নিয়ে আলোচনা আগে খুব বেশি দেখিনি। পার্থ বসুও কতকগুলি ইঙ্গিতময় মন্তব্য করেছেন। বিভূতিভূষণের কিশোর মনকে তিনি স্পর্শ করে-ছেন কয়েকটি রচনার সংক্ষিপ্ত উদ্ভাসনে। চণ্ডীদাস বন্দ্যো-পাধ্যায় বিভূতিভূষণের অন্যান্য ভাষায় অনুবাদের তথ্য উপ-স্থাপিত করেছেন। বিভূতিভূষণের সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে কিন্তু গ্রন্থপঞ্জি নেই। জরুরি ছিল গ্রন্থপঞ্জি।

বিভূতিভূষণের আদর্শ হিন্দু হোটেল আমাদের পড়তে

ভাল লাগে, সিনেমায় দেখতেও ভাল লাগার কথা, কিন্তু বইটিতে অধিকাংশ চরিত্র এবং দৃশ্য সোজা আর সরল বলে বিদ্বজ্জনের তেমন মন ভোলায়নি। সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায় বিদ্বজ্জনের কাছেই এই রচনাটির শিল্পগুণের পরিচয় দিয়েছেন। তেমনি অশনি সংকেত যে বিভূতিভূষণের প্রক্ষিপ্ত রচনা নয়, লেখকের স্বতঃস্ফূর্ত বেদনাবোধ থেকে সঞ্জাত সেকথা সবিস্তারে বলেছেন পার্থজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংকলন গ্রন্থটির বিভিন্ন রচনার উল্লেখে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এই বই বিভূতিভূষণের মনন আর উপলব্ধির একটি সামগ্রিক রূপ ফুটে উঠেছে। সম্পাদকের লক্ষ্য ছিল তাই। বিভূতিভূষণের জীবনকথা থাকলে বোধ হয় সম্পাদকের অভিপ্রায় স্ফুটতর হত।

এ সংকলনে বিভূতিভূষণের ভাষা নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন নির্মল দাশ। প্রবন্ধটি আমাদের কৌতূহলী করে। কাজটি দুরূহ। নির্মল দাশ কোন তাত্ত্বিক আলোচনার ভড়ং না করে উদাহরণ দিয়ে বিভূতিভূষণের ভাষাবিচার করেছেন। কাব্য-ভাষা আর গদ্যভাষা ব্যবহারে লেখকের সৃজনীশক্তির প্রবণতা ধরা পড়ে। বিভূতিভূষণের লেখা যখন থেকে প্রকাশিত হয় তখন থেকেই দেখা যায় সাধুভাষা ও চলিতভাষা দুই ভাষাতেই তিনি চর্চা করছেন। প্রায় একই সময়ে লেখা দুটি গল্প একটি একটি সাধু অপরটি চলিত রীতিতে লেখা। নির্মল দাশ বলেছেন এর কারণ হল বিভূতিভূষণের কাছে সাধু ও চলিত রূপের শিল্পগত পার্থক্য খুব বড় ছিল না। সৃজনপ্রবীরা নাগরিক, তাঁরা চলিত ভাষার শরীরে শিল্প-জিজ্ঞাসার চিহ্ন এঁকে দিয়েছেন। বিভূতিভূষণ চলিতভাষার শিল্পরূপের সন্ধান পাননি। গ্রামীণ জীবনধারার প্রতি অকৃত্রিম মমত্ববোধ বিভূতিভূষণের সাধু ও চলিত ভাষার প্রয়োগে একই নির্দেশনা কাজ করেছে। তাঁর কাছে এই দুই ভাষার পার্থক্য ব্যাকরণগত। নির্মল দাশের ভাষাবিচার করার পদ্ধতিতে আছে সমাজজিজ্ঞাসা। চমৎকারভাবে তিনি দেখিয়ে দেন বিভূতিভূষণের গ্রামের প্রতি টানই তার ভাষাকে নিরূপিত করেছে। বিভূতিভূষণের ভাষাচর্চা করেই আমরা বুঝতে পারি তাঁর কোন কোন উপন্যাসে আঞ্চলিক ভাষার সংলাপ থাকলেও তিনি আঞ্চলিক উপন্যাস লেখেননি। নির্মল দাশ বলেন 'ভৌগোলিকতার উর্দ্ধেই তাঁর সমস্ত রচনার আবেদন'। নির্মল দাশ লিখেছেন বিভূতিভূষণের প্রায় সব রচনাতেই পাঁচালী ধর্মিতা রক্ষিত। একটু বিস্তারী। কিছুটা ঢিলে-ঢালা। বলা বাহুল্য নির্মল দাশের রচনাটি সংক্ষিপ্ত।

আমাদের প্রত্যাশা পূরণ তিনি করেন না। কেবল বিভূতি-ভূষণের ভাষাবিচারের গুরুত্ব সম্বন্ধে তিনি সচেতন করে দেন —এইটুকু বলা যায়।

সুমিতা চক্রবর্তীর প্রবন্ধ একদিক থেকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তিনি একটি বড়ো ধাক্কা দেন যখন বলেন অপু চরিত্রের মধ্যে বিভূতিবাবু যে আদর্শের কথা বলেছেন তা চরিত্রটিকে ভারাক্রান্ত করেছে মাত্র, চরিত্রটির স্বাভাবিক গতি ও ছন্দকে নষ্টও করেছে অনেকটা। শঙ্খ ঘোষ ১৯৫৭ সালেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বিভূতিভূষণের তুলনা করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের গ্রাম-পরিক্রমা আর বিভূতিভূষণের গ্রামভ্রমণের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যটিও শঙ্খ ঘোষের লেখায় স্পষ্ট হয়ে উঠে। শরৎচন্দ্র দারিদ্র্যকে তার নগ্ন রূপেই দেখেন, আর বিভূতিভূষণ বিছিয়ে দেন একটি সকরুণ বীণার সুর। 'জীবন কোনোক্রমেই দরিদ্র নয়' এ মূল বিশ্বাস বিভূতিভূষণকে 'দুরান্ত নিখিলে সরিয়ে নিয়ে যায়।' পথের পাঁচালীর শরীর নিয়ে চিত্ত রঞ্জন ঘোষের বিশ্লেষণটি মূল্যবান। পাঁচালীর গঠন সৌষমোর সঙ্গে পথের পাঁচালীর বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ মিল সন্ধানে চিত্তরঞ্জন সার্থক।

সম্প্রতি রুশতী সেন বিভূতিভূষণের রচনা সম্পর্কে ডিটেল আলোচনা করছেন। তথ্যসংগ্রহে তিনি যেমন অত্যন্ত মনোযোগী তেমনি তথ্যগুলির সাহায্যে উপন্যাস আলোচনায় তিনি নিঃসন্দেহে নূতন পথ খুলে দিয়েছেন। বিভূতিভূষণের মানসপ্রবণতার টানটোনগুলি তিনি যেভাবে ধরেছেন তা আমাদের বিস্মিত করে। সংকলনে যাঁরা লেখা দিয়েছেন, সকলকেই রুশতী সেনের প্রবন্ধগুলির দিকে লক্ষ রাখতে বলছি। প্রবন্ধকারদের মধ্যে কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের কথা বলেছেন। আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিভূতি-ভূষণের যোগসূত্রটি উল্লেখ করার সময় এসেছে। 'ছিন্নপত্রে' বাংলার গ্রাম এবং গ্রামজীবন উদ্ভাসিত। রবীন্দ্রনাথের দেখায় ছিল বিস্ময়। প্রত্যহই যেন তিনি গ্রামকে নূতন করে আবিষ্কার করেছেন। আর বৃহতের সঙ্গে ধরিত্রীর যোগ উপলব্ধি করে তিনি পরমতা-কে পেয়েছেন। বিভূতি-ভূষণ এই গ্রামকেই উপন্যাসে এনেছেন। এক এক সময় মনে হয় ছিন্নপত্রের দেখাই বিভূতিভূষণে উঠে এসেছে। রবীন্দ্র-নাথের সেই despair আর resignation কেবল ছিন্নপত্রই নয়, বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী কি আমাদের রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় না? বালক রবীন্দ্রনাথের আভাস পথের পাঁচালীর অপুকে চিনিয়ে দেয় না? এমন

কি অপুর বিস্ময়, প্রকৃতির দূরবিস্তারী রূপমোহ, সরল বিশ্বাস, সামান্যের মধ্যে অসামান্যকে দেখার সামর্থ্য জীবনস্মৃতির ঐ বালকটির মধ্যে আমরা কি আগেই দেখিনি?

এখানেই প্রবন্ধকারদের কাছ থেকে আমাদের প্রত্যাশা ছিল রোমান্টিক বিভূতিভূষণের চিত্রচরিত্র জানবার। রোমান্টিসিজমের ধরতাই বুলির কথা বলছি না। রোমান্টিক প্রবণতারও একটা ভিত সমাজজিজ্ঞাসার মধ্যেই নিহিত। এরকম প্রশ্ন ত উঠেছে যখন বিভূতিভূষণ পথের পাঁচালী লেখেন তখন রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতাও প্রকাশিত হচ্ছে। কল্লোল কালিকলমের প্রতিক্রিয়া কি দুজনের মধ্যে দুরকম প্রেরণা দিল? রোমান্সের পরমহংস অপুও। একজন গ্রাম্য বালক অপরজন ঘোপদুরস্ত নাগরিক। একজনের ভাষায় ফুটে উঠেছে বুদ্ধির শাণিত চাকচিক্য, আর এক জনের ভাবনায় কেবলই বিস্ময়ের পর বিস্ময় সঞ্চিত হচ্ছে। দুটি বইয়ের ভাষাবিচারেও কি সেই সময়ের বাঙালি মধ্যবিত্তের কিছু গুলুকসন্ধান পাওয়া পাওয়া যাবে? আর জীবনানন্দের প্রসঙ্গও ঢুকে পড়েছে অন্তত একটি প্রবন্ধে। বেশ কিছুকাল আগে শিবচন্দ্র লাহিড়ী জীবনানন্দের চিত্রকল্পের সঙ্গে বিভূতি-ভূষণের চিত্রকল্প নিয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেছিলেন। পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সংকলনের প্রবন্ধ সূত্রে সেই প্রবন্ধটির কথা মনে পড়ল। আমার মনে হয়েছে শঙ্খ ঘোষ থেকে গোপিকানাথ রায়চৌধুরী যে বিশ্লেষণ করেছেন তা একদিক থেকে রোমান্টিক প্রবণতাকেই স্পর্শ করতে চেয়েছেন তাঁরা। মধ্যবিত্ত বাঙালির রচনায় গ্রাম নগরের সংঘাত ক্রমশই তীব্র হয়ে উঠছিল। একদিকে স্মৃতি অন্যদিকে জীবনযাপনের রূঢ় বাস্তবতা কিছু লেখককে আলোড়িত করেছিল। এর টানা-পোড়েনে কখনও আবর্ত, কখনও স্মৃতির ছায়া সুনিবিড়তার মধ্যে জীবনযাপনের অর্থ খুঁজেছে বাঙালি। ছিন্নপত্রের অভিজ্ঞতাই বিভূতিভূষণকে আর একভাবে বিক্ষুব্ধ করেছিল। ছিন্নপত্রে বিক্ষোভ নেই, কিন্তু অপরাজিত-তে ক্ষোভ আছে। সেজন্যে যে কেবল পালিয়ে বেড়ায় চরিত্র বিভূতিভূষণে উঠে আসে। আর উজ্জ্বল মজুমদার আরণ্যকের আলোচনায় যে কথা বলেছেন 'নষ্ট-অরণ্যের স্মৃতি বুকে নিয়ে অরণ্যপ্রেমিক সত্যচরণের দীর্ঘশ্বাস।"—তাও ভেবে দেখবার মতো! এই দীর্ঘশ্বাসে রোমান্টিক বেদনারই প্রকাশ।

বিভূতিভূষণ: বিচার ও বিশ্লেষণ—পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত / পাণ্ডুলিপি, ১৬ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ ৭৫ টাকা

বাংলা নাটক: চল্লিশের পঞ্চাশের প্রতিষ্ঠা আন্দোলন,

সৌমেন সেন

একটি বই-এর আলোচনায় অন্য একটি বই-এর প্রসঙ্গ প্রথমেই উল্লেখ করা সঙ্গত কিনা জানি না। আসলে বই দু'টি প্রায় একযোগে পড়ার সুযোগ ঘটায় একটি সংবাদ মনে পড়ে যায়। আমার আলোচ্য বইটি ১৯৬০-এর মধ্যবর্তী সময়ের বাংলা নাটকের আলোচনা এবং বইটির রচয়িত্রী ডঃ মানসী জামানের বিশেষ মনোযোগ চল্লিশ দশকের বাংলা নাট্যসাহিত্য ও নাট্য আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যের প্রতি। আর, সঙ্গত কারণেই বাংলা নাটক সম্পর্কে এই গবেষণায় তাঁর অন্যতম লক্ষ্য তৎকালীন আর্থ-সামাজিক দৃশ্যপট। অন্য বইটি অমিতাভ গুপ্ত রচিত 'উত্তর আধুনিক চেতনার ভূমিকা' যদিও সম্পূর্ণ এক ভিন্ন বিষয়ের, তবু সে-বই থেকে কয়েকটি সংবাদ আমরা পাই যা আমাদের অন্য-মনস্কতায় সর্বদা মনে পড়ে না। একটি সংবাদ এই যে বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিকতার আলোচনায় চল্লিশ দশকের ভাগ্যে জুটেছে এক বিড়ম্বনা। অমিতাভ গুপ্তর আলোচ্য অবশ্য বাংলা কবিতা ও উত্তর আধুনিক চেতনা, কিন্তু তাঁর অন্যতম প্রতিপাদ্য হল যে পঞ্চাশ ও তৎপরবর্তী দশকের 'অবক্ষয়ী আধুনিকতা'র দাপটে চল্লিশ দশকের কবিকুলের কাব্যচৈতন্য যথার্থ মর্যাদা পেল না। সাধারণ ভাবেই বাংলা শিল্পে সাহিত্যের ধারাবাহিকতায় চল্লিশ দশক একটি প্রক্ষিপ্ত বিড়ম্বনা কারণ ঐ সময় কবিতা-গল্প-নাটক-গান ইত্যাদি সবই ছিল 'প্রচার সর্বস্ব'। এই ধারণা যে খুব সামান্য ছিল না তার প্রমাণ শুধু 'কম্যুনিস্ট' লেখক-শিল্পীরাই নন, অনেক অ-কম্যুনিস্ট' লেখকরাও তাঁদের যোগ্য মর্যাদা পেলেন না, আজ অবধি পাননি। (তালিকাটি দীর্ঘই হবে আর 'চতুরঙ্গে'র অনেক লেখকও এই তালিকায় থাকবেন।) এই প্রবণতার প্রতিবাদে অমিতাভ যে লক্ষণটিকে চল্লিক দশকের স্বতন্ত্র মর্যাদার লক্ষণ বলে মানেন তা হল সেই দশকের লেখক-শিল্পী-নাট্যকারদের গণ-আন্দোলনের মূল উৎসের কাছাকাছি যাওয়া। আর এই লক্ষণের জন্যই সম্ভবত পরবর্তী সময়ে তাঁদের অপাংক্তেয় করে রাখা হল।

সাহিত্যের একটি শাখা নাটকের আলোচনায় মানসী

জামান-ও আমাদের জানান যে 'পূর্ব যুগের নাট্যকারদের শিল্পদৃষ্টির সঙ্গে এই দুই দশকের নাট্যকারদের একটি গুণগত ব্যবধান রয়েছে। সে দূরত্বের কারণ বাংলা নাটক ও জনজীবনের মধ্যে আত্মিক যোগের অস্পষ্টতা।...এই আত্মবিস্মরণ থেকে নাটকের মুক্তি ঘটল যুগের (চল্লিশের দশকের) টানা পোড়েনে মথিত শিল্পীদের সৃজনশীলতায়।'

মানসী জামান তাঁর আলোচনার পরিধি রেখেছেন দুই দশকে—১৯৪০ থেকে ১৯৬০—অর্থাৎ চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশক। সাহিত্যের অন্য শাখায়, বিশেষত কবিতায়, খুবই উচ্চকিত ঘোষণায়, চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ দশক পরিকল্পিত চেহারায় সরে এল। নাটকের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাচ্ছে চল্লিশের অভিজ্ঞতা থেকে পঞ্চাশ যাত্রা শুরু করে। এবং নাট্যকর্মী ও নাট্যকাররা কখনোই চল্লিশের ঋণ অস্বীকার করেন নি। তার কারণ কি এই যে নাটকই বাংলা সাহিত্যের সেই শাখা যা কখনোই সমসাময়িক জাতীয়-আন্তর্জাতিক ঘটনা পরম্পরা ও সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি এবং নাট্যকার ও নাট্যকর্মীরা সেই দায়বদ্ধতা স্বীকার করেছেন? আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িত্রীও তাঁর অনুসন্ধান শুরু করেন এই সংবাদ সূত্রেই: 'যুগের এই বলয়ের মধ্যে আন্দোলিত হওয়ায় শিল্পীদের সমাজ-ভাবনা, চিন্তাদর্শ ও মনীষা সম্পূর্ণ নতুন আধার থেকে আহরণ করেছে শিল্পের রসদ।' বস্তুত চল্লিশ দশকের লেখক শিল্পীরা প্রায় সবাই এভাবেই আন্দোলিত হয়েছেন। হৃদয় সমাজ-ও-সময়-সত্যের মুখোমুখি হয়েছেন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কিন্তু কখনোই কেন্দ্রচ্যুত হন নি। সেই কারণেই, অর্থাৎ কোনও এক দায়বদ্ধতার জন্য, কখনও তাঁরা 'প্রচার সর্বস্ব', কখনও অতিমাত্রায় 'গম্ভীর'। মনে পড়ে ঐ সময়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার প্রতি 'প্রচার সর্বস্বতা'র অভিযোগ এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'মাত্রাতিরিক্ত গাম্ভীর্যের' জন্য পাঠক-আনুকূল্যের অপ্রতুলতা। এ ত মাত্র দুটি উদাহরণ, তালিকা আরও বড়। ফলে বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় চল্লিশ দশকের প্রতি মর্মান্তিক অবহেলা।

নাটকের ক্ষেত্রটি কিন্তু লক্ষণীয়ভাবে ব্যতিক্রম। মানসী জামান সেই সংবাদটিই আমাদের জানান। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন থেকেও সমকালীন ও পরবর্তী নাট্যকর্মী ও নাট্যকাররা একবাক্যে 'নবান্ন'কে একটি দিকবদলের ঘটনা বলে স্মরণ করেন। সেই সময়ই ঐ নাটকের রচনা ও প্রযোজনার সাফল্য-অসাফল্য সম্পর্কে যে তর্ক শুরু হয়েছিল, 'পরিচয়' পত্রিকায় হিরণকুমার সান্যাল যে স্পষ্টই লিখেছিলেন যে 'নাটক হিসেবে নবান্নকে মোটেই সক্ষম রচনা বলা চলে না,' তা আজ আমাদের জানা। আমরা এ খবরও জানি যে পরবর্তী কালের নাট্যকাররা বাস্তবতার ঐ ফ্রেমটি একমাত্র বলে মেনে নেননি। তবু, এ কথা ত সত্য যে তাঁরা 'নবান্ন'র আদর্শও অস্বীকার করেন নি। উল্লেখ করা যাক অতিসম্প্রতি প্রকাশিত একটি রচনায় ('নাট্যকারের সন্ধানে', যোগসূত্র, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৯২) একালের অন্যতম প্রধান এক নাট্য-ব্যক্তিত্ব অশোক মুখোপাধ্যায়ের উক্তি: 'নবান্ন নাটক হিসাবে আজ আর খুব শক্তিশালী ঠেকে না হয়ত' (কিন্তু) 'বিজন ভট্টাচার্য ঐতিহাসিক অর্থে আধুনিক বাংলা থিয়েটারের অন্যতম স্রষ্টা।...চারের দশকের গোড়ায় যে নবনাট্য জন্ম নিয়েছিল, আজ নয়ের দশকের প্রারম্ভে পৌঁছে থিয়েটার যে বাঙালির গর্ব' (তার কারণ) 'নবনাট্যের প্রথম স্বাতন্ত্র এর সামাজিক অবস্থানে।'

চল্লিশের দশকে যে নাট্য আন্দোলন গণনাট্য সঙ্ঘের নেতৃত্বে শুরু হয় সেই ধারাবাহিকতায় আজ অবধি বাংলা নাটক ও মঞ্চ এই 'সামাজিক অবস্থানে'র কারণেই তার প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতে পেরেছে। গল্প-কবিতার নানা আন্দোলনে যখন চল্লিশ দশকের প্রতি অবহেলা ও অস্বীকার ঘটেছে, নাটক ও মঞ্চ কিন্তু তখন, অস্বীকার ত নয়ই বরং চল্লিশের ধারা বজায় রেখেই নানা নতুন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এগিয়েছে।

বাংলা থিয়েটারের শুরুটাই নাগররুচির দায় মেটাতে। বাংলা থিয়েটার, বলা ভাল কলকাতার থিয়েটার, দুর্ভাগ্যত কোনও মৌলিক চেতনার তাগিদে বা সামাজিক দায়ে জন্ম নেয়নি। ব্যাপারটা ধার করা। নগর কলকাতার নাগররুচির দাবি মেটাতে এই থিয়েটারের জন্ম ও বিস্তার। আকস্মিক দু'চারটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে দীর্ঘদিন বাংলা থিয়েটার নাট্যশিল্পের মৌল আদর্শকে অস্বীকারই করেছে। রবীন্দ্রনাথ যে বাংলা থিয়েটারের চৌহদ্দির বাইরে ছিলেন তা তাই খুব আশ্চর্য কিছু নয়।

তবু, এর মধ্যেই, মাঝে মাঝেই স্ফুলিঙ্গ জলে উঠেছে। যদি না জলত তাহলে বাংলা থিয়েটার নিয়ে গর্ব করার সামান্যতম কারণও ঘটত না। 'কুলীন কুলসর্বস্ব'-র সময় থেকেই এমন স্ফুলিঙ্গায়ন বারবার ঘটেছে। দীনবন্ধুর নাটক এমনি আর এক উদাহরণ। কিন্তু তার পরে

স্বাদেশিকতার জোয়ার না আসা পর্যন্ত মঞ্চ সফল নাট্যকাররা যতটা সাফল্যের লক্ষ্যে হেঁটেছেন, ততটা নাট্য শিল্পবোধের উত্তরণ ঘটানি। এই প্রসঙ্গে মানসী জামানের বিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়। তাঁর বই-এর প্রথম অধ্যায়ে তিনি জন্মলগ্ন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা নাটকের আলোচনায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অমৃতলাল বসু সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তাতে আমরা জানতে পারি যে 'সমাজ বিশ্লেষণের অপরিপক্কতা'ই তখনকার পেশাদারী মঞ্চের নাট্যকারদের ব্যর্থতার কারণ। ক্ষীরোদপ্রসাদ, গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল—তাঁদের ঐতিহাসিক নাটক দর্শকদের উদ্বুদ্ধ করত বৈকি। অবশ্য মানসী জামান এটাও লক্ষ করেছেন যে ঐ ঐতিহাসিক নাট্যধারায় একটি গুরুতর সীমাবদ্ধতা ছিল: 'ঘটনাচক্রে হিন্দু জাতীয়তা হয়েছে প্রচারিত। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল দেশবাসীর রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় ঐক্যমন্ত্রের প্রচার নেই, এখানেই এর সীমাবদ্ধতা।' তাছাড়া, 'উদ্দেশ্যের খাতিরে অনেক সময়ই নাট্যকারদের ইতিহাসের অনৃতভাষণ করতে হয়েছে। তাই যুগের প্রয়োজন শেষে এই নাটকগুলির আবেদনও হ্রাস পেয়েছে।'

গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়েই আমরা লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গির একটা মোটামুটি আন্দাজ পেয়ে যাই। সেটা আরও স্পষ্ট হয় অধ্যায়টির উপসংহারে: 'বাংলা নাটকে রামনারায়ণ থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল পর্যন্ত যে ধারা বহমান সেখানে নাট্যকাররা প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী। নবজাগরণের অরুণালোক প্রায় সকলের মধ্যে কমবেশি প্রতিফলিত। সামাজিক নাটকের ধারায় শ্রেণী সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রগতিশীল সমাজভাবনার পরিচয় রেখেছেন মধুসূদন-দীনবন্ধু। আর যুগের ঘূর্ণিতে আলোড়িত হয়েও মধ্যযুগীয় ঐতিহ্য নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় গিরিশচন্দ্র অমৃতলালের রচনায়। ঐতিহাসিক নাট্যকাররা জাতীয় আকাঙ্ক্ষা ও জাতির চিত্তবেদনাকে প্রকাশিত করেছেন। উদার মনুষ্যত্ববোধের প্রেরণায় সকলেই সমাজ ও জাতির সমস্যা নিয়ে ভাবিত হয়েছেন মাত্র। কোন্ অর্থে সামাজিক পরিকাঠামোতে সামাজিক মন সমস্যার দাসত্ব করত, কেনই বা এর অবসানে এঁরা নির্লিপ্ত, সেই দূরাচারী অনুসন্ধিৎসা প্রায় কারুর মধ্যে নেই। বুর্জোয়া আদর্শবাদের তাগিদে কিছুদূর এগিয়ে তাঁরা থমকে দাঁড়াতেন। 'নীলদর্পণ' সেই স্রোতের ব্যতিক্রম হয়েও নাট্যকার শ্রেণীস্বার্থের শিকল কেটে মুক্ত চিন্তা নিয়ে ভাসতে পারলেন না, বিদ্রোহের ডাকের পরিবর্তে সুবিচার প্রার্থনা ও ধ্বংসের মধ্যে কাহিনী সমাপ্ত হল। রবীন্দ্রনাথের সমাজ-অন্বেষা সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের। কখনই তাঁর সমাজ-মনন রাষ্ট্রনৈতিক অভিঘাত বা তাৎক্ষণিক সমস্যার বহিরঙ্গ রূপকে সমস্যার মূল ভাবতে পারে নি। অনুসন্ধান করেছেন তার পশ্চাদপট। সমাজ সমস্যার মৌলিক গলদ তাঁর চোখে সামগ্রিক দৃষ্টির আধারে ধরা পড়েছে। ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়ে জাতিকে দিয়েছেন পথের নিশানা। তাঁর সমাজবোধ স্বদেশ ও বিশ্বরাজনীতির গতিছন্দ দ্বারা ধীরে ধীরে প্রবর্ধিত। নাটকের মধ্যেও সেই ধারাবাহিকতা বর্তমান।'

মনে হয় যে অভাবটা লেখিকা বাংলা নাটকের প্রথম পর্বে লক্ষ করেছেন তা অনেকটাই মিটল চল্লিশের দশকে, পরিণতি পেল পরবর্তীকালে। তাঁর সিদ্ধান্ত এইরকমই। গ্রন্থের উপসংহারে তিনি তাই জানান যে তাঁর আলোচ্য সময়ের (১৯৪০-৬০) নাট্যকাররা অত্যন্ত সচেতনভাবেই তাঁদের নাটকে সমাজ-অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতটি ব্যবহার করেছেন। গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়, যে অধ্যায়ে উনিশশ চল্লিশ থেকে ষাটের দশকের আর্থ-রাষ্ট্র-ও-সমাজ জীবন আলোচিত, শুরুই হয় এমন একটি বাক্যে: 'চল্লিশের দশকের বাংলা নাটক যুগধর্মে নবকলেবর পুষ্ট।' যেহেতু তাঁর বিবেচনায় সূচনা থেকে চল্লিশের দশকের পূর্ববর্তী সময়সীমার নাট্যকারদের রচনায় 'সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েনি সময়ের সংকটের প্রকৃত হেতু', তাই বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে চল্লিশ দশক এমন গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীকালের নাট্যকার ও নাট্যকর্মীরাও প্রায় একবাক্যেই এই সত্য স্বীকার করেছেন।

বই-এর অধ্যায়ভাগ দেখলেই লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়। ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়া এই বই-এ ছ'টি অধ্যায় আছে, তাদের শিরোনাম এই রকম—সমাজ অর্থনীতির প্রচ্ছায়ায় বাংলা নাটক: জন্মলগ্ন থেকে রবীন্দ্রনাথ; প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারত ও বাংলা নাটক; উনিশশ চল্লিশ থেকে ষাটের দশকের আর্থ-রাষ্ট্র-ও-সমাজজীবন; নবজীবনবোধ ও বিশ্বণাট্য; গণনাট্য আন্দোলন ও বাংলা নাটক এবং সমাজের বিচিত্র রূপ ও বাংলা নাটক।

এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই প্রথম অধ্যায়ে তাঁর সিদ্ধান্ত যে জন্মলগ্ন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত নাট্যকাররা বেশির ভাগই বুর্জোয়া আদর্শবাদের তাগিদে কিছুদূর এগিয়েও থমকে দাঁড়িয়েছেন, কোনও দূরাচারী অনুসন্ধিৎসা তাঁদের ছিল না। ব্যতিক্রম অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে নাট্যকাররা রোম্যান্টিক মৈত্রী চেতনায় উদ্দীপিত হলেন, জাতীয়তাবোধ

প্রকাশে সিক্ত হল বাংলা নাটক কিন্তু তখনও বাংলা নাটক শৈশবাস্থায় হামাগুড়ি দিচ্ছে। যুগগত মানসিকতায় পরিবর্ধিত হয়েও তা প্রকাশে নাট্যকাররা দ্বিধাগ্রস্ত কারণ বিশ্বজ্ঞান ও মনীষা সম্পর্কে তাঁদের অনভিজ্ঞতা ও অনগ্রসরতা। ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি অতিরিক্ত কারণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে বাংলা রঙ্গমঞ্চগুলি প্রায় জীবন্মৃত। ব্যবসায়িক সমৃদ্ধি ও শ্রেণীস্বার্থ তোষণের মূর্খতায় যুগভাবনার প্রবেশ সেখানে নিষিদ্ধ। রোম্যান্টিক জাতীয়তা, ফিউডালী জীবন ও চটুল প্রেমের ক্লান্তিকর রূপচ্ছবির সেখানে আধিপত্য। দর্শক ভোলাবার কৃত্রিম প্রচেষ্টা ও জাতীয় জীবন অনুচিন্তনের ব্যর্থতা। চল্লিশের দশকে এর পরিবর্তন ঘটল। নেতৃত্বে গণনাট্য সঙ্ঘ। বাজার চলতি ক্ষয়িষ্ণু থিয়েটারের মোহাবিষ্টতা থেকে জনগণকে মুক্ত করা ও কঠোর জীবনসত্যের দিকে তাদের চেতনাকে টেনে নিয়ে যাওয়াই ছিল পিপলস্ থিয়েটারের মূলকথা। সে থিয়েটার জনগণের দ্বান্দ্বিক ঐতিহাসিক বিবর্তন দ্বারা চিহ্নিত। গণনাট্য সঙ্ঘের নাট্যকর্মীদের শিল্পসাধনায় তাই আটের সৌন্দর্যসাধন অপেক্ষা জাতীয় মহারণ ও শ্রেণীহীন সমাজভাবনার তীক্ষ্ণ অনুভূতিই ছিল সক্রিয়। লেখিকার বিচারে শুধু নাটকে নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে কল্লোল-কালি-কলম যুগের লেখকদের রচনায় যে অস্পষ্টতা ও গণজীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতার দীনতা ছিল এ যুগে তা রইল না। গণনাট্য আন্দোলনের প্রেরণা ছিল নবজীবন বোধ ও বিশ্বনাট্যবীক্ষা। ইবসেন থেকে শ্রেথট পর্যন্ত যে নাট্যচর্চা তার অনেকটাই আত্মস্থ করল বাংলা নাটক ও মঞ্চ। পূর্ববর্তীকালের বাংলা নাটক—দীনবন্ধু, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ থেকে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও মন্মথ রায় প্রমুখের রচনা—যে ধারা তৈরি করেছিল তার সার্থকতা-ব্যর্থতা-সীমাবদ্ধতার অভিজ্ঞতাও কাজে লাগান। দৃশ্যশিল্পের কর্তব্যের বিস্মরণে বাংলা রঙ্গমঞ্চে যে মুমূর্ষতা ঘটেছিল তা থেকে মুক্তি পেল গণনাট্যের নাটক ও মঞ্চ। বিজন ভট্টাচার্য, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী থেকে শুরু করে উৎপল দত্ত পর্যন্ত নাট্যকাররা এই নবার্জিত মূল্যবোধেই বাংলা নাটকে বিপ্লব ঘটালেন। চল্লিশের গোড়ায় যে নতুন থিয়েটার হাজির হয়েছিল বিদ্রোহের মত তাই ক্রমশ পরিণতি পেল সামাজিক দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়ে, বুদ্ধির ভূমিকাকে মেনে নিয়ে, থিয়েটারকে একটা সীরিয়াস আর্ট করে তোলার দায়বদ্ধতায়।

অভিযোগ নয়, একটি অভাববোধ কিন্তু থেকে যায়। লেখিকার আলোচ্য পর্বের (১৯৪০-৬০) বাংলা নাটক ও তার আর্থসামাজিক দৃশ্যপট। আমরা ইতিমধ্যে জেনে নিয়েছি তাঁর এই আলোচনার সাফল্য। খুবই যত্ন ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই কাজটি তিনি করেছেন। তাঁর মূল সিদ্ধান্তের সঙ্গেও আমরা একমত হতে পারি। কিন্তু একটা কথা ত ভুললে চলে না যে নাটকের সাফল্য তার প্রয়োগে। কাজেই প্রয়োগ প্রধানরা এই সময়ে তাঁদের প্রয়োগ প্রক্রিয়ায় কতটা পরিবর্তন ঘটালেন এবং কেন ঘটালেন সেই সংবাদটিও নাটকের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। কারণ নাট্যকাররা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নাট্যপ্রয়োগের দাবিতে নাটক রচনা করেন। প্রযোজনার প্রয়োজনে অনেকসময় পূর্বলিখিত নাটকের বদলও ঘটে। ফলে অবশ্যই প্রয়োগনীতি নাটক রচনাকে প্রভাবিত করে। যে সব নাট্যকাররা স্বয়ং প্রয়োগকর্তা তাঁরা ত দুটি প্রক্রিয়া খুব সহজেই মেলাতে পারেন। বলাই বাহুল্য এ শুধু প্রয়োগ প্রক্রিয়ার সুবিধে অসুবিধের বিবেচনা নয়, দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নও জড়িত থাকে। গণনাট্য আন্দোলনে সমাজ-শ্রেণী-চেতনা মঞ্চনীতির যে পরিবর্তন ঘটায়, কিছুকালের মধ্যেই সেই মঞ্চনীতির দুর্বলতাও স্বীকৃত হয়। সমাজ-শ্রেণী চেতনা ইত্যাদি দায়বদ্ধতার কারণেই এমনটা ঘটে। শুরুর সবটাই যে শেষ পর্যন্ত বা চিরকাল অনুসৃত হবে, তা ত হয় না। প্রথম প্রয়াসকে সকৃতজ্ঞ গ্রহণের পরেও নতুন পন্থার প্রয়োজন হতে পারে। বাংলা নাট্য আন্দোলনে তা অবশ্যই ঘটেছে চল্লিশ দশকের শেষে ও পঞ্চাশের শুরুতেই। 'গণনাট্য' থেকে 'নবনাট্য'র ভাবনা এই প্রক্রিয়ারই ফলশ্রুতি। নবনাট্য গণনাট্য আন্দোলন থেকেই জন্ম নিল বটে কিন্তু মঞ্চ ও নাট্যনীতি ও প্রক্রিয়ার বদলও ঘটল। নাটক রচনায় কি তার ছাপ পড়েনি? এমনকি পরবর্তী গ্রুপ থিয়েটারে আন্দোলনও এই প্রক্রিয়ার নতুন মাত্রা যোগ হল। নাটকও কিছুটা পাল্টাল বৈকি। তাছাড়া পঞ্চাশ থেকেই বিদেশী নাটকের ভাষান্তর ও প্রয়োগও নতুন মঞ্চভাবনারই ফল। এই সব প্রশ্ন মনোযোগ পেলে হয়ত আমাদের আলোচ্য বইটির মর্যাদা আরও বাড়ত। মনে হয় লেখিকা নাটকের বিষয় ও তার আর্থসামাজিক দৃশ্যপটের প্রতি যতটা মনোযোগ দিয়েছেন, ততটা মনোযোগ দেননি নাটক ও তার প্রয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতি। সম্ভবত বইটি একটি গবেষণাকর্ম বলেই তাঁকে একটা সীমার মধ্যে কাজ করতে হয়েছে। সে কাজ

অবশ্যই সার্থক কিন্তু নাটককে যদি থিয়েটার আন্দোলনের পর্যায়ের সঙ্গে মিশিয়ে আলোচনা করা যায় তবে সেই সার্থকতা বৃদ্ধি পায়।

লেখিকার পক্ষে অবশ্য এ কথা বলাই যাবে যে তিনি ততটুকুই করতে চেয়েছিলেন, যতটুকু করেছেন। সেই কাজের জন্য আমাদের অভিনন্দন রইল।

বাংলা নাটক (১৯৪০-৬০): আর্থসামাজিক দৃশ্যপট——ডঃ মানসী জামান / জগৎমাতা পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯২ / ৪৫ টাকা।

গল্প উপন্যাসে নিরন্তর ঘটনাস্রোত

কান্তি গুপ্ত

নিখিল অফিসে আধিকারিকদের একজন। বিবেকের অনুশাসনে কর্মধারাকে পরিচালিত করে অফিসে স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। চিত্তের সৌন্দর্যে পরিবার জীবনেও সে অক্ষুণ্ণ রেখেছে পরম প্রশান্তি। হঠাৎ বিপর্যয় ঘটে গেল। নিখিল একদিন বন্ধু মোহনের বন্দুক কিনে ফেলল। নিখিল বদলে গেল। হারিয়ে গেল তার বিবেকের অনুশাসন, জীবনের সকল সৌন্দর্য। শুরু হল নিখিলের জীবনে এলিটোক্রেসির প্রাণান্ত পরিক্রমা। বড় হয়ে উঠল অহমিকার আস্ফালন। নিখিলের বন্দুক ক্রয় আর শিকার যাত্রাকে মুখ্য স্থান দিয়ে লেখক অভিব্যক্ত করেছেন বর্তমান প্রাণহীন উপভোক্তা সমাজে মূল্যবোধের প্রাধান্যতায়। মাঝে মধ্যে উপস্থিত হয়েছে সংসারের খুঁটিনাটি বিষয়। নিটোল কাহিনীর চমৎকৃত রূপ সৃষ্টি করা লেখকের অভিপ্রায় নয়, সমাজ সচেতন দৃষ্টি নিয়ে তিনি পাঠকের দরবারে উপস্থিত হয়েছেন বর্তমান এলিটোক্রেসির সর্বনাশা রূপকে প্রকাশ করতে। 'শনি' উপন্যাসে প্রারম্ভিক পৃষ্ঠায় কার্তিক লাহিড়ী রামায়ণ থেকে একটি উদ্ধৃতি লিপিবদ্ধ করেছেন, '…অগ্নিসংযোগে যেরূপ কাষ্ঠের বিকার জন্মাইয়া দেয়; অসুসংস্রব সেইরূপ লোকের চিত্ত-বৈপরীত্য ঘটাইয়া থাকে।' সমগ্র উপন্যাসে এই চিত্তের বৈপরীত্য অনুসন্ধানে লেখক তাঁর সৃজনী প্রতিভাকে বহতা রেখেছেন অকৃত্রিম বেগে রসসমৃদ্ধির আয়োজনে। 'শনি' উপন্যাসের গভীর সার্থকতা এই সত্যের তাৎপর্য সন্ধানেই।

কার্তিক লাহিড়ীর অপর একটি উপন্যাস 'সৌরভের ঘরে আগুন।' বেকার সৌরভ মামার পরামর্শে একদিন কনট্রাক্টরি ব্যবসায় নেমে পড়ে। অতঃপর ধনলাভ, প্রেম ও বিবাহ। বিয়ের পর ভোগবিলাসিনী স্বার্থান্ধ বউ ঈপ্সিতার জীবনযাত্রা আচার-আচরণ নিয়ে সৌরভের মনে অশান্তি। কিন্তু লেখক এসব তুচ্ছ সাংসারিক অশান্তির কথাকে লিপিবদ্ধ করায় তাঁর প্রতিভা ব্যয় করেননি। তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তি নিবদ্ধ থেকেছে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলের দানবীয় কর্মকাণ্ডের দিকে। সৌরভ নির্বাচনে নির্দল প্রার্থীরূপে মনোনয়ন পত্র পেশ করে। বড় একটি রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনী প্রস্তুতির অভাব পূরণ করতে চায় সৌরভকে হত্যা করে নির্বাচন স্থগিত রেখে। লেখক এই হত্যার সম্ভাপ সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন সংবেদনশীল পাঠকের মনে।

উপন্যাসের বিবরণ দানে লেখক একটি ভিন্নরীতি গ্রহণ করেছেন। বিবরণের দায় একটানা নিজের ঘাড়ে না রেখে নায়ককে এনেছেন পাঠকের কাছাকাছি। লেখকের পরিবর্তে মাঝে মাঝে নায়ক স্বয়ং বিবৃত করেছে তার রক্তাক্ত যন্ত্রণা। এই অভিনব রীতি উপন্যাসের গতিকে সজীব রেখেছে। তবে উপাদান ও উপকরণ ব্যবহারে লেখকের সার্থকতার লক্ষণ দেখা যায় না। নির্বাচন উপলক্ষে যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তা সামান্য তাড়স সৃষ্টিতেই আবদ্ধ থেকেছে এবং সে তাড়সও সৌরভের সংসারের তুচ্ছ অশান্তির কথার আধিক্যে পাঠক মনে দাগ কাটে না। 'শনি'তে কার্তিক লাহিড়ীর যে শক্তি, 'সৌরভের ঘরে আগুনে' তা অপেক্ষাকৃত ম্রিয়মাণ।

গুলবাহুকে প্রথম স্বামী তালাক দেয় ছেলে জন্মানোর পরেই। শ্বশুরের সম্পত্তি দখল করতে না পারাই এই তালাকের কারণ। দ্বিতীয় স্বামীও গুলবাহুকে তালাক দেয় বিনা দোষেই, আকস্মিক ক্রোধবশত। অতঃপর গুলবাহুর তৃতীয় নিকে হুরুদ্দিনের সঙ্গে। না-মহরমের-ছেলে, জমিজমাহীন, কৈশোর জীবনের অন্তরঙ্গ হুরুদ্দিনের সঙ্গে বিয়ে না দিয়ে পিতা গুলবাহুর জীবনকে ব্যর্থতার দিকেই ঠেলে দিয়েছিল। এবার হুরুদ্দিনের ঘরে প্রেমের অধিকারে গুলবাহুর প্রতিষ্ঠা স্ত্রী ও মাতার মর্যাদা নিয়ে। এই স্ত্রী ও মাতার মর্যাদা সুরক্ষায় গুলবাহুর ভূমিকা নিয়ে গড়ে উঠেছে আশরফ চৌধুরীর 'এই সময়' উপন্যাসটি। পল্লী বাংলার মুসলমান সমাজের পটভূমিকায় গড়ে তোলা এই উপন্যাসে লেখক দেড়-

হাজার বছর আগেকার শরিয়তের বিধানের মূল্য বর্তমান পরিবর্তিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় কতটুকু, শরিয়তের বিধান অনুসারে ইদ্দত পর্বে খরপোষ দিয়ে আজীবন খরপোষের দাবি অগ্রাহ্য করার যৌক্তিকতা আছে কিনা, এবং অকস্মাৎ তালাক উচ্চারণ করলেই সেটাই সত্য বলে মেনে নেওয়া কতদূর যুক্তিসঙ্গত—এসব বিষয় উত্থাপন করেছেন আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসা নিয়ে। লেখকের সুতীব্র বিরূপতা ও বিপ্রতীপ দৃষ্টি প্রকাশ পেয়েছে ভারতের শাসন ব্যবস্থায় মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণাকে অবদ্ধ রেখে মানুষের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতাকে জিইয়ে রাখায়। ধর্মীয় আচার আচরণের সীমিত গণ্ডি পেরিয়ে প্রশস্ত মানবভূমিতে জীবনের সৌন্দর্যকে রূপায়িত করতে গিয়ে কাহিনী গঠনের শিথিলতা এবং এলো-মেলো ঘটনার ভিড় লেখক এড়াতে পারেন নি। তথাপি সহজ সুরে নিরাবরণ ভাষায় লেখক পল্লী বাংলার মুসলমান সমাজের যে জীবন্ত আলেখ্য রচনা করেছেন বাংলা উপন্যাস ভাণ্ডারে তা মূল্যবান সংযোজন রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

কলকাতার কাছাকাছি থেকে দুই বেকার যুবক পিনাকী ও জয়ন্ত ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে ঠাঁই পেয়ে গেল বিদেশগামী মালবাহী জাহাজে। জাহাজের নানা বিস্ময়-বিমূঢ় ঘটনা পেরিয়ে ওরা পৌঁছুলো দুবাইয়ে। সেখানেও আকস্মিক নানা ঘটনার সমাহার। দুবাইয়ের পুরুষধরা নারীর কবলে পড়ে পিনাকীর প্রাণ সংশয় প্রায়, এদিকে ধনী অসুস্থ দুবাই যুবতীর প্রেমে পড়ে জয়ন্তের জীবনেও এল অনিশ্চয়তা। ত্রাণকারিণী প্রতিমা ও বন্ধু জয়ন্তকে নিয়ে পিনাকী পাড়ি দিল দেশাভিমুখে। সমুদ্রবক্ষে ঝড়, জাহাজডুবি। প্রাণে বেঁচে তিনজন মালদ্বীপের অজ্ঞাত এক দ্বীপে অসহায় জীবন কাটাতে লাগল। দীর্ঘকাল পর ভারতীয় এরার কোর্সের সাহায্যে এরা ফিরল দেশে প্রচুর ধনদৌলত নিয়ে। অবশেষে বিয়ে থা। ভ্রমণোপমোপাখ্যান রূপী 'দিরহামের সন্ধানে' গ্রন্থে চন্দন ঘোষ কৈশোরিক কৌতূহল ও উল্লাসে ঘটনার পর ঘটনা সৃষ্টি করেছেন যুক্তি-তর্ক, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বেড়া ডিঙিয়ে। মনোরম ঘটনা সৃষ্টিতে তাঁর কলম চলেছে জলে-স্থলে-আকাশ পথে। পড়তে পড়তে রোমাঞ্চ জাগে—'রোজ কত কী ঘটে যাহা-তাহা—এমন কেন সত্যি হয় না আহা।' লেখক দেশ-বিদেশের প্রচুর খবর অকৃপণ হস্তে এই গ্রন্থে দান করেছেন। তাঁর আরব্য উপন্যাসের মত পিনাকী ও জয়ন্তের প্রেম-কাহিনীর পরিবর্তে দুবাইয়ের খবর একটু বেশি জানালে আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির যোগ ঘটত।

রেল লাইনের ধারে ঝুপড়ির বাসিন্দার সংসার, স্টেশনের ভিখারি ছেলের জীবনযাত্রা, সত্তর দশকের মুক্তির উৎক্ষিপ্ততা, মাস্তানদের প্রযোজকের স্বরূপ, বর্তমান ভোগবাদী সমাজে আদর্শবান লেখকের স্থান, এসবের সঙ্গে স্বপন সেনের 'প্রত্নভূমিতে কুচকাওয়াজ' গল্প গ্রন্থে স্থান পেয়েছে অস্তিত্বের যন্ত্রণা। লেখক সমাজসচেতন। দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ। মোট দশটি গল্পে কোথাও গল্পের জন্য গল্প লেখায় লেখকের উৎসাহ-বেগ শ্লথ হয়নি, বাস্তব উপকরণকে আপন চিন্তার অধিগত রেখে বিশ্লেষণের দিকেই তিনি দৃষ্টি রেখেছেন। সব গল্পেই অকৃত্রিম শিল্পী মনের যোগ সম্পৃক্ত থেকেছে। এই সংকলনের সার্থকতম শিল্প প্রয়াস রূপে 'ধনু খুড়ো অথবা জনৈক ভাঁড় বিষয়ক কথকতা' উল্লেখের দাবি রাখে।

উদ্ভিন্ন বয়সের সীমায় বাঁধা ভালোবাসা-বাসির গল্পের আস্বাদন অবহেলা করা যায় না। আর সে সব গল্পে যদি ভরা থাক স্মৃতি সুধার মত কিছু মেশাল থাকে! শক্তি মাইতি তাঁর 'ভালোবাসা নিও' গল্পগ্রন্থের চৌদ্দটি গল্পে এরকম ভালবাসার গল্পে পাঠকদের আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন। স্বীকারোক্তিতে অবশ্য লেখক জানিয়েছেন যে, তাঁর গল্প-গুলিতে রয়েছে ছাত্রজীবনের চিন্তাভাবনাকে ধরে রাখার লোভ এবং এই গল্পগ্রন্থটি 'এক বিশেষ শ্রেণীর পাঠকের জন্য' লেখা।

কয়েকবছরের ফাঁকে বাংলাদেশের ছোটোগল্পের আসরে যাঁরা প্রবেশ করেছেন তাঁদের অধিকাংশের গভীর সাধনার যোগ ইতিমধ্যে অনেকের নজর কেড়ে নিয়েছে। জীবনকে, পারিপার্শ্বিক অবস্থান ভূমিকে, নিরন্তর বয়ে যাওয়া ঘটনা-স্রোতকে এঁরা বহতা রেখেছেন আপন আদর্শে, আপন চৈতন্যে। নতুনতর সার্থকতার লক্ষণ প্রকাশে বাংলাদেশের গল্পকারদের মধ্যে ওয়াসি আহমেদের উপস্থিতি মনকে নাড়া দেয়। তাঁর 'ছায়াদণ্ডী ও অন্যান্য' গল্পগ্রন্থের মোট নয়টি গল্পে গল্পস্রোত নেই, রয়েছে জীবনকে দেখার স্বচ্ছন্দ গতি, অকৃত্রিম অনুরাগের প্রাচুর্য। 'দুঘলোভায়' মৃতবৎসা কুলসুমের অন্তরের শ্রীহীনতার ক্রন্দন ছাড়িয়েছে কবিরাজের শক্তি হীনতায় 'নখ দর্পণে'। 'কুকুর' এবং 'কাকতাড়ুয়ার মান-ভঞ্জন' ভিন্ন সুরে লেখা। তির্যক দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে মানুষের বিপন্নতাকে। এই বিপন্নতার বিমূঢ় রূপ 'উজান পবনে', ভোগবাদী সমাজে ভোগের আকাঙ্ক্ষায়। পরিবার জীবনের ব্যক্তিগত সমস্যাকে ধরতে গিয়ে লেখক 'চক্র' গল্পের পরিসরকে বিস্তৃত করেছেন। এরকম বিস্তৃত পরিসর দেখা

গেল 'ছায়াদণ্ডী অথবা ভালবাসার শরশয্যা'য়। সেখানে লেখকের দৃষ্টি—'মানুষের অসুখের বীজটা ভেতরে', অনুসন্ধানে। 'খরদুপুর' দুর্বল। কিন্তু অবিস্মরণীয় সুর উঠেছে 'যোদ্ধা' গল্পে। গল্পটি বাংলা-ছোটোগল্পের শক্তি সম্পর্কে ভরসা জাগায়।

শনি—কার্তিক লাহিড়ী/উত্থক প্রকাশনী, ৪০ মহারানী ইন্দিরা দেবী রোড, কলিকাতা-৬০/২৫ টাকা।

সৌরভের ঘরে আগুন—কার্তিক লাহিড়ী/বিজ্ঞাপন-পর্ব, ১৮ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-১২/২০ টাকা।

এই সময়—আশরফ চৌধুরী/চারুবাক, ইউ-৬২ এস. এইচ. রোড, কলিকাতা-১৮/২০ টাকা।

দিরহামের সন্ধানে—চন্দন ঘোষ/নাথ ব্রাদার্স, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩/৫০ টাকা।

প্রত্নভূমিতে কুচকাওয়াজ—স্বপন সেন/একুশে, ১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩/২০ টাকা।

ভালোবাসা নিও—শক্তি মাইতি / চয়নিকা প্রকাশনী, ২৮ বাঁশদ্রোণী প্লেস, কলিকাতা-৭০/২২ টাকা।

ছায়াদণ্ডী ও অন্যান্য—ওয়াসি আহমেদ / এল এস কে পাবলিকেশন, ৯৫ সিদ্ধেশ্বরী সার্কুলার রোড, ঢাকা-১২১৭ / বাংলাদেশ মুদ্রায় ৪৮ টাকা।

কাব্যনাটক আর কবিতায় সময় এবং সমাজ

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পর কাব্যনাটক নিয়ে যতটা চর্চা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন ছিল, স্বীকার করতে বাধা নেই, ততটা হয়নি। একমাত্র কবি বুদ্ধদেব বসু বেশ কিছু কাব্যনাটক রচনা করেছেন, যা আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এ ছাড়া আর যেসব কবি এই মাধ্যমটিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে চেয়েছেন, তাঁদের প্রায় সকলেরই প্রবণতা ছিল কবিতা রচনার একঘেঁয়েমি থেকে সরে এসে, অন্যরকম এক সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে বৈচিত্র্যের স্বাদ অনুভব করা। পঞ্চাশের কবিকুল কিছু কিছু সুখপাঠ্য কাব্যনাটকের জন্ম দিলেও, এঁদের কেউই এই দুরূহ মাধ্যমটিকে নিয়ে ধারা-বাহিক কোন চর্চায় ব্রতী হননি। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা কবিতায় চল্লিশের বিশিষ্ট কবি রাম বসু কাব্যনাটক রচনার ব্যাপারে এক স্থির, পরিকল্পিত এবং সন্ধানী অনুশীলন প্রদর্শন করেছেন। প্রসঙ্গ-ক্রমে উল্লেখ্য যে, কাব্যনাটক রচনার জন্যেই এই কবি ১৯৮৯ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেছেন।

'সমিদ্ধ সময়' রাম বসু-র ২টি কাব্যনাটকের এক সঙ্কলন। 'সমিদ্ধ সময়'—অর্থাৎ প্রজ্বলিত বা জ্বলন্ত সময়। সংক্ষেপে বলা যায়—দুঃসময়। রাম বসুকে আমরা একজন সাম্যবাদী চেতনার কবি হিসেবেই জানি। নিজের সময় সম্বন্ধেও যে তিনি অতিমাত্রায় সত্যসন্ধানী এবং সচেতন এই গ্রন্থের ২ টি কাব্যনাটক পাঠ করলে পাঠক অবহিত হবেন। এখানে নিজের কাল বা সময়কে রাম বসু মেখাবী রঞ্জনরশ্মির নিচে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। কাব্যনাটকের প্রতি এই কবির বিশ্বাস ও আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছে ভূমিকার কোন কোন মন্তব্যে।—'আমার বিশ্বাস আণবিক যুগের আর্ট ফর্ম কাব্যনাট্য।' অন্যত্র বলেন : '…ধরা যেতে পারে আগামী যুগের শিল্পমাধ্যম হবে কাব্যনাটক।' বিতর্ক নিষ্প্রয়োজন। শিল্পের বিশেষ কোন মাধ্যমের প্রতি শিল্পী বা লেখকের বিশেষ ধরনের পক্ষপাতিত্ব থাকতেই পারে। কাকে বলা হয়—কাব্যনাটক ; এই বিষয়ে রাম বসু ভূমিকায় এক দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। আলোচনাটি নিঃসন্দেহে কৌতূহলী পাঠকের পক্ষে মূল্যবান। এখানে আলোচনার সুবিধার্থে আমরা সংক্ষেপে ধরে নিতে পারি যে, কাব্য এবং নাটকের সমান্বপাতিক উর্ণনাভ তন্তুজালই হল কাব্যনাটক। আলোচ্য গ্রন্থের ২টি রচনাতেই রাম বসু কাব্যের মূর্চ্ছনা এবং নাটকীয় সংঘাতকে সফলভাবে মিলিয়ে দিতে পেরেছেন। 'কালের রাখাল' এবং 'তখন সূর্যাস্ত'—এই ২টি রচনাতেই চরিত্রগুলি হল মূলত প্রতীকী। ১ম নাটকের যুবক এবং যুবতী বাইবেল-বর্ণিত আদম-ইভের ছায়ায় নির্মিত। এরা দুজনেই পবিত্র ও নিষ্পাপ। 'মানুষ'—পাপ এবং অপরাধের কেন্দ্রবিন্দু। ১ম নাটকের 'মাঝি' ও ২য় নাটকের 'বুড়ি'—উভয়েই কাল কিংবা সময়ের প্রতীক। বর্তমানের অস্থির সময়কে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন রাম বসু ১ম নাটকের এক চরিত্রের হাহাকারের মধ্যে দিয়ে : 'এই জীবন, বিংশ শতাব্দীর দান/উঃ! মন নেই, স্মৃতি নেই, ইতিহাস নেই/

জান্তব তৃপ্তি ছাড়া অন্য তৃপ্তি নেই'—। প্রজ্ঞাদ্ধন্দ, সমাজবাদী চেতনা থেকে কবি পশ্চিম এবং পুবের সংস্কৃতিকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন তাঁর সৃষ্ট এক চরিত্রের মুখের কথায় : 'পশ্চিম তো পচা গলা শব/যন্ত্র আর রুটি দিয়ে আত্মাকে কেড়েছে/পুব দেবে তোকে সম্পূর্ণতা, পুব দেবে/রুটি যন্ত্র আর আত্মা'। ২য় নাটকে অপরাধবোধে পীড়িত মানুষের উপলব্ধি : 'মানুষের রক্তের অন্তর্গত তিমির কত অফুরন্ত'। এই আলোচনায় আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই যে, রক্তাক্ত, দূষিত এবং অশুভ সময়কে বিশ্লেষণ করেই থেমে থাকতে চান নি রাম বসু। দুটি নাটকের শেষেই আগামী ভবিষ্যতের প্রতি এক শুভবোধে আস্থাশীল থাকতে চেয়েছেন তিনি।

আমাদের মতে, সময় ও সমাজকে বিশ্লেষণ করাতেই একজন লেখকের নৈতিক দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। অশুভ সময়কে কী ভাবে শুভবোধে উন্নীত করা যাবে, জীবনকে কী ভাবে বিশুদ্ধ এবং অর্থপূর্ণ করে তুলতে হবে—এসব ব্যাপারেও লেখকের নিজস্ব দর্শন তাঁর রচনায় প্রকাশিত হয়ে পাঠককে উজ্জীবনের অনুপ্রেরণা যোগাতে পারে। এই গ্রন্থে একই সঙ্গে বিশ্লেষক ও পথপ্রদর্শনকারীর গুরুদায়িত্ব গভীর নিষ্ঠায় পালন করতে চেয়েছেন রাম বসু। ১ম রচনার অভিশপ্ত মানুষ যখন প্রশ্ন রাখে 'মাঝি' বা সময়ের কাছে—'আমার কি পরিত্রাণ নেই'; তখন সে উত্তর পায়—'আছে। হয়ত আছে। আমাদের সকলেরই আছে/বহু শত শতাব্দীর পরে যন্ত্রণায় পরিশুদ্ধ হলে/আমাদের ত্রাণ'। ১ম রচনা শেষ হয় এরকম এক প্রার্থনার মধ্যে : 'প্রকাশিত হোক প্রেমিকের মুখ, মানুষের মুখ / সময়কে উদ্ধার করো/প্রকৃতিকে মানবিক করো / চেতনাকে মানবিক করো…'। এবং ২য় রচনাতেও নবজাতক শিশুকে বুকে নিয়ে অপরাধী যুবক স্বগতোক্তি করে—'আমার বিনাশ হল/এবার প্রেমের জন্ম/বিকাশের নামই জীবন'। আমাদের বিশ্বাস, এই দুটি কাব্যনাটকই সচেতন ও মেধাবী পাঠকের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন অর্জন করবে।

'আলোময় অনাবিল, সংকেতপ্রবণ'—আনন্দ ঘোষ-হাজরার কবিতাকে তাঁর নিজের ভাষাতেই আমরা এইভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। প্রতিষ্ঠিত, কবি আনন্দ-র ৮ম কাব্যগ্রন্থ 'লেনা বেসিনে সন্ধ্যা'। গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলি পড়লে মনে হয়, নিদ্রিত শিলালিপির অন্তরালে হাজার হাজার বছর আগেকার অতীতকে আবার জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন আনন্দ শব্দ এবং ছন্দের সুচিন্তিত প্রয়োগে, কল্পনার মন্থনে, মেধা ও প্রজ্ঞার স্থির ধ্যানে। শব্দে ব্যবহারে আনন্দর কবিতা বরাবরই আলাদা করে চোখে পড়ে। ছন্দ ও শব্দের জাদুমন্ত্রে তিনি কবিতায় সৃষ্টি করেন সঙ্গীতের গম্ভীর মূর্চ্ছনা। গ্রন্থের ১ম কবিতায় বারো হাজার বছরের অতীতকে চিত্রায়িত করতে চেয়েছেন এইভাবে : 'লেনা বেসিনের গায়ে নামে ধীরে ঋজু সাঁজরেখা / লার্চবন গম্ভীর মহৎ / এখন কুলায়ে ফেরে সারসের দল, সাদা হাঁস / অসংখ্য সী-গাল'। আবার 'উৎসব' কবিতায় তিনি আদিম মানুষের বিচিত্র জীবনযাপনকেই যেন কল্পনার রঙে উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন : 'ভল্লের ওপরে লগ্ন সন্ধ্যা নামে, আমি চাই মদ / স্বর্ণদেবতার কাছে আর আমি থাকবো না অঞ্জলিপ্রধান / এই ভগ্ন লক্ষ্যভেদ করে আনবে রুটি, মদ, ফসলের রাশি'—। এবং 'মোজেস' কবিতায় বাইবেল-বর্ণিত পরিপ্রেক্ষিত মূর্ত হয়ে ওঠে পাঠকের ভিসনে :—'রাত্রি বড়ো অন্ধকার, ঝড় / ঘোড়ার লাগামে কাঁপছে ক্রোধ ও আবেগ / ওঠো, চলো যাই—'। আলো, অন্ধকার, মেঘ এবং বৃষ্টি—এইসব প্রাকৃতিক উপাদান সাংকেতিক ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত হয় আনন্দ-র কবিতায়। 'আলো'—গতানুগতিকভাবে প্রেম কিংবা সৃষ্টির প্রতীক; 'অথচ আলোই তীব্র প্রেম টেনে আনে / অমোঘ বিচ্ছিন্ন দ্রুত ধাবমান খণ্ডবস্তুকণা / প্রেম প্রাণস্পর্শ আনে, জোড় দেয়, সোহাগসরুদ্ধ'—। মেঘ হল সৃষ্টির পূর্বাভাস। এবং বৃষ্টির অর্থ—সৃজনশীলতার উন্মুক্তিসহ প্রকাশ : 'বোধিবৃক্ষে লেগেছে আগুন / তুমি তো জানো না আর কিছুক্ষণ পরে / ফেটে যাবে পাহাড়েরা / সমুদ্র উত্তাল হয়ে পাহাড়ের শীর্ষদেশ ছোঁবে / নক্ষত্র বর্ষণ হবে অবিরাম।'

আর এক প্রতিষ্ঠিত কবি মঞ্জুষ দাশগুপ্ত-এর 'এত প্রিয় এখন পৃথিবী'—তাঁর ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। এককাল আমরা মঞ্জুষকে প্রধানত একজন প্রেমের কবি হিসাবেই চিহ্নিত করেছিলাম। নরনারীর প্রেমকে বহুবর্ণে চিত্রিত করাই ছিল তাঁর কবিতার প্রধান ঝোঁক। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে আমরা স্বস্তির সঙ্গে লক্ষ করি যে, বিষয়ভাবনায় মঞ্জুষ নিজেকে যথেষ্ট পালটে নিয়েছেন। একথা পাঠক অস্বীকার করতে পারবেন না যে, আমরা এখন এক মহা-দুঃসময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি। মানুষের জীবন এখন প্রতিমুহূর্তে আক্রান্ত ও বিপন্ন। সাম্প্রদায়িকতার দানব আমাদের এতদিনকার সাজানো স্বদেশ তথা পৃথিবী যেন গুঁড়িয়ে তছনছ করে ফেলতে চাইছে। সেই ভয়াবহ বাস্তব থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা কোন কবি বা লেখকের পক্ষেই উচিত নয়। যেন এই সত্য বুঝে

নিয়ে মানুষ অনেক কবিতাতেই সাম্প্রতিক জীবনের নিরাপত্তাহীনতাকে শিল্পিত আবেগে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। 'ভারতবর্ষ' কবিতায় তিনি লেখেন : 'গাছের ছায়ায় বোসো / হিন্দু হও মুসলমান হও। গ্রীষ্মদিনে গাছ ঠিক ঠাণ্ডা হাওয়া দেবে'। 'সাম্প্রদায়িক এই অবেলায় / গাঢ় অন্ধকারে'—যখন সবাই বিভ্রান্ত, তখনও মঞ্জুষ লক্ষ করেন মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিক মিলন : 'তবু ছাখো শিখ মেয়ে / ইরবিন্দর বিয়ে করে আমারি ভাইকে / আমার বোনটি চলে যায় / সিরাজের ঘরে'। সমস্যার মর্মমূলে পৌঁছতে চেয়েছেন তিনি 'বজ্রকীট' কবিতায় : 'শব্দের ভিতরে ধর্ম পুরে দেয় পুরোহিত অথবা যাজক'। উপমা ব্যবহারেও মঞ্জুষ সপ্রতিভ এবং নতুন : 'কর্ণের রথের মতো / অ্যাম্বুলেন্স খানাখন্দে আটকে পড়ে আছে'। 'আদর্শের মাটির উপরে / ক্যাকটাসের ফুল ফুটে থাকে'—একটি কবিতায় এরকম অনুযোগ করলেও আমরা জানি, তিনি জীবনের প্রতি বরাবরই কৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসী থাকতে চান : 'জ্যোৎস্নার লুটোপুটি মুরগী ঝুঁটি ফুলের উপরে / সে নারী মায়ায় ডাকে আশ্রয়ের সোনালী আঁচলে'।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাহমুদ কামাল ও কামাক্ষা নাথ সেন সম্পাদিত—'ষাটের দশকের কবিতা'—বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের কবিদের নির্বাচিত কবিতার সঙ্কলন। গ্রন্থটি প্রকৃতই সু-সম্পাদিত এবং দশক-ভিত্তিক কবিতায় এক বিশ্বস্ত দলিল। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ষাট দশকের কবিদের নিয়ে একাধিক সঙ্কলন প্রকাশ পেলেও বাংলাদেশের কবিদের সেখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। দুই বাংলায় কবিদের এরকম এক প্রামাণ্য গ্রন্থ হাজির করবার জন্যে সম্পাদকদ্বয়কে ধন্যবাদ। গ্রন্থের ভূমিকাটি খুবই সুলিখিত। ষাট দশকের কবিদের ঘিরে দুই দেশে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে যেসব আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, সেসবের ডকুমেন্টারি বিবরণ পাওয়া যাবে ভূমিকায়। তবে—"ভারতের পশ্চিমবঙ্গে যে গোষ্ঠী সবচেয়ে বেশী আলোড়ন তুলেছে ইতিহাসে তা 'হাংরি জেনারেশন' নামে পরিচিত"।—ভূমিকার এই মন্তব্য বোধহয় সঠিক নয়। 'হাংরি আন্দোলন' একসময় কলকাতা শহরে কিছু চমক সৃষ্টি করলেও পরে বাংলা কবিতায় এর প্রভাব তেমন ভাবে লক্ষিত হয় না। কল্লোল আন্দোলনের পর বাংলা কবিতায় কৃত্তিবাস কবিগোষ্ঠীর আন্দোলন—নিঃসন্দেহে বেশি উল্লেখযোগ্য। দুই বাংলার প্রায় সব কবিই (উল্লিখিত দশকের) উপস্থাপিত হয়েছেন এই গ্রন্থে। ষাট দশক—দুই বাংলার কবিদের কাছেই দারুণ অস্থির সময়। নৈরাশ্যে ধূসর এই সময়ের কাছে দু-দেশের কবিদেরই প্রতিক্রিয়া যে একইরকম তা বোঝা যাবে এরকম উদাহরণে : (ক) 'বালক বালিকারা / তোমাদের জন্য রেখে গেলাম সুদৃশ্য টমক্যাট বিমানের ঝাঁক / আর অতি উপাদেয় আত্মমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র বহর।' [আবু কায়সার : বাংলাদেশ] (খ) 'সমুদ্রের পাশে হিজড়া / নার্সিং হোমের করিডর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে খটখটে শুকনো বৌ / পালোয়ান ঘুষি মেরে কাটিয়ে দিচ্ছে ষাঁড়ের মাথা / কুৎসিৎ ভঙ্গীতে হেসে উঠছে শিশু—[শামসের আনোয়ার : পশ্চিমবঙ্গ]

মতি মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় শব্দ তার নিজস্ব বিভা ও সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। শব্দ-ব্যবহারে অতি দক্ষ এই কবি ছন্দকেও নির্ভুল ভাবে ব্যবহার করতে জানেন। তার ওপর মতির কবিতা পড়লে বোঝা যায়, নিজের সময় ও পারিপার্শ্বিক তিনি মনোযোগ দিয়ে অনুধাবন করেন। প্রাথমিক ভাবে মতি লিরিক্যাল মেজাজের কবি। প্রেম, নারীর সৌন্দর্য এবং সবার ওপরে আরও স্বাস্থ্যকর এবং উন্নততর এক জীবনের জন্যে আকাঙ্ক্ষা—এইসব কাব্যিক উপাদান তাঁর কবিতাকে পাঠকের কাছে সহজেই গ্রহণযোগ্য করে তোলে। 'আমার সৈন্য হবে নতুন পাতারা'—মতির ৯ম কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থের একটি কবিতায় মতি গভীর আস্থায় উচ্চারণ করেন : 'এই ক্রুর পৃথিবীতে আজো / কিছু কিছু বাসযোগ্য জমি পড়ে আছে'—। অনবদ্য এক চিত্রকল্পের আস্বাদ পাওয়া গেল আর একটি কবিতায়—'রিং মাস্টার বাতাসের সাঁই সাঁই চাবুকে / জক্ষেপ না করে বেয়াদব বৃষ্টি এখন / সার্কাসের বাঘ হয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে / উঠোনময়'। মতি নিঃসন্দেহে একজন আশাবাদী কবি। চরম হতাশার মধ্যে দাঁড়িয়েও তিনি পাঠককে আশ্বস্ত করেন এইভাবে : 'আমার সৈন্য হবে লাখো লাখো নতুন পাতারা / সবুজ সন্ত্রাস হয়ে / খরায় মাটিতে ওরা আবির্ভূত হবে।'

'এই লজ্জা তোমার, আমার' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা উর্ধ্বেন্দু দাশ একজন সমাজমনস্ক কবি। তৃতীয় বিশ্বের লাঞ্ছিত এবং নিপীড়িত মানুষের প্রতি এক গভীর দরদ এই গ্রন্থের অনেক কবিতাতেই প্রকাশ পায়। সমাজবাদী আদর্শে বিশ্বাসী উর্ধ্বেন্দু নেলসন ম্যাণ্ডেলার মুক্তি উপলক্ষ্যে এবং বেঞ্জামিন মোলায়েন স্মরণে কবিতা রচনা করেন। কোন কোন কবিতায় চলতি সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি ক্ষোভ, রাগ এবং প্রতিবাদ দীপ্র শব্দের ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেন তিনি। তৃতীয়

বিশ্বের 'পাথুরে' মানুষের উদ্দেশে তিনি জানান—'ফ্রান্স মেরিকা ব্রিটেন চীন রাশিয়ার সমর-আগারে / তারই জন্যে জড়ো হচ্ছে লাখো-লাখো মারণ আয়ুধ।'—জনজীবনের নৈতিক অবক্ষয়, আদর্শহীনতা ভাঙোলেজ এই কবিকে মর্মাহত করে। কবিতায় তাঁর হাহাকার এবং বিলাপ পাঠককেও নাড়িয়ে দেয়—'মানুষের সব গিয়ে, হিংসা ও হনন আজ হয়েছে পাথেয় ; / মানুষের চোখ থেকে বহুদিন নিভে গ্যাছে মহাবোধি আলো'।

সমীরণ মজুমদার-এর 'দেবীপার্বণ' গ্রন্থের কবিতাগুলি পড়লে মনে হয়, কবি প্রাত্যহিক জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়েও অন্য এক বড় জীবনের প্রতি গভীর প্রত্যয়ে স্থির থাকতে চাইছেন। অনেকদিন নিষ্ঠার সঙ্গে কবিতা লিখছেন সমীরণ। 'প্রেম আর সাম্যের গানে' অনুপ্রাণিত হয়ে, 'ভালবাসার জন্য দাউ দাউ আগুন ছড়িয়ে, / সুখ ও অসুখ সব ভাবতে ভাবতে / আশ্চর্য রূপের স্পর্শে'—সমীরণ নির্মাণ করতে চান এমন এক পৃথিবী যা 'ভাঙা মানুষের গানে' একদিন মুখরিত হয়ে উঠবে। একটি কবিতায় তাঁর আক্ষেপ : 'সাত জন্ম ধরে খুঁজে ফিরি একটি মানুষ'। শব্দ-ব্যবহারে এবং উচ্চারণে সমীরণ সর্বদাই গম্ভীর। নিজের সন্ধানে তিনি স্থির এবং কমিটেড। বাস্তবিক তিনি সঠিক অর্থেই রোমান্টিক মানসের কবি। কলরোলময় এই জীবনকে সহ্য করার পরও সমীরণ স্বপ্ন দেখেন—'দেখলাম মৃত-হিম গোলাপ পাপড়ি / বরফের স্তরে স্তরে জেগে আছে / প্রেমের প্রতীক হ'য়ে সেই ছোট্ট দ্বীপে'। নিজের সমাজকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন তিনি। সারা দেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িকতার আগুন সমীরণকেও স্পর্শ করে, দারুণভাবে বিব্রত করে তাঁকে : 'যত আগুন তত মানুষ / সারাটা দেশ আগুনের মুঠোয় / নাচে / অযোধ্যা থেকে কন্যাকুমারিকা / আগুনের মধ্যে বাঁচে ?'।

বোধ ও অনুভবের ওপর নির্ভর করে গৌর খাঁড়া তাঁর 'সন্ধিপ্রকাশ' গ্রন্থে আত্মস্থ করতে চেয়েছেন এক অনন্য প্রকাশরীতি। আলোচ্য গ্রন্থের কবিতাগুলি সাজানোতেও গৌর বেশ চিন্তা এবং পরিকল্পনার উদাহরণ রেখেছেন। 'রাগ' এবং 'বিভাব'—২টি পর্বে কবিতাগুলি বিভক্ত। গৌরের প্রকাশভঙ্গি সংক্ষিপ্ত এবং ইঙ্গিতময়। ছোট ছোট কবিতায়, সতর্ক উচ্চারণে তিনি জীবনের সত্যগুলি নতুনভাবে আবিষ্কার করেন। ...'প্রত্যয়' কবিতাটি এরকম—'প্রাচীর / রোদ্দুরে একা / প্রহরাহীন'—। ইঙ্গিতময়তা ছাড়াও এই কবিতায় 'প্র'-এর অনুপ্রাস পাঠকের কানে ঠিকই বাজবে। 'আলো' কবিতায় গৌরের অনবদ্য প্রকাশরীতি এরকম—'নির্জনতা ভেঙে / আটচালা ঘরে / জেগে ওঠে / শিশুর প্রকাশভঙ্গী।' সারা গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে এরকম অনেক অনুভবসমৃদ্ধ, মেধাবী উচ্চারণ। গ্রন্থটি অবশ্যই এক ব্যতিক্রমী প্রয়াস।

নতুন কবিতা লিখতে এসে কোন কোন কবি এরকম ধারণায় প্রভাবিত হ'য়ে পড়েন যে, কবিতায় জীবনের অন্ধকার দিককে যত বেশি তুলে ধরা হবে, ততই কবিতা হবে আধুনিক। ভাল কবিতা রচনার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মৃগাঙ্ক রায় তাঁর 'জন্মগ্রহণ মৃত্যুগ্রহণ' কাব্যগ্রন্থে একের পর এক হাজির করেন উদ্ভট সব উপমা। যেমন : 'গাছের লম্বা পাতাকে / গলায়—দড়ি দেওয়া মানুষের / ঝুলে পড়া জিভের মতো দেখায়।' পাঠকের কাছে কিংবা নিজের কাছেই তিনি এরকম এক প্রশ্ন রাখেন : 'আমরা কি ব্যাঙজের নিচে / দগদগে ঘা-এর মতো / বেঁচে থাকব ?' অকারণ স্মার্ট হ'তে না চেয়ে, মৃগাঙ্ক যদি জীবনের দিকে স্পষ্টভাবে তাকিয়ে সহজভাবে লেখেন, তাহলে তিনি নিজের কবিতাকে প্রত্যাশিত মানে পৌছে দিতে পারবেন।

সমিদ্ধ সময়—রাম বসু/মৌনমুখর ৯, কবি সুকান্ত রোড, কলকাতা-৭৫ / কুড়ি টাকা।

লেনা বেসিনে সন্ধ্যা—আনন্দ ঘোষ হাজরা/মহাদিগন্ত বারুইপুর চব্বিশ পরগণা (দ) ৭৪৩৩০২ / পনের টাকা।

এত প্রিয় এখন পৃথিবী—মঞ্জুষ দাশগুপ্ত / মিরান্দা ২৩৮, মাণিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-৫৪ / কুড়ি টাকা।

ষাটের দশকের কবিতা—মাহমুদ কামাল কামাক্ষা নাথ সেন সম্পাদিত / শিল্পতরু প্রকাশনী ২৯০, সোনার গাঁও রোড, ঢাকা-১২০৫ / ষাট টাকা (বাংলাদেশ মুদ্রায়)।

আমার সৈন্য হবে নতুন পাতারা—মতি মুখোপাধ্যায়/মহাদিগন্ত বারুইপুর / পনেরো টাকা।

এই লজ্জা তোমার, আমার—উর্ধেন্দু দাশ/অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ ডাকবাংলো রোড, মেদিনীপুর / দশ টাকা।

দেবীপার্বণ—সমীরণ মজুমদার/অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ / পনেরো টাকা।

সন্ধিপ্রকাশ—গৌর খাঁড়া/মহাদিগন্ত বারুইপুর / বারো টাকা।

জন্মগ্রহণ মৃত্যুগ্রহণ—মৃগাঙ্ক রায়/প্রোফাইল পাবলিশার্স, কলকাতা-৩৯ / পনেরো টাকা।

হিন্দি সাহিত্যের দুই ব্যক্তিসত্তা : প্রসাদ ও যশপাল

কমলেশ সেন

হিন্দি সাহিত্যে যে আধুনিক মনস্কতা এবং প্রতীক ধর্মিতা হিন্দি কাব্যসাহিত্যকে প্রভাবিত করে, তা হচ্ছে ছায়াবাদ। এ-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হচ্ছেন জয়শংকর প্রসাদ। হিন্দি সাহিত্যে এই ছায়াবাদ শুরু হয় ১৯২০ থেকে। ১৯৩৬ পর্যন্ত এই ধারায় মহাকাব্য খণ্ডকাব্য এবং কবিতা লেখা হয়। কাব্যের এই ধারা কথাসাহিত্যকেও আপ্লুত করে। প্রবন্ধ সাহিত্যে এ-যুগকে চিহ্নিত করা হয় শুরু যুগ বলে। অর্থাৎ হিন্দি সাহিত্যের এ-সময়কার অন্যতম নিবন্ধকার আচার্য রামচন্দ্র শুক্লের নামানুসারে চিহ্নিত হয়। কথা সাহিত্যে এ-যুগ প্রেমচন্দর যুগ। সৃষ্টিশীল সাহিত্য সাধনায় এ-যুগ যথার্থভাবেই ছায়াবাদ—এক নতুন আধুনিককালীন রোমান্টিক যুগের গোড়াপত্তন করে। বিশ্বপ্রকৃতি নারীপ্রেম মানবতা একালের বিশিষ্টতা। নারী তার স্বাধীন চেতনা এবং অভিলাষ নিয়ে সংঘাতময় মানব-ইতিহাসে অবতীর্ণ হয়। জয়শংকর প্রসাদের শেষ কাব্যগ্রন্থ 'কামায়নী'-তে তিনি শ্রদ্ধাকে এক নতুন মানবী হিসেবে চিত্রিত করেছেন। ঋষি মনু এখানে সাধরণ একজন মানুষের মত কামনা-বাসনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

নাট্যকার হিসেবেও প্রসাদ নাট্যসাহিত্যে বিশ্বমানবতার আসনে নারীর হৃদয়কে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। নারীকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর নাটক কামনা ধ্রুবস্বামিনী চন্দ্রগুপ্ত স্কন্দগুপ্ত রাজশ্রী বিশাখ অজাতশত্রু—ভারতের অতীত ইতিহাসকে আশ্রয় করে গড়ে উঠলেও, বিংশ শতাব্দীর যে মানবিক আবেদন, নারী-পুরুষের যে পারস্পরিক সম্পর্ক ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লবের পরে ইউরোপে শুরু হয় তার ঝলক তাঁর নাটকে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে-সময়কার সামাজিক রাজনৈতিক ধার্মিক অবস্থা তাঁর নাটকে যথার্থভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মের দার্শনিক সংঘাতও এসেছে। বৈদিক ধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সংঘাতও তাঁর নাটকে যথার্থভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

জয়শংকর প্রসাদ তথাকথিত বিদ্যালয়ের শিক্ষা না পেলেও ভারতীয় ইতিহাস সংস্কৃতি দর্শন পুরাণ সাহিত্য তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন। সংস্কৃত ইংরেজি পালি প্রাকৃত ভাষার সঙ্গেও ছিল তাঁর গভীর যোগ। আর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতের এমন এক যুগের তিনি সৃষ্টিশীল মানুষ, যে-যুগ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একদিকে অহিংস অন্যদিকে সশস্ত্র সংগ্রাম করছে। কৃষক এবং শ্রমিকরা জাতীয় আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে। আর জাতীয় আন্দোলনের গর্ভে জন্ম নিচ্ছে নতুন নতুন ভাবধারা। এই ভাবধারা তাঁর চেতনায় সর্বক্ষণ আলোড়ন সৃষ্টি করছে।

জয়শঙ্কর প্রসাদ হচ্ছেন ছায়াবাদ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি—শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। কিন্তু তিনি গল্প এবং উপন্যাসও লিখেছেন। তাঁর উপন্যাসগুলি হচ্ছে কংকাল তিতলি এবং ইরাবতী। ইরাবতী তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। গল্পসংগ্রহগুলি হচ্ছে ইন্দ্রজাল, আঁধি, আকাশদীপ।

শ্রীমতী ইনা সেনগুপ্ত 'প্রেম অপ্রেম' নাম দিয়ে জয়শংকর প্রসাদের বারোটি গল্প তাঁর গল্প সংগ্রহগুলি থেকে বাছাই করে অনুবাদ করেছেন। বাছাইগুলো ভালো হয়েছে।

অনুবাদিকা শ্রীমতী সেনগুপ্ত তাঁর ছোট্ট 'কেন এই অনুবাদ'-এ বলেছেন, 'হিন্দি ভাষা নিয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে পাঠ্যক্রমে একটি গল্প পাই, শ্রীজয়শংকর প্রসাদের 'পুরস্কার'। পড়ে মুগ্ধ হলাম। শক্তিশালী লেখকের বিশিষ্ট রচনাশৈলী, বিষয়বস্তু, ভাবের গভীরতা, ভাষায় মাধুর্য, অলঙ্কারের ঐশ্বর্য এসব-তো ছিলই, তাছাড়াও আর যা আমাকে মুগ্ধ করল তা নায়িকার তেজস্বিনী চরিত্র। লেখক নারী জাতিকে তাঁর সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান দিয়েছেন...

চম্পা পান্না পদ্মা মধুলিকার বিলাসিনী হুরী ফিরোজা শালবতী—এমনই অনেক নারী চরিত্রকে তিনি মহিমশী করে তুলেছেন। তাই আকাশদীপ, গুণ্ডা, দেবদাসী, পুরস্কার, চুড়িওয়ালী, হুরী, দাসী, শালবতী পড়তে পড়তে তাদের সঙ্গে আমরা গভীর একাত্মতা অনুভব করি। অতীত একান্ত কাছের হয়ে ওঠে। বুকের মধ্যে একটা অস্পষ্ট যন্ত্রণা গুঞ্জন করে। চোখের দু'কোণের ভরা-জল যেন সমুদ্র হয়ে ওঠে।

বিশেষ করে চম্পা যেন আমাদের মনে বেদনার সঙ্গে স্থান করে নেয়।

জয়শংকর প্রসাদ যে ভাষায় গল্পের দেহ নির্মাণ করেছেন, যন্ত্রণা এবং বোধ নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, অনুবাদিকা সর্বত্র সেই মেজাজ অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন নি—এবং সেই উপলব্ধির জায়গায় আমাদের অনায়াসে নিয়ে যেতে পারেন নি। পারেননি তার কারণ হিন্দি ভাষার গঠনরীতি শৈলী এবং তার ভাবসম্পদের ওপর বেশি নজর দিতে গিয়ে বহু জায়গাতেই তিনি হিন্দি বাক্যবিন্যাসের মধ্যে এমন কি শব্দ প্রয়োগের মধ্যেও আটকে পড়েছেন। তবে একথা ঠিক যে শ্রীমতী ইনা সেনগুপ্ত এমন একটা সময়ে এ গল্পগুলি অনুবাদ করেছেন যখন আমাদের বাঙলা সাহিত্যের তথাকথিত নামী দামী সাহিত্যিকরা নারীকে শুধু অবমাননাই করছেন না, ভোগ লালসার পণ্য হিসেবে বাজারে ফেরি করছেন। আজ, এই মুহূর্তে এই সংগ্রহের মূল্য অনেক।

জয়শংকর প্রসাদ যখন হিন্দি কাব্য এবং নাট্য সাহিত্যকে নতুন দিশায় উপনীত করেন, কথাসাহিত্যে প্রেমচন্দর পরবর্তী কালে শ্রেণীসংগ্রাম যখন তীব্রতর হয়ে ওঠে, জাতীয় সংগ্রাম যখন একটা পর্যায় থেকে আর একটা পর্যায়ে প্রবেশ করে, তখন ভগৎ সিংহ বটুকেশ্বর দত্তর সাথী যশপাল জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সাহিত্যের আঙ্গিনায় প্রবেশ করেন। জেল থেকে বেরিয়ে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে যশপাল বলেন, 'বুলেট দিয়ে যে কাজ করার সংকল্প করেছিলাম, এখন সেকাজ বুলেটিন (সাহিত্য) দিয়ে করব।' বস্তুতঃ এ-অঙ্গীকার তিনি করলেও, মানুষের পাশে থাকতে চাইলেও, রাজনৈতিক জীবন থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে, জীবনকে বোঝার এবং দেখার একটা খামতি তাঁর সাহিত্যে থেকেই গিয়েছে।

যশপালের সাহিত্য-চর্চা শুরু হয় ছাত্রাবস্থাতেই। 'ভ্রমর' 'প্রভা' 'প্রতাপ'-এ তিনি একসময়—তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হওয়ার আগে—গল্প লিখতে থাকেন। জেলের ভেতরও তিনি বসে থাকেন নি। লিখেছেন। পড়েছেন। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ১৯৩৯-এ তাঁর প্রথম গল্প সংগ্রহ 'পিঁজরে কী উড়ান' প্রকাশিত হয়। তাঁর জীবদ্দশায় মোট চল্লিশটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ষোলটি গল্পগ্রন্থ। বারোটি উপন্যাস। চারটি রাজনৈতিক নিবন্ধ, পাঁচটি রম্যরচনা, তিন খণ্ডে বিপ্লবী জীবনের স্মৃতিচারণ—'সিংহাবলোকন', তিনটি ভ্রমণ কাহিনী, তিনটি অনূদিত উপন্যাস এবং একটি একাঙ্ক সংকলন। ১৯৪১ সালে তাঁর 'দাদা কমরেড' প্রকাশিত হলে মার্কসবাদী মহলে বিরূপ সমালোচিত হন। বৌদ্ধকালীন নগরবধূ দেবী মল্লিকাকে নিয়ে লেখা তাঁর উপন্যাস 'দিব্যা' বিশেষ সমাদর লাভ করে। 'দিব্যা' বিদেশী অনেক ভাষায় অনূদিত হয়। এ-ছাড়াও তাঁর সামাজিক এবং রাজনৈতিক উপন্যাস 'মুঠাসচ,' 'অমিতা' 'দেশদ্রোহী', 'পার্টি কমরেড,' মনুষ্য কে রূপ' বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

যে-অর্থে শ্রেণী সংঘাতকে আমরা দেখি, সে অর্থে তিনি তাঁর সাহিত্যকে রক্তাক্ত করে তোলেন নি। মার্কসীয় চিন্তা ভাবনার সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত করেছেন ফ্রয়েডিয়ান মনোবৈকল্যবাদ। মানসিক জগতের গূঢ় আলো-ছায়ার মধ্যে তিনি বিচরণ করতে বেশি পছন্দ করতেন।

মানুষের বিকল মনের ছায়া-প্রচ্ছায়া নিয়েই তিনি কারবার করতে বেশি ভালো বাসতেন। কিন্তু সাদত হোসেন মণ্টো সেখান থেকে যে অমূল্য রত্ন এবং ধ্যান তুলে এনেছেন, যশপাল তা তুলে আনতে অক্ষম হয়েছেন। কিংবা রাজেন্দ্র সিংহ বেদী যে-প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মানবমনের আনাচে-কানাচে ঘুরেছেন, সেই প্রবল ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা যশপালের মধ্যে দেখা যায় না।

'যশপালের শ্রেষ্ঠ গল্প' হিন্দি ও উর্দু সাহিত্যের সাবলীল অনুবাদক আশরাফ চৌধুরী তাঁর আটটি গল্পগ্রন্থ থেকে বারোটি গল্প নিয়েছেন। এই বারোটি গল্পকে তিনি শ্রেষ্ঠাংশ বলে মনে করেছেন। যশপাল সম্পর্কে এই গ্রন্থের ভূমিকাটি তথ্যনিষ্ঠ। তাঁর রাজনৈতিক ও সাহিত্যজীবন—এবং তাঁর সমগ্র সৃষ্টি সম্ভারের ওপর তিনি আলোকপাত করেছেন।

প্রেম অপ্রেম—জয়শংকর প্রসাদ / অনুবাদিকা : ইনা সেনগুপ্ত, নিউ বেঙ্গল প্রেস, ৬৮ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩। তিরিশ টাকা।

যশপালের শ্রেষ্ঠ গল্প—অনুবাদক : আশরাফ চৌধুরী / চারুবাক, ইউ-৬২ / এম. এইচ রোড, কলকাতা ৭০০০১৮ / পঁচিশ টাকা।

শিবনারায়ণ রায়ের রেনেসাঁস-ভাবনা

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

বাংলাদেশের 'শিল্পতরু প্রকাশনী' সম্প্রতি 'র‍্যাডিক্যাল ও মানবতন্ত্রী' বুদ্ধিজীবী হিসাবে খ্যাত শ্রীশিবনারায়ণ রায়এর 'রেনেসাঁস' নামে একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের পাঠকদের জন্য তাতে নতুন কিছু না থাকলেও বাংলাদেশের উদ্দিষ্ট নতুন পাঠক শ্রেণীর জন্য আছে একরাশ মানবিক অভিজ্ঞতা ও বিবেকী জিজ্ঞাসার খোরাক। এতে আছে দশটি প্রবন্ধ। তার মধ্যে দুটি রেনেসাঁস বিষয়ক : 'রেনেসাঁস' ও 'বাংলার রেনেসাঁস'। বাকিগুলির শিরোনাম : 'ভারতীয় ঐক্যের সন্ধানে', 'নাস্তিকের ধর্মজিজ্ঞাসা', 'মৃত্তার জয়যাত্রা', 'নীচের তলা থেকে বিপ্লব', 'মানবতন্ত্রের ভূমিকা', 'সুস্থ সমাজের সন্ধানে,' 'ব্যক্তি, সমাজ ও নৈতিক মূল্যবোধ', 'জার্নাল থেকে'। পরিব্যাপ্ত অধ্যয়ন, তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও নিরন্তর অন্বেষণে আপূর্ণ। সাধারণ পাঠকদের ত বটেই, এ সব ভারি ও ধারালো রচনা পৃথিবীর যে কোন চিন্তাশীল মনীষীকেও সমৃদ্ধ বা ঘায়েল করতে পারে। তথ্য ও তত্ত্বে ঠাসা। ঘনপীনদ্ধ, সূত্রাত্মক অথচ স্কেচী। এর এক একটি নিবন্ধের মধ্যে যা রসদ আছে তা দিয়ে অনায়াসেই এক একটি করে বই লেখা যেতে পারে। আমরা যারা জল মেশানো পাতলা দুধের বই পান করতে অভ্যস্ত তাদের পক্ষে একটু দুষ্পাচ্য। তবে টানা বই নয়। কাটা কাটা প্রবন্ধ। এই যা রক্ষা!

গ্রন্থের সবকটি প্রবন্ধ নিয়ে একত্রে আলোচনা প্রায় অসম্ভব। সংবেদী পাঠকদের জন্য সেই উত্তেজক অভিজ্ঞতা তোলা থাক। আমরা বরং বেছে নিই গ্রন্থনাম ছুঁয়ে যে নিবন্ধ দুটি এতে বক্ষ্যমান সেই নিবন্ধ দুটি, যেখানে ধরা পড়েছে শিবনারায়ণ রায়-এর রেনেসাঁস-ভাবনা।

অবহিত ব্যক্তিমাত্রই জানেন, উনিশ শতকে বঙ্গভূমিতে যা হয়েছিল তাকে রেনেসাঁস বলা যায় কিনা তা নিয়ে অত্যন্ত (অ-)পরিষ্কার দুটি অভিমত আছে : 'truely a Renaissance'[১] ও 'বাংলার নবজাগৃতি একটি অতিকথা'[২], বাংলার রেনেসাঁস ভাষ্যকাররা মোটামুটি দু'দলে বিভক্ত। নেতিবাদী শিবিরে যাঁরা আছেন তাঁদের বক্তব্য, যে স্বাধীন নয় তার 'রিনাইসেন্স' হবে কি করে?[৩] সুতরাং রেনেসাঁস নয়, এখানে যা হয়েছে তা হচ্ছে 'weak and distorted caricature of the same.'[৪] এঁদের যুক্তিমালা ও বক্তব্য খুবই জোরদার। দুর্বলতা একটাই, প্রকৃত রেনেসাঁস সম্পর্কে এঁদের জ্ঞানগম্যি খান তিন চার সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বইএর উপর নির্ভরশীল। অন্ততঃ উল্লেখপঞ্জী দেখে তাই মনে হয়। অন্য পক্ষে ইতিবাদী রেনেসাঁস ভাষ্যকাররাও দলে বেশ ভারি। রেনেসাঁস এঁদের অনেকের কাছেই আচমনীয়। গঙ্গাজলের মত। ওঁ রেনেসাঁস, ওঁ রেনেসাঁস না বলে এঁদের অনুবর্তীরা আধুনিক কালের কোন বঙ্গীয় আলোচনাতেই প্রবেশ করতে চান না। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে তাঁরাও অনেকেই রেনেসাঁস সম্পর্কে আবছা একটা ধারণা নিয়েই কাজ সারেন। দু'পক্ষের সমতুল অজ্ঞতার মধ্যে যে দু'একজন ভাষ্যকার পরিব্যাপ্ত অধ্যয়ন ও তৌলন জিজ্ঞাসা দিয়ে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের আলোচনাকে যথার্থই সমৃদ্ধ করেছেন শিবনারায়ণ রায় নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

দুপক্ষের ভাষ্যকাররা আগাম জানিয়ে দেন ইতালীয় বা ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে বঙ্গীয় ব্যাপারটির তৌলন আলোচনা চলতে পারে না। এ বিষয়ে শিবনারায়ণের মতটি প্রণিধান যোগ্য, 'ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের উদাহরণকে স্মরণে না রেখে রেনেসাঁস সম্পর্কে আলোচনা অন্তঃসারহীন।' (পৃঃ ৩৫) তাঁর 'রেনেসাঁস' নামাঙ্কিত প্রথম প্রবন্ধটি প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের হিস্টরিয়োগ্রাফি। রেনেসাঁস নিয়ে আমাদের ভাষ্যকারদের জ্ঞান এতই স্বল্প ও একমাত্রিক যে বলবার কথা নয়। অথচ বিষয়টি ঘিরে দেশে দেশে চলেছে নিরন্তর আলোচনা। নানা উদ্ঘাটন ও নানা তত্ত্বের সমাবেশে রেনেসাঁস একটি অসম্ভব গভীর ও জটিল ইতিহাস তত্ত্বে পরিণত। শিবনারায়ণ রায় বাঙালী পাঠকদের জন্য দ্রুতটানে তার একটা মানচিত্র এঁকে দিয়েছেন। একটি নিবন্ধের দৈর্ঘ্যে এই পরিব্যাপ্ত কাজটি বিলাতের রেনেসাঁস বিশেষজ্ঞরা ক'জন তুলে আনতে সাহস করতেন জানিনা তবে আমাদের ছুঁৎমার্গী বা সিলেবাস মনস্ক রেনেসাঁস মাস্টাররা যে পারেননি তা ত দেখাই যায়। নিবন্ধটি থেকে পাঠকরা একটা আন্দাজ পাবেন রেনেসাঁস বিষয়ে কতরকম মতামতের তরঙ্গ সেখানে বইছে। তবে দ্রুততার জন্যই হোক, আর অ-মুক্ত পক্ষপাতের জন্যই হোক, এই টানটান আয়োজনের মধ্যেও কিছুটা শিথিলতা, কিছু গুরুত্বপূর্ণ মতামতের অনুল্লেখ

ও মতবিশেষকে বাড়িয়ে কমিয়ে দেখানোর ব্যাপার ঘটেছে। দু একটা উল্লেখ করি। বুর্খহার্ডট থেকে কাসিরার, ভাসারি থেকে ক্রিস্টেলার, মার্টিন থেকে ব্যারন বিভিন্ন জনের রেনেসাঁস-তত্ত্ব তিনি এনেছেন, কিন্তু অ্যাণ্টনি মালহো তাঁর সম্পাদিত 'সোশ্যাল অ্যাণ্ড ইকনোমিক কাউণ্ডেশন অব ইটালিয়ান রেনেসাঁস'[১৫] গ্রন্থে দেখিয়েছেন, শহরের উদীয়মান ধনিক শ্রেণী তাঁদের সৌভাগ্য ফেরানোর নাগরিক পথপদ্ধতি অনুসরণ করলেও কৃষিকার্যেও তাঁরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করতেন। গ্রামে তাঁরা ভিলা বানাতেন। অনেক সম্পন্ন বুর্জোয়াই সপরিবারে বছরে তিন চার মাস কাটাতেন সেখানে। অর্থাৎ গ্রামীণ অর্থনীতি ও জীবন ব্যবস্থার সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক চুকে বুকে যায় নি। ফ্রেডরিক অ্যাস্তাল বলেছেন রেনেসাঁসের বহু বিখ্যাত চিত্রে কৃষিক্ষেত্র ও গ্রামীণ জীবনের যে পরিব্যাপ্ত পরিপ্রেক্ষিত দেখা যায়, তা নিতান্ত তাৎপর্যহীন নয়।[১৬] এই তথ্যটি বঙ্গীয় রেনেসাঁসের পক্ষে খুবই প্রাসঙ্গিক, কারণ আমাদের রেনেসাঁস ভাষ্যকাররা অনেক দিন ধরে একটা ভুল কথা বলছেন: চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে সম্ভাব্য বুর্জোয়ারা জমিদার হয়ে গিয়েছিল তাই এখানে রেনেসাঁস হওয়া সম্ভব নয়।[১]

ধর্মীয় ব্যাপার-স্যাপার যে নস্যাৎ করে রেনেসাঁস যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমুখী সভ্যতার পথ প্রস্তুত করেছিল, বেইল-এর এই মত শ্রী রায় এনেছেন, কিন্তু ভিনসেন্ট ক্রোনিন তাঁর 'ফ্লাওয়ারিং অব দ্য রেনেসাঁস'[১৮] বা ডগলাস বুশ 'রেনেসাঁস অ্যাণ্ড ইংলিশ হিউম্যানিজম' গ্রন্থে দেখাতে চেয়েছেন, 'রেনেসাঁসে আসলে জয় হয়েছিল ক্রিশ্চিয়ানিটির'[১৯]। মানি মানি আর না মানি, মত হিসাবে এ ত কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

শ্রী রায় রেনেসাঁসকে যেভাবে প্রগতিশীল মুক্তি-প্রকল্পের যুক্তিময় সূচনা-যুগ হিসাবে তুলে ধরেছেন, রেনেসাঁসের সাম্প্রতিক ব্যাখ্যা ও ভাষ্য কিন্তু ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই।[২০] হিউম তাকে 'সভ্যতা ও বিজ্ঞানের উষাকাল' বলে বর্ণনা করলেও হুইজিঙ্গা তাকে 'অয়েনিং অব দ্য মিডল এজেস' বলে চিত্রিত করছেন। ওয়াল্টার উলম্যান 'মিডিয়াভ্যাল কাউণ্ডেশন অব দ্য রেনেসাঁস হিউম্যানিজম', এল. এল. স্নাইডার 'দ্য মেকিং অব মডার্ণ ম্যান', ফার্গুসন 'ফ্যাসেটস অব দ্য রেনেসাঁস' গ্রন্থে বলেছেন, রেনেসাঁস হচ্ছে মধ্যযুগ থেকে আধুনিকযুগে উত্তরণের পথে বিমিশ্র মধ্যান্তর মাত্র।[২১] 'রেনেসাঁস হিউম্যানিজম' দাঁড়িয়েছিল 'between mediova scholasticism and eighteenth century rationalism'.[১২] কেউ কেউ আরও একধাপ এগিয়ে মরণঝাঁপ দিয়ে বলেছেন 'there was no such thing as Renaissance'[১৩] আনি, আর না আনি, এ সব আত্মঘাতী কথাবার্তা কিন্তু রয়েছে। কিন্সম্যান একটি বই লিখেছেন যার নাম 'দ্য ডার্কার ভিসন অব দ্য রেনেসাঁস।[১৪]

বুর্খহার্ডট আধুনিক রেনেসাঁস আলোচনার পথিকৃৎ, কিন্তু তাঁর একটা দুর্বলতা ছিল; ব্যক্তিত্বের মুক্তির দিক থেকেই ব্যাপারটিকে তিনি দেখেছিলেন; তার কোনও আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত তিনি দেন নি। পরবর্তীকালে মার্টিন ভন, হ্যানস ব্যারণ, অ্যাস্তাল, লুইস স্পিংজ, এঙ্গেলস এই স্বয়ম্ভু রেনেসাঁস তত্ত্বের দুর্বলতা দূর করে বলেন, রেনেসাঁস হচ্ছে বাণিজ্যিক ধনতন্ত্রের প্রত্যুষ ফসল।[১৫] শ্রী রায় রেনেসাঁসের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত মানতে নারাজ। মার্কসবাদ সম্পর্কে 'র‍্যাডিকাল' বিতৃষ্ণার কারণেই হয়তো তিনি 'আপনাতে আপনি বিকশি'-ধরনের অব্যাখ্যাসম্ভব মনস্বিতার তত্ত্বে রেনেসাঁসকে দেখতে চান। প্রসঙ্গতঃ লোপেজ-মিসকিমিন যে 'ইকনোমিক ডিপ্রেশনে'র[১৬] তত্ত্ব এনেছিলেন সে কথা এনেছেন তিনি। কিন্তু লোপেজ তাঁর 'হার্ডটাইমস অ্যাণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট ইন কালচার' নামক বিস্ফোরক নিবন্ধে শুধু অর্থনৈতিক দুর্গতির কথাই বলেন নি, গুণগত অগ্রগতির কথাও বলেছিলেন, 'সঙ্কুচিত বাজার, অল্পতর লাভ ও তীব্র প্রতিযোগিতার কারণে ইতালির বাণিজ্যিক দুনিয়ায় যুক্তিগ্রাহ্য ও উন্নততর পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায় যার ফলে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এমন একটা গুণগত ঔৎকর্ষ দেখা যায় যা ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপীয় অর্থনীতির সম্প্রসারিত ও পরিমাণগত ঔৎকর্যকে অতিক্রম করতে সমর্থ হয়।'[১৭] অবশ্যই এতে 'অর্থনৈতিক মন্দা' ও 'অর্থনৈতিক সুবর্ণযুগ'-এই দুই তত্ত্বের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের চেষ্টা ছিল, কিন্তু জোর তেমন ছিল না। যাইহোক, রেনেসাঁসের মত যুগান্তকারী ব্যাপারকে সামাজিক কার্য-কারণ-নিরপেক্ষ হিসাবে দেখানো মানে তো বুর্খহার্ডটীয় রেনেসাঁস-প্রকল্পের প্রাথমিক দুর্বলতায় ফিরে যাওয়া।

'বাংলার রেনেসাঁস' নিবন্ধটির মধ্যে লেখক খুব জোর দিয়ে বলেছেন, উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের প্রথম পাদ জুড়ে বাংলায় যা হয়েছে তাকে রেনেসাঁস আখ্যা দেওয়া অসংগত নয়। যে সব ত্রুটির কারণে নেতিবাদী ভাষ্যকাররা তাকে বাতিল করতে চান, সে সব ত্রুটি ইতালীয় রেনেসাঁসেও ছিল। সর্বোদয় জাতীয় কোনও ব্যাপার সেখানে ঘটেনি;

অংশ গ্রহণকারী ও ফলভোগী সেখানেও ছিল মুষ্টিমেয়; রাজনৈতিক স্বাধীনতা রেনেসাঁসের শর্ত বা 'ক্যাচওয়ার্ড' নয়; নগর সভ্যতার পটভূমি ছাড়া রেনেসাঁস অকল্পনীয়; জিজ্ঞাসা, কল্পনা, উদ্ভাবনা যাঁদের মধ্যে প্রবল, তাঁদের কেন্দ্রীয় ভূমিকাই রেনেসাঁসের স্রষ্টা। তিনি বলেছেন, বাংলাতে রামমোহনের মধ্যে নতুন ব্যক্তিত্বের প্রথম প্রকাশ ঘটে (গ্যারিন যাকে বলেছেন, 'নিউ টাইপ অব ম্যান'[১৮])। 'উনিশ শতক জুড়ে এবং বিশ শতকের প্রথমাংশেও এই ধরনের বহুসংখ্যক ব্যক্তিত্বের সমাবেশ বাংলার রেনেসাঁসকে অর্থবহ করে।' (পৃ. ৪৫) 'ইতালীয় মানসের প্রকাশ ঘটেছিল মুখ্যতঃ চিত্রকলায়, বাঙালি মানসের মুখ্যতঃ কবিতা ও কথা সাহিত্যে।' (পৃ. ৪৭) ইতালীয় রেনেসাঁসের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে 'হত ইতি গজ:'র মতো করে সুশোভন সরকার এক ছত্রের একটি সতর্কবাণী এনেছিলেন তাঁর গ্রন্থের সংযোজনী অংশে। তা হয়তো কারও নজরেও পড়েনি। শিবনারায়ণ রায়ই প্রথম এতটা স্পষ্ট করে বাঙালি পাঠকের কাছে সেই রেনেসাঁস সম্পর্কে ইউটোপীয় ধারণা ভেঙে দেবার চেষ্টা করেছেন।[১৯] কিন্তু এর সঙ্গে যে ধরনের সহায়ক তথ্য দেওয়া প্রয়োজন ছিল তা তিনি দেননি। বিনয় ঘোষ সহ অনেকেই বলেছেন রেনেসাঁস হওয়া সত্ত্বেও বাংলার গ্রাম ও অধিকাংশ মানুষ যে তিমিরে সেই তিমিরে থেকে গেল।[২০] কিন্তু কী হয়েছিল ইতালিতে? জে. আর. হেল-এর গ্রন্থ অনুসারে শ্লোগানটা এইরকম: 'নো সিটি, নো রেনেসাঁস'।[২১] জেরোম ব্লাম জানাচ্ছেন, শতকরা তেরো ভাগ মানুষ ইতালিতে তখন শহরবাসী।[২২] তাহলে বাকি সাতাশি ভাগ মানুষ ইত্যালিতেও রেনেসাঁসের বাইরে ছিলেন। শহরেই কি সকলে আলোকপ্রাপ্ত ছিলেন? পি. জি. জোনস ও ব্রুকারের গবেষণা আমাদের জানাচ্ছে, খোদ ফ্লোরেন্সে সমাজ বিজ্ঞাসের অন্তত চারটি থাক ছিল। শ্রমজীবী মানুষরা সেখানে দুটি বস্তি এলাকায় দুঃসহ অবস্থায় দিন কাটাতেন।[২৩] ই. আর. চেম্বারলিন তাঁর 'এভরিডে লাইফ ইন রেনেসাঁস টাইম'[২৪] গ্রন্থে গ্রামের কৃষিজীবী মানুষের যে ছবি দিয়েছেন তাতে মর্মাহত না হয়ে পারা যায় না। এসব জানাতে পারলে নেতিবাদী রেনেসাঁস ভাষ্যকারদের অনুগামীরা অবশ্যই নড়ে চড়ে বসতেন। শুধু তত্ত্ব কথায় চিঁড়ে ভেজে না। তথ্য দিতে হয়। আমি শিবনারায়ণ রায় বলছি বললেই লোকে মানবে না।

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করতে গিয়ে শ্রীরায় এমন কিছু কথা বলেছেন, যা থেকে মনে হয় রেনেসাঁস সম্পর্কে ইউটোপীয় ধারণা থেকে তিনিও সম্পূর্ণ মুক্ত নন। 'বঙ্গীয় রেনেসাঁসের অন্যতম প্রধান বৌদ্ধিক ত্রুটি হল তার প্রবক্তারা কেউই ধর্মীয় এবং শাস্ত্রীয় প্রাধিকার থেকে দর্শন জিজ্ঞাসা ও নৈতিকতাকে সুস্পষ্টভাবে মুক্ত করার প্রয়াস পাননি।' (পৃ: ৫৩) রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ সকলেরই এই ত্রুটি ছিল। এর ফলে, তাঁর মতে, বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও মননশীলতার তেমন বিকাশ ঘটতে পারেনি। রেনেসাঁসকে যতটা ধর্মবিযুক্ত ব্যাপার বলে মনে করা হয় আসলে কিন্তু তা ছিল না। পেত্রার্কা থেকে এরাজমুস সকলেই ছিলেন গভীর ভাবে ধর্ম বিশ্বাসী। তাঁরা চার্চের সমালোচনা করেছিলেন কিন্তু চার্চকে পরিত্যাগ করেন নি। ইতালীয় রেনেসাঁসে সেকুলারিজমের আন্দোলন ও তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু কথা একটি বিতর্ক প্রসঙ্গে একবার উঠেছিল (দ্রঃ চতুরঙ্গ, বর্ষ ৫২ সংখ্যা ৯ জানুয়ারী ১৯৯২, পৃঃ ৭৬০-৭৬৭)। তার পুনরুক্তি না করে রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের জনক পেত্রার্কার জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনার কথা উল্লেখ করি। ৮ এপ্রিল, ১৩৪১। পেত্রার্কাকে রোমে রাজকবি হিসেবে বরণ করা হয়। রাজসিক সেই অভিষেক দৃশ্য। নৃত্যগীত মণ্ডিত সেই আসরে অভিজাত সভাসদদের উপস্থিতিতে ওরসো কবির মাথায় পরিয়ে দিলেন লরেল পাতার মুকুট। অনুষ্ঠান শেষ হবার পর পেত্রার্কা প্রথম যেখানে গেলেন সেটা সেণ্ট পিটার গির্জা। সেখানে গিয়ে 'হিউম্যানিজমের জনক' কী করলেন, তা তাঁর জবানীতে শোনা যাক—'I hung my crown before the alter in gratitude of God'[২৫] 'প্রিন্স অব হিউম্যানিটিজ্' নামে খ্যাত এরাজমুসের সম্পাদিত নিউ টেস্টামেণ্ট পড়ে ধর্মনেতা লুথার তো লিখেই ফেললেন 'তিনি আমাদের আশা ভরসা'।[২৬] সুতরাং রামমোহন-রবীন্দ্রনাথের ধর্মীয় অনুষঙ্গ নিয়ে বিব্রত হবার কিছু নেই, বুঝতে হবে তার চারিত্র্য। রামমোহন, বিদ্যাসাগর এঁরা শাস্ত্রকে যুক্তিশোধিত করেন নি (স্কলাস্টিসিজম যা করে), মানবিক যুক্তির প্রয়োজনে শাস্ত্রকে এনেছিলেন (হিউম্যানিজমের যা মূল লক্ষণ)। সকলেই অবশ্য তা করেন নি। যাঁরা করেননি তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

যুক্তিবাদ, মননশীলতা, বিজ্ঞানবুদ্ধির অ-বিকাশ নিয়ে প্রশ্ন অবশ্যই উঠতে পারে, তার আগে দেখতে ত হবে রেনেসাঁসে ব্যাপারটা কী অবস্থায় ছিল। স্টিলম্যান ড্রেক, ডবলু. পাউলি, ডবলু. পি. ডি. উইটম্যান, এইচ. বাটারফিল্ড, এল.

এল. স্নাইডার এঁরা আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাস বা রেনেসাঁস আমলে বিজ্ঞানের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে যা লিখেছেন, তা খুব বড় মুখ করে বলবার মতো নয়।[২৭] ড্রেক বলেছেন আধুনিক বিজ্ঞানের 'প্রাইম মুভার' হচ্ছেন গ্যালিলিও। গ্রীক সভ্যতা থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিজ্ঞানের ইতিহাসে কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। স্নাইডার স্পষ্ট করেই লিখেছেন 'On Science the humanistic impulse was negligible'[২৮] 'বুকিশ' হিউম্যানিস্টরা বলেছিলেন, অতীতের দিকে ফিরে তাকাও, বিজ্ঞান বলেছে অতীত নয়, তাকাতে হবে বস্তুবিশ্বের দিকে। মঁতেন বলেছিলেন, অন্তর্গত শক্তি বা বোধের চর্চা মানুষকে মহত্তম করবে; বেকন বললেন, বাইরের প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে জয়ী হবে মানুষ। বিজ্ঞানের প্রবক্তারা বলতেই পারতেন, হিউম্যানিস্টরা বিজ্ঞানের পথে প্রতিক্রিয়া বা বাধা সৃষ্টি করেছেন মাত্র। হিউম্যানিজমের পথ এড়িয়েই তাকে এগোতে হয়েছে।[২৯] আসলে রেনেসাঁসে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল এটা একটা অমূলক ধারণা। তবে হ্যাঁ, রেনেসাঁস মানুষকে অসম্ভব আত্মবিশ্বাসী ও প্রত্যয়শীল করেছিল; তা না হলে সে শাস্ত্রসাঁটা জামার নিচে শান্তিতে শয়ান থেকে যেতো; পর্যবেক্ষণ ও নব নব আবিষ্কারের দিকে এগোতেই পারতো না। রেনেসাঁসে আমেরিকা আবিষ্কার অবশ্যই একটা যুগান্তকারী ঘটনা। কিন্তু 'সায়েন্স অ্যাণ্ড দ্য রেনেসাঁস' গ্রন্থের লেখক উইটম্যান লিখছেন, 'America was discovered not by the aid of the new Science, but by the old virtues of courage, faith and cousumate seamanship'[৩০] কোনও পূর্বনির্ণয় এখানে কাজ করেনি। নির্ধারিত স্থানের পরিবর্তে অন্ততঃ একহাজার মাইল পশ্চিমে নেমেছিলেন অভিযাত্রীরা। চিকিৎসাবিজ্ঞানের অবস্থা তখন কেমন ছিল সেবিষয়ে একটা গল্প বলে প্রসঙ্গ শেষ করব। পোপ ষষ্ঠ আলেকজাণ্ডার-এর পুত্র সিজার বর্গিয়া একবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। দেশের সেরা চিকিৎসকরা তাঁর অসুখ সারানোর জন্য বরফভর্তি জারে দিনকয়েক গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখার নির্দেশ দেন। অসম্ভব জীবনীশক্তির অধিকারী ছিলেন বলে সিজার সে যাত্রা বেঁচে যান। তবে বরফে ডুবিয়ে রাখার জন্য তাঁর গায়ের চামড়া বলতে কিছু অবশিষ্ট ছিল না।[৩১] শোনা যায় অসুখটির নাম ছিল ম্যালেরিয়া। ত এই ছিল রেনেসাঁসের কালে 'বেস্ট পসিবল ট্রিটমেন্ট'। লিওনার্দো দ্য ভিনচি মারা গেছেন এই জ্ঞান নিয়ে যে পৃথিবী স্থির, সূর্যই তার চারদিকে ঘুরছে। সুতরাং বঙ্গীয় রেনেসাঁসে বিজ্ঞান বুদ্ধির অ-বিকাশ নিয়ে বিচলিত হবার কোনও মানে হয় না। শ্রীরায় আক্ষেপ করেছেন, ডিরোজিয়ানদের মধ্যে লক, হিউম জাতীয় দার্শনিক দেখা দেননি। ঠিকই। কিন্তু ইউরোপে রেনেসাঁস শুরু হবার কতদিন পরে লক, হিউম, ভলতেয়ারকে পাওয়া গিয়েছিল সে কথাও ত খেয়াল রাখতে হবে। জাবারেলার মধ্যে দর্শন ও বিজ্ঞান বুদ্ধির যে ঝঙ্কার পাওয়া যায় অক্ষয় দত্ত তার তুলনায় কম কি সে! তা ছাড়া দর্শনবিদ হিসাবে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও 'লোকায়ত'র লেখক সত্যপ্রসাদ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের দান পম্পোনাজ্জি বা জাবারেলার কথা স্মরণ করায়। ভাষাবিজ্ঞানী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও উদ্ভিদবিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর নাম মনন ও বিজ্ঞান চর্চায় অবশ্যই স্মরণীয়।[৩২] বিজ্ঞানে মানবিক দৃষ্টি ফোটাতে না পারলে জগদীশ বসু কি দেখতে পেতেন গাছেরও প্রাণ আছে? বাংলায় রেনেসাঁস-আলোচনায় শিবনারায়ণ রায়ের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা স্বীকার করেও বলি তাঁর সঙ্গে সর্বত্র একমত হওয়া যায় না। তাঁর প্রতিটি নিবন্ধেই আছে এই ধরনের অসম্ভব তর্কযোগ্য ও চিন্তা উদ্রেককারী বৌদ্ধিক চ্যালেঞ্জ। আশা করি বাংলাদেশের পাঠকরা খোলামনে সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবেন। জানিনা বাংলাদেশের নরম মাটিতে শিবনারায়ণের এই গুরুভার মাণ্টিস্টোরিজ বিল্ডিং কতটা স্থাপনযোগ্য বিবেচিত হবে। শিবনারায়ণের রেনেসাঁস ভাবনা নিয়ে সাধ্যমত পর্যালোচনা করা গেল। অধিক অগ্রসর হতে পারলাম না। কেননা ইতোমধ্যেই 'চতুরঙ্গে'র মূল্যবান পৃষ্ঠার যে অপব্যয় ঘটিয়েছি তাতে তার নির্বাহী সম্পাদক হয়তো আমাকে বধ্যভূমিতে নিতে চাইবেন। আপাতত সেটা আমার খুব কাম্য নয়। তা ছাড়া বিশিষ্ট 'মানবতন্ত্রী' শিবনারায়ণ রায়ের গ্রন্থ সমালোচনা করতে গিয়ে এরকম একটা অমানবিক কাণ্ড ঘটবে—সেটাও ভালো ঠেকে না। সুতরাং অলমিতি।

॥ উল্লেখ পঞ্জী ॥

১. J. N. Sarkar, *The History of Bengal*, Vol-II, The University of Dacca, 1948, PP. 497-499

২. বিনয় ঘোষ, **বাংলার নবজাগৃতি**, ২য় সং, ১৯৭৯, পৃঃ ১৬২

৩. গোপাল হালদার, **শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ**, ১৯৮৫, পৃঃ ১১১-১১৬

৪. Sumit Sarkar, *A Critique of Colonial India*, 1985, P. 13

৫. A. Malho (ed). *Social and Economic Foundation of Italian Renaissance*, U.S.A. 1969

৬. F. Antal, *Florentine Paintings and its Social Background*, London, 1947

৭. শক্তি সাধন মুখোপাধ্যায়, "ইতালীয় রেনেসাঁসের আর্থ-সামাজিক ভিত্তি" সমাজ সমীক্ষা, পঞ্চম বর্ষ : ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৯২

৮. V. Cronin, *The Flowering of the Renaissance*, London, 1964 'The Christian faith still came first'

৯. D. Bush, *Renaissance and English Humanism*, Canada, 1939

তাঁর মতে হিউম্যানিজম হচ্ছে : 'medieval fusion of classical wisdom with Christian faith.'

১০. J. Hu'zinga, *The Waning of the Middle Ages*, 1948 ; W. Ullm'n, *Medieval Foundation of the Renaissance Human'sm*, London, 1977 ; L. L. Snyder, *The Making of Modern Man from Renaissance to the present*, New York, 1967 ; W.K. Ferguson (ed), *Facets of the Renaissance*, California, 1954

১১. W. K. Ferguson, 'The Reinterpretation of the Renaissance' ibid

'The Renaissance, it seems to me, was essentially an age of transition, containing much that was still medieval, much that was recognizably modern'.....

১২. L. L. Snyder, ibid, P. 46

১৩. O. Prescott, *Princes of the Renaissance*, London, 1969, P. 30, বক্তব্যটা প্রিসকোটের নয়, অন্যের বক্তব্য তিনি উল্লেখ করেছেন। কার বক্তব্য বলেন নি।

১৪. R. S. Kinsman (ed), *The Darker vision of the Renaissance*, California, 1974 ; Harry Levin, '*The Myth of the Golden Age in the Renaissance*' New York, 1969. লেভিন লিখেছেন, 'the mythical golden age would have been the absolute antithesis of the Renaissance in several important respects...Most ironically, it had little use of knowledge.' কী সাংঘাতিক কথা!

১৫. A.M. Von, *Sociology of The Renaissance* (Tran), England 1944...'prelude to the Bourgeoise.', H. Baron, *The Crisis at The Early Italian Renaissance*, 2 Vols, 1955 ;

L. W. Spitz, *The Renaissance and the Reformation Movement*, Chicago, 1971 ; Marx & Engels, *Communist Manifesto*, 1st Italian edition, Introduction, 1.2. 1893

১৬. R. S. Lopez & H. S. Miskimin, *The Economic Depression of the Renaissance* The Economic History, Vol XIV, 1962

—'after 1348 the Italian Economy entered upon an unchecked downward spiral for several centuries.'

১৭. R, S. Lopez, *Hard Times and Investment in Culture / The Renaissance : A Sympossium*, New York 1953

—'resulting in a qualitative advance in the evolution of capitalism much greater than '

১৮. E. Garin, *Science and Civic life in the Italian Renaissance*' (Tran by P. Munz) U. S. A, 1969

১৯. এ বিষয়ে একটি তথ্যভিত্তিক নিবন্ধ : 'ইতালীয় রেনেসাঁসের কয়েকটি কয়েকটি মিথ' 'পঃ বঙ্গ ইতিহাস সংসদ-এর অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনে (১৯৯১) পেশ করেছিলাম। **'ইতিহাস অনুসন্ধান' ৭ম খণ্ড** দ্রষ্টব্য।

২০. বিনয় ঘোষ, তদেব, পৃঃ ১৭৬

২১. J. R. Hale (ed) *A Concise Encyclopaedia of the Italian Renaissance*, G. B., 1981

২২. J. Blum, *The European Peasantry from the Thirteenth century to the Nineteenth century*. Publication No. 33, Service center for Teachers of History, The American Historical Association, Washington, 1966.

২৩. P. J. Jones, *Florentine Families and Florentine Diaries in the fourteenth century* Papers of the British School at Rome, XXIV, (N.S. Vol XI.) ; G. A. Brucker, 'The Pattern of Social Change : The Florentine Politics and Society, Princetoon, 1962

২৪. E. R. Chamberlin, *Everyday life in Renaissance Times*, G. B. 1965, Chap-IV, The Common Man.

২৫. W. Rospigliosi, *Writers in the Italian Renaissance, London*, 1978, P.P. 200-01

২৬. R. H. Bainten, *Here I Stand : A Life of Martin Luther*, U.S.A.

২৭. C. S. Singleton (ed), *Art, Science and History in the Renaissance*, U.S.A, 1967 Article of Stillman Drake, 'Mathematics, Astronomy and Physics in the work of Galileo' ; W. P. Wightman, *Science and the Renaissance*, Vol.1, London, 1962 ; H. Butterfield, *Origins of the Modern Science*, 1949 ; L.L. Snyder, Ibid.

স্নাইডারের মতে 'হ্যামানাইজম' অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে 'the final key to the problem of mankind' তে পরিণত হয়নি।

২৮. L. L. Snyder, ibid, P. 48

২৯. D. Bush, Ibid, PP. 92-94
৩০. W. P. D, Wightman, Ibid, P. 133
৩১. O. Prescott, Ibid. PP. 48-50
৩২ জগদীশচন্দ্র বসুর নাম রেনেসাঁস প্রসঙ্গে বেশ গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করেছিলেন অমলেশ ত্রিপাঠী একটি নিবন্ধে। *'Bengali Culture: The 19th Century Renaissance'*—The Statesman, January 7, 1990.

মুর্শিদাবাদ জেলার রাজনৈতিক আন্দোলন

আলাউদ্দীন আহমদ

এক সময়ে বাংলাদেশের ইতিহাস বইএর অভাব দেখে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করে লিখেছিলেন, "বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই, যাহা আছে তাহা ইতিহাস নয়···বাঙ্গালীর ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গলার ভরসা নাই।" আজ বুঝি বঙ্কিমচন্দ্রের দুঃখের দিন শেষ হয়েছে। গত একশত বছর ধরে দেশী-বিদেশী বহু গবেষকের গবেষণার ফলে বাংলাদেশের ইতিহাস আজ সহজলভ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের বহু আগেই বিদেশী ভাষায় বাংলার ইতিহাস লেখা শুরু হয়েছিল। ১৭৬৩-৬৪ সালে সলিমুল্লা সংকলন করেছিলেন, 'তারিখ-ই-বঙ্গাল', ১৭৮৮ সালে গোলাম হুসেন সলীম রচনা করেছিলেন, 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন', প্রত্যক্ষদর্শী গোলাম হুসেন তবাতই লিখেছিলেন, 'সিয়র-উল-মুতাখরিন'। ১৮৯৩ সালে ইংরাজিতে লেখা হয়েছিল The History of Bengal from the first Mohammedan conquest of that country by the English A.D. 1757 লেখক ছিলেন Charles Stewert, Outline of the History of Bengal (1838) লেখক : John Clark Marshmnn। তবে বাংলা ভাষায় বাংলাদেশের ইতিহাস প্রথম লিখেছিলেন ১৮৪০ সালে গোবিন্দ চন্দ্র সেন, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস'। তারপর থেকে বাংলা ও ইংরাজি ভাষায় বহু বাংলা দেশের ইতিহাস লেখা হয়েছে, H. Blochmann-এর Contributions to the Geography and History of Bengal: Mahommedan Period 1203-1538 শশীচন্দ্রের Ancient World', 'Modern World' এবং 'Bengal' নামে তিনটি বই; রজনীকান্ত গুপ্তের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস', অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র 'গৌড়ের কথা' এবং আরও হাল আমলে লেখা হয়েছে Bengal under Akbar and Jahangir লেখক : তপন কুমার রায় চৌধুরী, 'আড়াই হাজার বছরের বাঙালী ১ম খণ্ড' : কালীপদ সমাদ্দার, 'বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস' : ধনঞ্জয় দাশমজুমদার, 'বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর' : সুখময় মুখোপাধ্যায় এবং চারখণ্ডে প্রকাশিত আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'বাংলাদেশের ইতিহাস' ও নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব' সর্বজন পরিচিত। আঞ্চলিক বা জেলাভিত্তিক ইতিহাসও অপ্রতুল নয়, সতীশচন্দ্র মিত্রের 'যশোর খুলনার ইতিহাস' এবং সুধীর কুমার মিত্রের 'হুগলী জেলার ইতিহাস' এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে।

আমাদের দেশের ইতিহাসে মুর্শিদাবাদের গুরুত্ব সামান্য নয়। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের রাজধানী, মুজফ্ফরশাহ শিষ্য চীরাগ আলীর কর্মক্ষেত্র বহরমপুরের সিপাহী বিদ্রোহ কিংবা রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা গুরু গোলওয়াল-কারের শিক্ষাস্থান হিসাবেই শুধু নয় স্বাধীন ভারতের পশ্চিম-বঙ্গের একমাত্র মুসলমান প্রধান জেলা হিসাবেও মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব যথেষ্ট। মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রিক ইতিহাস গবেষণাও অজ্ঞাত নয়। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'নীরকাসিম', তপন চট্টোপাধ্যায়ের 'পলাশীর যুদ্ধ' ও 'পলাশী থেকে বক্সার' এবং নিখিল নাথ রায়ের 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' বহুল পঠিত।

আলোচ্য বইটিতে মুর্শিদাবাদ জেলার রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। জিয়াগঞ্জের শ্রীপত্‌সিং কলেজের ইতিহাস বিভাগের রীডার ড. বিষাণকুমার গুপ্তর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল ১৯২০-৭৪ সময়কালে মুর্শিদাবাদ জেলার রাজনৈতিক আন্দোলনের গতি প্রকৃতি ও স্বরূপ অনুসন্ধান করা। এই গবেষণাপত্রের জন্য তিনি Ph.D. ডিগ্রী লাভ করেছেন। সর্বমোট ছ'টি অধ্যায়ে (ভূমিকাসহ) তিনি ধাপে ধাপে তাঁর বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণ করেছেন, তথ্য ও যুক্তি দিয়ে শেষ অধ্যায়ে সিদ্ধান্ত টেনেছেন। এছাড়া তিনি মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ত্রিশজন জননেতার সংক্ষিপ্ত জীবনীতথ্য যোগ করে বহু বিস্মৃত ব্যক্তিকে আধুনিক প্রজন্মের কাছে তুলে ধরেছেন, এজন্য ইতিহাস-মনস্ক পাঠক মাত্রই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। বইটির অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে ব্রজভূষণ গুপ্তকে

লেখা নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের একটি চিঠি, জওহরলালকে লেখা সনৎকুমার রাহার চিঠি, সনৎকুমার রাহাকে লেখা জওহরলালের চিঠি এবং মুর্শিদাবাদ জেলাশাসকের গোপন প্রতিবেদনের অনুলিপি। মুর্শিদাবাদ জেলা কৃষক সম্মেলনের বেলডাঙ্গায় কৃষক সভার প্রচারপত্রের এবং বহরমপুরের মীরা টকী হাউসে অনুষ্ঠিত মুর্শিদাবাদ জেলা ছাত্রফেডারেশনের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণের প্রতিলিপি এবং আরও দুটি প্রচারপত্রের প্রতিলিপি বর্তমান গবেষণা গ্রন্থের মান বাড়িয়েছে।

ড. গুপ্ত অধ্যায়গুলি সাজিয়েছেন এইভাবে—প্রথম : ভূমিকা ; দ্বিতীয় : কংগ্রেস ও রাজনৈতিক আন্দোলন ; তৃতীয় : বাংলার বিপ্লবীগণ ; চতুর্থ : বামপন্থীগণ ও মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক আন্দোলন ; পঞ্চম : মুস্লীম রাজনীতি ; ষষ্ঠ : সিদ্ধান্ত। ভূমিকায় তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক প্রেক্ষাপটসহ জেলার জনবিন্যাস, শিক্ষার অগ্রগতি এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা ও সাম্প্রদায়িক সমস্যার স্বরূপ বিশ্লেষণের জন্য নানাবিধ যুক্তি, তথ্য, চার্ট এবং সরকারী প্রতিবেদন ব্যবহার করেছেন। ১৯৫১ সালের আদম সুমারী অনুসারে এই জেলার আয়তন ছিল ২০৯৪'৫ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১৭১৫৭৫৯ জন এবং শিক্ষিতের হার খুবই কম—মাত্র শতকরা ছ'জন। মুসলমানদের অবস্থা ছিল আরও খারাপ। স্বাধীনতাপূর্বে এই জেলায় কলেজ ছিল মাত্র একটি—বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজ। ঐ কলেজের রেকর্ড থেকে জানা যায় যে ১৯২০-৪৭ কালপর্বে এই কলেজ থেকে মাত্র ১৪২ জন মুসলমান ছাত্র স্নাতক পরীক্ষায় পাস করেছিল। মুর্শিদাবাদ জেলাকে গঙ্গানদী পূর্ব-পশ্চিম বা রাঢ় ও বাগ্‌ড়ী এই দুই অঞ্চলে ভাগ করে প্রবাহিত। জেলার রাঢ় বা পশ্চিম অঞ্চল হিন্দু প্রধান, পূর্ব বা বাগড়ী অঞ্চল মুসলমান প্রধান। এই দুই সম্প্রদায় ছাড়া খ্রিস্টান, জৈন আদিবাসী ও উপজাতি সম্প্রদায় মুর্শিদাবাদে দেখা যায়। বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের বাসভূমি হওয়া সত্ত্বেও মুর্শিদাবাদ জেলা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গামুক্ত ছিল এবং এর কারণ লেখক পঞ্চম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করেছেন।

বৈকুণ্ঠনাথ সেনের নেতৃত্বে ১৯০৫ সাল থেকেই এই জেলায় কংগ্রেসী রাজনীতির সূচনা দেখা দিলেও ১৯২১ সালের আগে এই জেলায় জেলা কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়নি। লেখক কংগ্রেস আন্দোলনের দুটি ধারা এই জেলায় লক্ষ করেছেন : গান্ধী সমর্থিত অহিংস রাজনৈতিক আন্দোলন এবং কংগ্রেসের মধ্য থেকে বিপ্লবী আন্দোলন। ১৯২০ সাল থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনা আন্দোলনে প্রকাশ লাভ করায় এই জেলায় সামন্ততান্ত্রিক নেতাদের প্রভাব কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয় কিন্তু শিক্ষায় পেছিয়ে থাকার জন্য এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এই জেলায় সব সময় নবাব ও জমিদারদের প্রভাব ছিল অসীম। রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দীর্ঘদিন এই শ্রেণীর হাতেই ছিল সেজন্য ১৯৩৮-এর আগে এই জেলায় কংগ্রেস আন্দোলন জোরদার হয়নি। কংগ্রেসের ঘরোয়া কলহ এবং নবাব জমিদারদের একাংশের অসহযোগিতার ফলে কংগ্রেস আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তবে বামপন্থীদলেও ছিল গোলযোগ। স্বাধীনতার আগে কংগ্রেস, মুসলিম লিগ এবং হিন্দুমহাসভা ছিল মুর্শিদাবাদের প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দল। ড. গুপ্তের একটি মন্তব্য সন্দেহজনক। মুসলমান প্রধান জেলা হওয়া সত্ত্বেও ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির কোন শাখা এই জেলায় ছিল না এবং কারণ হিসাবে তিনি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভাবকেই দায়ী করেছেন, কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় পূর্ববঙ্গের অশিক্ষিত মুসলমান সমাজে হকসাহেবের জনপ্রিয়তার কারণ কি ছিল? এ ক্ষেত্রে বরিশাল ও মুর্শিদাবাদ জেলার তুলনামূলক আলোচনা দিয়ে তিনি বিষয়টা তুলে ধরতে পারতেন। তবে এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম যে এই জেলায় লিগ ও মহাসভার প্রভাব ছিল খুব দুর্বল। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্য তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

বৈপ্লবিক আন্দোলনে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের এক বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। বহরমপুরে অনুশীলন সমিতির শাখাও ছিল। এ প্রসঙ্গে কালীদাস বসু, জিতিব চৌধুরী তারাপদ গুপ্তের নাম লেখক উল্লেখ করেছেন। ইংরেজ সরকারের দমননীতির ফলে এই জেলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন লোপ পায়।

পরবর্তী অধ্যায়ে লেখক তথ্য প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন কেন বামপন্থী আন্দোলন মুর্শিদাবাদ জেলায় শক্তিশালী হতে পারে নি। এ ক্ষেত্রে বামপন্থী দলগুলির জনসংযোগের অভাব এবং পারস্পরিক বিবাদই প্রধানত দায়ী। আর. এস. পি. র সঙ্গে সি. পি. আই বিরোধিতা লক্ষণীয়।

তবে বর্তমান ভারতীয় রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে এই বই-এর পঞ্চম অধ্যায় পাঠক পাঠিকার কাছে গুরুত্ব পাবে বলে মনে হয়।

মুসলমান প্রধান জেলা হওয়া সত্ত্বেও এই জেলা ১৯২০-৪৭ কাল পর্বে কেন সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত ছিল তা লেখক অনুসন্ধান করেছেন। অভিজাত শ্রেণীর প্রধান মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী, আউল বাউল সম্প্রদায়ের প্রভাব, সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের ব্রিটিশ বিরোধী ঐতিহ্য এবং কাজী নজরুল ইস্‌লামের ভূমিকা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ১৯২৩ সালে বহরমপুর জেল থেকে মুক্ত হবার পর থেকে নজরুল ইসলাম হিন্দু পরিবারে বসবাস করতে শুরু করেন এবং জালামরী ভাষায় সাম্প্রদায়িকতা ও ইংরেজশাসনের বিরুদ্ধে লেখালেখি শুরু করেন। মুর্শিদাবাদের তরুণ সমাজে এর প্রভাব হয়ে ছিল সুদূর-প্রসারী। ১৯৩৭ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লিগের বহরমপুর প্রাদেশিক সম্মেলনে মহম্মদ আলী জিন্নাহের উপস্থিতি সত্ত্বেও লিগের প্রভাব মুর্শিদাবাদে ছিল খুবই সামান্য। স্বনামধন্য রেজাউল করীম এবং আব্দুস সামাদ ছিলেন হিন্দু মুসলমান ঐক্যের প্রতীক। তাঁরা ছিলেন পৃথক নির্বাচকমণ্ডলির বিরুদ্ধে যদিও হিন্দু মহাসভার মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী এবং আরও অনেকে ছিলেন এর সমর্থক। করীম সাহেবের নাম আমরা অনেকেই জানি, সামাদ সাহেব আজ বিস্মৃত। বিস্মৃতির অতল থেকে এই দেশপ্রেমিক, অসাম্প্রদায়িক মুসলমান উকীল ও জাতীয়তাবাদী নেতাকে উদ্ধার করে ড. গুপ্ত সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির সমর্থকদের মুখ বন্ধ করেছেন। তিনি হিন্দু মুসলমান যৌথ আন্দোলনের গুরুত্ব স্বীকার করতেন। তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের ভাষণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন কেন মুর্শিদাবাদে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি শক্তিশালী হতে পারে নি। ভারতের স্বাধীনতার জন্য যে হিন্দু মুসলমান ঐক্যের প্রয়োজন সেকথাই তিনি তাঁর ভাষণে প্রচার করেছিলেন, "A true citizen born on the soil of India is he who is actuated by the sentiment of patriotism to see complete understanding arrived at between these great communities living side by side in their resolve to stand firm in order to be benefited by the increasing glimmer of the dawn of India's salvation." অযোধ্যাকাণ্ডের পর এই ভাষণের মূল্য আরও বেড়েছে।

একথাও লেখকের মনে হয়েছে যে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু লোক ছিলেন সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সমর্থক, ফলে অল্প হলেও দু'একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উল্লেখ সমকালীন পত্রপত্রিকা ও প্রচারপত্র থেকে জানা যায়। ১৯৪৬-এর নির্বাচনে লিগের বিজয় আমাদের মনে রাখা উচিত। লেখকের মন্তব্য, "In Murshidabad the nationalist Muslims were defeated by the Muslim League." এ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের দুঃখজনক পরিণতি। এর দায়িত্ব দুই সম্প্রদায়কেই ভাগ করে নিতে হবে। ক্ষমতা হস্তান্তরের দলিল দেখে লেখকের ধারণা হয়েছে যে বাংলা ভাগ করতে ইংরেজদের উৎসাহই ছিল বেশি। একথা অনৈতিকহাসিক। ভারত ভাগের সাথে সাথে বাংলা ভাগ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায় এবং শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। জিন্নাহ, লিগ এবং শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ হিন্দু সমাজের একাংশ এই ভাগের বিরোধী ছিলেন। কংগ্রেসকে সন্তুষ্ট করতে মাউন্টব্যাটেন বাংলা ভাগের দাবি মেনে নিয়েছিলেন। ড. গুপ্ত এ সমস্ত তথ্য উল্লেখ করেননি।

শেষ অধ্যায়ে ড. গুপ্ত যে সব সিদ্ধান্ত করেছেন তার অনেকগুলোর সঙ্গেই আমরা একমত হব কারণ সিদ্ধান্তগুলো তথ্য ভিত্তিক এবং যুক্তিনিষ্ঠ। মুর্শিদাবাদ জেলায় সামন্ত শ্রেণীর প্রাধান্য থাকায় রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল এই শ্রেণীর হাতে, ফলে গণ আন্দোলন এই জেলায় তেমন জোরদার হয়নি। কৃষকসভার প্রভাবও এই জেলায় ছিল নগণ্য। বামপন্থী আন্দোলনের দুর্বলতার জন্য সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও ব্যর্থ হয়। ১৯৪২ সালের ভারত ছাড় আন্দোলনও এই জেলায় গণ-আন্দোলনে পরিণত হতে পারে নি। তবে স্বাধীনতাপূর্ব মুর্শিদাবাদ জেলার রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত রাজনীতি যার ফলে স্বাধীন ভারতে মুর্শিদাবাদের অন্তর্ভুক্তি সহজসাধ্য হয়েছিল। ড. গুপ্তের ভাষায়, "One may say that Murshidabad created a tradition of Hindu-Muslim unity. Murshidabad remained in the Indian Union." (পৃ. ১৬৯) সুতরাং বাঙ্গালির এখনও ভরসা আছে।

বইটির শেষে মুর্শিদাবাদ জেলার রাজনৈতিক মানচিত্র আছে যদিও সেটা খুবই বাজে। বেশ কিছু ছাপার ভুল চোখে পড়ল। কোন কোন সিদ্ধান্ত ও মন্তব্য তথ্য নির্ভর নয়, তবে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি উদার এবং ধর্মনিরপেক্ষ। এই বইটির বহুল প্রচার হলে হয়ত বর্তমান দূষিত রাজনৈতিক

আবহাওয়া পরিশুদ্ধ হবে। আমরা আশা করব ড. গুপ্ত স্বাধীনতা-উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলার রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিচয় দিয়ে তাঁর অনুসন্ধান শেষ করবেন।

পলিটিক্যাল মুভমেন্টস ইন মুর্শিদাবাদ—১৯২০-৪৭—ড. বিষাণকুমার গুপ্ত/মনীষা, কলকাতা ৭৩/আশি টাকা।

ইতিহাসের নানা বিষয়

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

মুঘল অর্থনীতির রূপরেখা

অধ্যাপক জগদীশ নারায়ণ সরকারের 'মুঘল ইকনমি: অর্গানাইজেশন অ্যাণ্ড ওয়ার্কিং' (১৯৮৭) বইটির অনুবাদ 'মুঘল অর্থনীতি: সংগঠন এবং কার্যক্রম'। রাজবৃত্তের ইতিহাস নয়, অর্থনৈতিক সংগঠন এবং কার্যক্রমের আলোচনায় গোটা মুঘল ভারতের শ্রেণী বিভক্ত সামাজিক বিন্যাসের চেহারা-চরিত্র বইটিতে ফুটে উঠেছে। বলা যেতে পারে, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সামাজিক ইতিহাসের দাঁড়া। কৃষি সংগঠন, শিল্প সংগঠন, বাণিজ্য সংগঠন, আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সমসাময়িক নথি এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের বক্তব্যের সূত্র ধরে পর্ব-পর্বান্তরের ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে অধ্যাপক সরকার যে কাঠামো গড়ে তুলেছেন তাতে মুঘল যুগের জনবৃত্তের ইতিহাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এড্‌ওয়ার্ড টমাসের 'রেভেনিউ রিসোর্সেস্ অব দ্য মুঘল এম্পায়ার ইন্ ইণ্ডিয়া ফ্রম এ. ডি. ১৫৯৩ টু ১৭০৭' (১৮৭১) বই থেকে মুঘল যুগের অর্থনৈতিক ইতিহাস চর্চার সূত্রপাত। কিন্তু তা বিস্মৃতির আড়ালে চাপা পড়ে যায়। বিশ শতকের দু-এর দশক থেকে এই বিষয়টির পুনরালোচনা শুরু হয় মোরল্যাণ্ডের তিনটি বইকে কেন্দ্র করে—১. 'ইণ্ডিয়া অ্যাট দ্য ডেথ অব আকবর' (১৯২০), ২. 'ফ্রম্ আকবর টু আওরঙ্গজেব (১৯২৩) এবং ৩. 'দি অ্যাগ্রারিয়ান সিস্টেম অব মোস্‌লেম ইণ্ডিয়া (১৯২৯)। অর্থাৎ "Our knowledge of the Indian economy in the pre-colonial period has, indeed, come a long way since the publication of Moreland's studies." ("প্রিফেস," 'দি কেম্‌ব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া', প্রথম খণ্ড, ১৯৮৪)। পরবর্তীকালের গবেষকগণ মোরল্যাণ্ডের ভ্রান্তি ও কৌশলগুলি অনেকাংশেই মুছে দিয়ে প্রকৃত সত্য প্রকাশের পথ দেখিয়েছেন। এঁদের মধ্যে ইরফান হাবিব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৬২ সালে প্রকাশিত তাঁর 'দি অ্যাগ্রারিয়ান সিস্টেম অব মুঘল ইণ্ডিয়া (১৫৫৬-১৭০৭)' বইটিতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। অধ্যাপক সরকারের বিস্তৃত এবং বিশ্লেষণাত্মক কাজও মুঘল-অর্থনৈতিক ইতিহাস চর্চাকে সমৃদ্ধ করেছে।

বর্তমান আলোচ্য বইটিতে অধ্যাপক সরকার মুঘল যুগে সম্প্রসারিত কৃষিব্যবস্থার পিছনে শাসক শ্রেণীর উদ্যোগের কথা বলেছেন। সেই সঙ্গে আলোচিত হয়েছে চাষের যন্ত্রপাতি, জমিতে সার প্রয়োগ, নানা ধরনের সেচ প্রকল্প সম্পর্কে। কৃষিজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে খাদ্যশস্য এবং বিভিন্ন রকমের অর্থকরী ফসলগুলির উৎপাদন-ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় "যে ভারতীয় কৃষকদের কৃষি উৎপাদন-পরিবর্তনশীলতা তাদের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।" (পৃ. ১২)। উর্বর জমির পরিমাণ অনেক বেশি থাকায় কৃষিকাজে উৎসাহ এবং নতুন নতুন জমিতে পুনর্বাসন, এমন-কি পাইকাস্ত কৃষক-প্রজাদের দ্বারা 'বদলি চাষ' প্রথা গ্রহণ বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। তাঁরা নানা রকম ফল চাষের পাশাপাশি পশুপালনও করতেন। আবার কৃষিজাত দ্রব্য থেকে উৎপাদিত শিল্পপণ্য অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্ব অর্জন করেছিল। কৃষিপণ্য ও শিল্পপণ্যকে কেন্দ্র করে দেশি ও বিদেশি ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে উঠেছিল। মুঘল অর্থনীতির মূল ভিত্তিই ছিল কৃষি। কিন্তু এই বইতে জমির মালিকানা ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তৃত কোনো ব্যাখ্যা নেই। এর প্রয়োজন ছিল। এ ব্যাপারে অধ্যাপক সরকার একটি কৈফিয়ৎ দিয়েছেন—"কৃষি সংগঠন বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জমির মালিকানা ও তৎসম্পর্কিত বিষয় পরিহার করা হয়েছে, কারণ ইরফান হাবিব তাঁর গ্রন্থ **Agrarian System of Mughal India Cambridge Economic History**, vol. 1-এ এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।" অধ্যাপক সরকারের বইতেও কৃষি-শিল্প প্রযুক্তির প্রাসঙ্গিক আলোচনা স্থান পেয়েছে। লোহার লাঙলের ফলা, নানারকমের সেচ ব্যবস্থার মধ্যে চক্রের সাহায্যে সেচের কাজ কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে যুগান্তর এনেছিল; ফলে উৎপাদন বেড়েছিল।

শিল্পোৎপাদনের প্রয়োজনে লাগে এমন কৃষিপণ্য বেশি পরিমাণে উৎপাদিত হওয়ায় শিল্প থেকে অর্থাগমের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। আর শিল্পোন্নয়নের জন্য মুঘল সম্রাটগণ বিদেশি কারিগরও এনেছিলেন। গড়ে তুলেছিলেন রাষ্ট্রীয় কারখানা। এমনও শোনা যায় মুঘল ভারতে শিল্প নিয়ে মাতামাতি হয়েছিল, কিন্তু উদ্যোগের অভাবে শিল্প বিপ্লবের মত আন্দোলন গড়ে উঠল না। ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব হওয়ার পিছনে অধ্যাপক সরকার যুক্তি দেখিয়েছেন—"ভারতীয় তাঁত বস্ত্রের আমদানি ইংলণ্ডের স্বার্থ ব্যাহত করে। স্বার্থরক্ষার তাগিদে ইংলণ্ড নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু করতে বাধ্য হয়। আর এই চিন্তার ফসল ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লব।" এটাই একমাত্র যুক্তি নয়। বড় যুক্তিও নয়। এদেশে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার মত পরিস্থিতিও ছিল না। তবে কৃষিজাত পণ্য ও শিল্পজাত দ্রব্য নিয়ে ব্যবসায়ীরা দেশ-বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। এশিয়া ও য়ুরোপের বণিক সম্প্রদায় "বিশাল এলাকা জুড়ে··· কাজ করাবার চালাত।" য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীদের নথিপত্র থেকে জানা যায়: ভারতীয় ব্যবসায়ীরা উদ্যমী এবং সম্পদশালী ছিলেন। তাঁরা ব্যক্তিগত ও যৌথ ব্যবসায় করতেন। এমন কি "মুঘল সম্রাটের পরিবারের কোন কোন সদস্য যেমন নুরজাহান, আসফ খাঁ ও আরো অনেক মুঘল আমির ওমরাহ জাহাজের মালিক ছিলেন এবং বহির্বাণিজ্যে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করতেন।" (পৃ. ১২১)। সাধারণ স্তর থেকে অভিজাত পরিবারের আতিনা পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারিত হয়েছিল। এটা কম কথা নয়। আবুল ফজল, বার্ণিয়ের, তাভার্ণিয়ের, পেলসার্ট প্রমুখের রচনায় এই সমস্তের সমর্থন পাওয়া যায়। অধ্যাপক সরকার বাণিজ্য-সংগঠন এবং সেই সময়কার আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য সমূহের নিখুঁত বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, মুঘল-ভারতে ধনতান্ত্রিক বিকাশ অসম্পূর্ণ কেন। "যন্ত্র-সমৃদ্ধ শিল্প বিকাশের অভাব সত্ত্বেও ভারতের অর্থনীতি মুদ্রা সমৃদ্ধ ছিল।" (পৃ. ২২৬)। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী বিনিয়োগের কোনো সুযোগ না থাকায় এবং "শুধুমাত্র বাণিজ্যের কারণে মূলধন বিনিয়োগ" (ঐ) হওয়ায় "বাণিজ্য মূলধন শিল্প মূলধনে পরিণত হতে পারেনি।" (ঐ)। অধ্যাপক সরকার এই বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে মার্কসীয় তত্ত্বের যাথার্থ্য প্রমাণ করেছেন। এবং সঙ্গত কারণেই তিনি ভারতীয় অর্থনৈতিক অবস্থার ভাঙন-পতনের জন্য "কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির অনুপস্থিতি" (পৃ. ৩০৮) ও শিল্প মূলধনের অভাবকে দায়ী মনে করেন।

অধ্যাপক জগদীশ নারায়ণ সরকারের বর্তমান বইটি মুঘল অর্থনৈতিক ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অনুবাদ সুন্দর, ঝরঝরে। এ ধরনের অনুবাদ গ্রন্থও নিঃসন্দেহে ইতিহাস-চর্চার সহায়ক হতে পারে।

ইতিহাসের উৎস সন্ধানে

"রাশি-রাশি তামায় পাত বাহির হইতে লাগিল।··· অশোক রাজার কতকগুলি রুবকারী (পাথরের লেখ) বাহির হইল।" (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)। প্রাচীন ভারত ইতিহাসের কয়েকটি হারানো পৃষ্ঠার উদ্ধার সম্ভব হল, কিন্তু ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া গেল না। মাঝে মাঝেই ফাঁক। সাহিত্য, লেখ, উৎখননের ফলে পাওয়া প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান দিয়ে তা ভরাট করার চেষ্টা চলতে লাগল নিরন্তর। সপ্তম শতাব্দীতে বাংলায় শশাঙ্ক দাপটে রাজত্ব করতেন, গড়ে তুলেছেন কর্ণসুবর্ণ রাজধানী যা সেকালের উল্লেখযোগ্য মহানগরী হিসেবে চিহ্নিত; কিন্তু এই মহানগরী-রাজধানীর অবস্থিতি নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, সহজে তার অস্তিত্বের হদিশ মেলে নি। ইতিহাসে এর আলোচনাও অনেকটা খাপছাড়া। কিন্তু সম্প্রতি 'কর্ণসুবর্ণ-মহানগরী: বঙ্গদেশের বিস্মৃত রাজধানী' বইটিতে শ্রীসুধীর রঞ্জন দাশ বিস্তৃত আলোচনা করে সেকালের একটি সার্বিক চিত্র আঁকার চেষ্টা করেছেন। বইটি আটটি পর্বে বিভক্ত—১. নাম নির্দেশনা ও বুৎপত্তি, ২. ভৌগোলিক বিবরণী, ৩. কর্ণসুবর্ণ ও রক্তমৃত্তিকা: বর্তমান স্থান নির্দেশ, ৪. পুরাবৃত্ত, ৫. কর্ণসুবর্ণ ও শশাঙ্ক, ৬. শশাঙ্কের আমলে বঙ্গদেশ, ৭. শশাঙ্ক-উত্তর বঙ্গদেশ এবং ৮. কর্ণসুবর্ণ: অন্তিম পর্যায়।

কর্ণসুবর্ণের উল্লেখ অনেক জায়গায় থাকলেও এর অবস্থান কোথায় ছিল সে সম্পর্কে বহুদিন পর্যন্ত স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয় নি। অবশেষে ১৯৬২ সালে সুধীর বাবুরই প্রযত্নে "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগের তরফে উৎখনন পরিচালিত হয় এবং প্রথম বছরের উৎখননেই অকাট্য প্রত্ননিদর্শন ও নজিরের সন্ধান পাওয়া যায়।" (পৃ. ৯)। কিন্তু 'কর্ণসুবর্ণ' শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে দেশি-বিদেশি পণ্ডিত মহলে নানা মত প্রচলিত। বার্নেট সাহেবের অভিমত, "প্রাকৃত 'কন্নসোনা' হতেই 'কার্ণসোনা' শব্দের ব্যুৎপত্তি হয়েছে।" ভাষাতত্ত্বের নিয়ম অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত অচল প্রতিপন্ন হবে। কারণ, কার্ণ বা কর্ণ সুবর্ণ বা কর্ণসোনা থেকেই 'কন্নসোনা' শব্দটি আসা স্বাভাবিক।

সুধীরবাবু স্বাভাবিক নিয়মটিরই পক্ষপাতী। কিন্তু জায়গাটির নাম 'কর্ণসুবর্ণ' কেন হল সে বিষয়ে জল্পনার অন্ত নেই। "রাজা কর্ণ-প্রতিষ্ঠিত কর্ণপুরের ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যের জন্যই সুবর্ণ বা স্বর্ণ শব্দ যুক্ত হয়ে কর্ণসুবর্ণ নামের উৎপত্তি হয়েছে।" (পৃ. ৬৫)। তবে শশাঙ্ক সম্ভবত কর্ণসুবর্ণের প্রতিষ্ঠাতা নন। কারণ, প্রমাণাভাব। এটি ছিল তাঁর রাজধানী। তেমন প্রমাণ বিস্তর।

দ্বিতীয় পর্বে চৈনিক বিবরণীর বিশ্লেষণ করেছেন লেখক। ফা-হিয়েন, ঈৎ-সিঙ এবং হিউয়েন সাঙের বিবরণীগুলির মধ্যে "কেবলমাত্র হিউএন-সাঙের বিবরণেই কর্ণসুবর্ণ রাজ্য ও রাজধানীর বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়।" (পৃ. ৬৯)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কর্ণসুবর্ণ কখনই রাজ্য ছিল না, এটি ছিল গৌড় রাজ্যের অন্তর্গত একটি রাজধানী-মহানগরী। হিউয়েন-সাঙের বৃত্তান্তের বিশ্লেষণ করে মতবিরোধের অবসান ঘটাতে চেয়েছেন লেখক এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহাতীত মৌলিক উপাদানসমূহে সমর্থন খুঁজেছেন। সমর্থন মিলেছে। বিশেষ করে, তৃতীয় পর্বের আলোচনায়, লেখক লেয়ার্ড, মার্টিন, কানিংহাম, বেগলার, ফার্গুসন, ওম্যালে প্রমুখ পণ্ডিতদের মতামত বিশ্লেষণ করে কর্ণসুবর্ণ এবং রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের স্থিতি সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। কিন্তু "রাঢ়-ভূখণ্ডের বা কর্ণসুবর্ণের সুপ্রাচীন ইতিহাস অদ্যাপি অজ্ঞাত।" (পৃ. ১১২)। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে "শশাঙ্কের আমলেই কর্ণসুবর্ণ একটি শ্রীসম্পন্ন রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি কেন্দ্রে" (পৃ. ১২৩) যে পরিণত হয় তা সুধীরবাবুর ব্যাখ্যায় স্পষ্টতই প্রতীয়মান।

শশাঙ্ক এবং তার সমসাময়িক বাংলা তথা গোটা উত্তর ভারতের সামগ্রিক পরিচয় এই বইতে উপস্থাপিত। পরিচয় পাওয়া যায় লেখকের পরিশ্রম ও সামাজিক ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গির। এই বইতে অনেকগুলি মূল্যবান ছবি ছাপা হয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে প্রয়োজনীয় মানচিত্র যা সেকালের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে জরুরি।

নানা উৎস থেকে খুঁটে খুঁটে তথ্য জোগাড় করে শশাঙ্কের আমলের ইতিহাস মোটামুটি দাঁড় করানো গেছে। ফলে একটা ফাঁক ভরাট হয়েছে। তারপর আবার তমসাচ্ছন্ন। তারানাথ বলেছেন, অরাজক অবস্থা। ধর্মপালের খালিমপুর লেখতে আছে সে সময় বাংলায় চলছিল মাৎস্যন্যায়। গোপাল রাজা নির্বাচিত হওয়ার পর আবার শাসন-শৃঙ্খলা ফিরে আসে। কিন্তু কলহনের রাজতরঙ্গিণীতে আছে অন্য কথা, "সাতজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জলৌককে রাজা নির্বাচিত করেছিলেন।" (পৃ. ৩)। এই বিতর্ককে পাশে সরিয়ে রেখে গোপালের নির্বাচনকেই যদি আমরা গ্রহণযোগ্য মনে করি তবে দেখতে পাব শশাঙ্ক আর গোপালের মধ্যে ব্যবধান অনেকখানি, প্রায় এক শতাব্দীর। অর্থাৎ দীর্ঘকাল পরে প্রতিষ্ঠিত হয় পালবংশ। এঁদের রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ছিল। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য আসন পেয়ে ছিল। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সুশাসন। সেকালের সামাজিক-অবস্থার ছবি ধরা পড়েছে অভিলেখগুলিতে। তাই ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে অভিলেখের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়ের 'পাল অভিলেখ সংগ্রহ' বইটি সেদিক থেকে প্রয়োজনীয় সন্দেহ নেই।

বইটির বিষয় নতুন নয়। অভিনব কিছু সংযোজিত হয়েছে, এমনও না। অভিলেখ নিয়ে ইতিপূর্বে অনেক উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ এবং পূর্ণাঙ্গ বই লেখা হয়েছে। এমন কি বাংলাভাষায়ও লেখা হয়েছে। প্রসঙ্গত দীনেশচন্দ্র সরকারের 'শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ' বইটি উল্লেখনীয়। তবু অশোকবাবুর সাম্প্রতিক বইটির প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রয়োজনীয়তা তাঁর ব্যক্ত উদ্দেশ্যের মধ্যেই নিহিত। ভূমিকাতে তিনি লিখেছেন, "সাধারণ পাঠকের পক্ষে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করে ইতিহাস অধ্যয়ন করা দুষ্কর।···লেখ সাহিত্য যেহেতু ভারতীয় ইতিহাসের প্রধান আকর, তাই·· লেখগুলোর সহজলভ্য পাঠ যদি" সাধারণ পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া যায় "তা হলে তাঁদের প্রাথমিক কৌতূহল কিছুটা মিটবে।" তা ছাড়া একটা বড় সুবিধা হচ্ছে এই যে, অভিলেখগুলির সহজ-সরল বাংলা অনুবাদ করে দিয়েছেন লেখক। ফলে সংস্কৃত ভাষায় অপটুত্ব আকর পাঠের ক্ষেত্রে অন্তরায় হবে না। সেই সঙ্গে সঙ্গে মিলবে সাজানো-গোছানো মূল অভিলেখগুলি।

হরপ্পা নগরে বিকশিত সভ্যতার নানাদিক নিয়ে শঙ্কর হাজরা বর্তমান আলোচ্য বই 'হরপ্পা নগরে বসতি করিনু' লিখেছেন। তাঁর আলোচনা দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। হরপ্পার লিপিতে ধ্বনি সংযোজনের পরিকল্পনা এবং পরিকল্পিত পাঠোদ্ধারের ব্যাখ্যা; হরপ্পার কৃষিভূমি ও কৃষ্টান; হরপ্পার ওজন প্রণালী; হরপ্পীয়দের সন্ধানে এবং পঞ্চনদীর দেশে—এইভাবে নানা বিষয়ে পরিশ্রমী আলোচনার ভিতর দিয়ে শঙ্করবাবু তাঁর বিশ্বাসের জগৎকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

প্রথমে শঙ্করবাবু হরপ্পা লিপির পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ করেছেন। "হরপ্পার অন্ততঃ কিছু দ্বিচিহ্নলিপি অথবা ত্রিচিহ্ন-

লিপি যদি বস্তুর শ্রেণীবিন্যাসের তালিকাবোধক শুধুমাত্র সংখ্যা না হয়ে থাকে, তা হলে মনে করা যেতে পারে হরপ্পার লিপিসংখ্যা ও বস্তুর ভাববোধক চিহ্নের অথবা (এবং) বর্ণ অথবা (এবং) অক্ষরমূলক ধ্বনি চিহ্নের মিশ্রণ। আর ঐ ধ্বনিগুলি বিশেষ কোন ভাষার মঙ্গলসূচক আহ্বান, বৃত্তিনাম, ব্যক্তিনাম অথবা সংখ্যাবাচক শব্দ।" শীলমোহরের চিহ্নগুলি নিয়ে তিনি বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। প্রাচীন পৃথিবীতে প্রাপ্ত শিলালিপির লিপিমালাকে কয়েকটি সাধারণ ভাগে ভাগ করে বৈজ্ঞানিক আলোচনার ভিত্তি স্থাপন করতে চেয়েছেন; লিপিতত্ত্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিশ্লেষণ ছাড়াও অন্যান্য দিকের উন্মোচন প্রচেষ্টা হরপ্পা সভ্যতা বিষয়ক আলোচনাকে দৃঢ় করতে সাহায্য করেছে।

শঙ্করবাবু হরপ্পার কবরভূমি এবং কঙ্কাল বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এই আলোচনায় তিনি সারণী ও রেখাচিত্র ব্যবহার করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগোতে চেয়েছেন। কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী তাঁর 'প্রাগৈতিহাসিক মোহেন-জো-দড়ো' বইতে মৃতদেহ সৎকারের তিনটি প্রণালীর কথা উল্লেখ করেছেন…"পূর্ণ সমাধি (Complete burial), আংশিক সমাধি (Fractional burial), দাহাত্তের সমাধি (Post-cremation burial)". মার্শাল অবশ্য অনুমান করেন, মৃতদেহ খোলা জায়গায় কিছুদিন ফেলে রেখে কঙ্কালের অংশ সংগ্রহ করে কবর দেওয়া হত। আবার কোনো কোনো প্রত্নতত্ত্ববিদ হরপ্পার শবদাহ করা হত বলে মত প্রকাশ করেছেন। শঙ্করবাবু কবর দেওয়ার পদ্ধতির উপর বেশি জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে "সৎকার পদ্ধতি ছিল প্রলম্বিতভাবে শবকে শায়িত করে প্রোথিত করা।" যদিও "হরপ্পীয়দের কবরভূমিতে পাওয়া পূর্ণ কঙ্কালের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প।" কবরগুলি থেকে প্রাপ্ত করোটীগুলির মাপ ও বিবর্তন ধারা বিশ্লেষণ করে হরপ্পীয়দের জাতিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে লেখক সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করেছেন।

বিলম্বিত প্রস্তর যুগের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার হদিশ করতে চেয়েছেন লেখক। সেকালের মানুষ বিনিময় প্রথায় অভ্যস্ত ছিলেন কিনা সে বিষয়ে প্রত্নতত্ত্ববিদদের সন্দেহ আছে। কিন্তু শঙ্করবাবু মনে করেন যে, বিলম্বিত এবং নব্য প্রস্তর যুগে উত্তর মহীশূরে "একই ধরনের পাথর এবং একই ধরনের নৈপুণ্য প্রয়োগ করে" যে সমস্ত অস্ত্র তৈরি করেছিল সেগুলি হয়ত "ভারতীয় পটভূমিকায় বিলম্বিত প্রস্তর যুগের শিকারীরা হয়তো বা খাবারের জন্য নব্য প্রস্তর-যুগের কৃষকদের কাছে শিলা অস্ত্র ও অন্যান্য তৈজস বিনিময় করেছিল।" এই বিনিময় প্রথাই হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রথম পদক্ষেপ। মোহেনজোদরো হরপ্পায় অর্থনৈতিক কাঠামো বেশ দৃঢ়ভাবে গড়ে ওঠে। বাণিজ্যে তারা বেশ উন্নতি করে। ফলে "বিস্তীর্ণ এলাকায় মোটামুটি নিখুঁত মাপের ওজন প্রণালীর প্রচলন" ছিল। শঙ্করবাবু সঙ্গত কারণেই ওজন প্রণালী সম্পর্কে দুটি অধ্যায় জুড়ে বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি আর্যদের ওজন প্রণালীর সঙ্গে হরপ্পীয়দের ওজন প্রণালীর সম্পর্ক নির্ণয় করতেও প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর মতে "হরপ্পীয় ওজন প্রণালীর সঙ্গে প্রাচীন আর্যভাষাভাষীদের ওজনপ্রণালীর সম্পর্কে দেখানোর জন্য লাঞ্ছনাময় মুদ্রার (Punch-marked coins) ওজনমান-কেই গ্রহণযোগ্য তুলনীয় ওজন হিসাবে ধরে নিতে হয়েছে।" এবং বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তিনি সিদ্ধান্তে আসতে চেয়েছেন—"হরপ্পীয়দের সঙ্গে আর্যভাষী জনগোষ্ঠীর অন্যান্য অভিন্নতার সম্পর্কের মতোই হরপ্পীয়দের ওজন প্রণালীর সঙ্গে হিন্দু ওজন প্রণালীর তৎকালে অভিন্নতা অনেক সময়েই একালের বিজ্ঞজনদের গোচরে এসেছে।" শুধু তাই নয়, ওজনপ্রণালীর সূত্র ধরে অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে হরপ্পীয়দের বাণিজ্যিক সম্পর্কের বিষয়টিও তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু হরপ্পীয়দের সঙ্গে আর্যদের কোনো সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয় না।

শঙ্করবাবুর মতে "ভারতীয় আর্যভাষী জাতি গোষ্ঠীগুলি ভারতবর্ষের আদিম দ্রাবিড় এবং মুণ্ডাভাষী উপজাতি গোষ্ঠী-গুলির উপর বিপুল পরিমাণে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে-ছিল।" এইভাবে নানা জাতির সৃষ্টি হয়েছিল। লেখক নরকরোটির ব্যাখ্যা করে হরপ্পীয়দের স্বাতন্ত্র্যের কথাই বলেছেন। অর্থাৎ সংমিশ্রণ যা হয়েছিল তা পরবর্তীকালের ব্যাপার।

এই বইটি লিখতে গিয়ে লেখক অনেক পরিশ্রম করে-ছেন। তার ছাপ প্রতি ছত্রে দেখা যায়। প্রতিটি পরিচ্ছে-দের শেষে রয়েছে গ্রন্থ ও নিবন্ধ তালিকা। তা ছাড়া রয়েছে পাক-ভারতের নর করোটির গ্রন্থপঞ্জী। এ সমস্ত বইটির ওজন ও মূল্য বাড়িয়েছে। লেখকের পাণ্ডিত্য প্রকাশ পেয়েছে। বাংলা ভাষায় এ ধরনের বই লেখার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। কিন্তু ভাষায় স্বাচ্ছন্দ্য না থাকায় মাঝে মাঝেই হোঁচট খেতে হয়। কখনো কখনো মনে হয় কষ্টকর অনুবাদ-গ্রন্থ পড়ছি। অনেক মতামত সমর্থন যোগ্য নয়। তবু,

পরিশেষে আবার তাঁকে ধন্যবাদ জানাই এই বইয়ের জন্য।

আমাদের আলোচ্য পঞ্চম বই রবীন্দ্রনাথ সামন্তর 'শিল্প-রূপময় বাঁকুড়া'। মোট বাইশটি রচনা এতে স্থান পেয়েছে। রচনাগুলি বিভিন্ন ধরনের, ভিন্ন স্বাদের। কিন্তু লেখাগুলির অন্তর্নিহিত সুরে ঐক্যসূত্র লক্ষ্যণীয়। তবে গবেষণামূলক প্রবন্ধ বলতে যা বোঝায় তা এগুলি নয়। বিভিন্ন সময়ে ছোট ছোট পত্রিকায় সংবাদ-সাহিত্য হিসেবেই রচনাগুলি প্রকাশিত। লেখক নিজেই নিবেদনে লিখেছেন, "গবেষণার বিধি নির্ধারিত শুদ্ধ নিয়ম হয়ত সর্বক্ষেত্রে মান্য করা হয় নি। নতুন কোন আবিষ্কারের সূত্র তুলে ধরার ইচ্ছাও আমার নেই। আমি শুধু জানতে চেয়েছি এবং জানাতে চেয়েছি।" তিনি জানাতে চেয়েছেন বাঁকুড়ার লোকসংস্কৃতি, শিল্প, ঐতিহ্য এবং নানা সংবাদ যা বাঁকুড়ার শিল্পরূপময়তার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকেও তুলে ধরে। এই বই থেকে বাঁকুড়া-সংস্কৃতির একটা মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। সেটাই লাভ।

মুঘল অর্থনীতি: সংগঠন এবং কার্যক্রম—জগদীশ নারায়ণ সরকার, অনুবাদ: ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী / পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা / ৩৮ টাকা

কর্ণসুবর্ণ-মহানগরী: বঙ্গদেশের বিস্মৃত রাজধানী—সুধীররঞ্জন দাস / পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা / ৭২ টাকা

পাল অভিলেখ সংগ্রহ—অশোক চট্টোপাধ্যায় / পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা / ৩৩ টাকা

হরপ্পা নগরে বসতি করিনু—শঙ্কর হাজরা / কসমো স্ক্রিপ্ট, কলকাতা / ৬০ টাকা

শিল্প রূপময় বাঁকুড়া—রবীন্দ্রনাথ সামন্ত / পুস্তক বিপণি, কলকাতা / ৪০ টাকা

শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক-এ প্রাচীন ভারতের সমাজচিত্র

কান্তি গুপ্ত

'সংস্কৃত ভাষা কথ্যভাষা ছিল না বলিয়াই সে ভাষায় সমস্ত হৃদয়ের কথা সম্পূর্ণ করিয়া বলা হয় নাই।' রবীন্দ্র-নাথের উক্তির সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হয় যে, সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য সাধনাও আবার রাজসভায় পাঠের জন্য, রাজশ্রোতাদের জন্য। সুতরাং কালের চিত্র অপেক্ষা আনন্দধামের চিত্রই সেখানে উজ্জ্বল। সেখানে কেবল শ্রী ঐশ্বর্য, বিলাসকলাকুতূহল। এরকম ভাবনার পরিমণ্ডলে যখন শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' নাটকটি উপস্থিত হয় তখন পাশ্চাত্য-জ্ঞানে-আপ্লুত আমাদের আস্বাদন প্রক্রিয়ার অবস্থা ব্যাধবিদ্ধ হরিণীর প্রায়। বিস্ময়ে বিমূঢ়তায় শুধু জিজ্ঞাসা: এ কোন সংস্কৃত নাটক?

সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে কিন্তু বাস্তবতাকে নাট্যকাব্যের ক্ষেত্রে অবহেলা করা হয়নি। ভারতের নাট্যশাস্ত্রের কথা তো সকলেরই জানা,

নানা ভাবোপসংপন্নম নানাবস্থান্তরাত্মকম্
লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতন্ময়াকৃতম্।

নাট্যশাস্ত্রে 'রূপক' নামে কথিত নাটকের যে দশটি বিভা-জনের উল্লেখ আছে, সেই বিভাজনের অন্তর্গত 'প্রকরণ' সম্পর্কে বলা হয়েছে যে 'প্রকরণে'র কাহিনী গঠিত হবে নাট্য-কারের নিজস্ব কল্পনায়, নায়ক হবে সাধারণ মানুষ—আমাত্য, ব্রাহ্মণ, বণিক; নায়িকা ঘরের স্ত্রী বা গণিকা। এই 'প্রকরণ' রূপে চিহ্নিত, ভবভূতির 'মালতীমাধব' আর শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক'।

এই 'প্রকরণে'র বাস্তব বীজই শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' মহীরুহ।

এডুকেশন গেজেটে ১২৯৪ সনে ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'মৃচ্ছকিটক' নিয়ে আলোচনাকালে নাটকীয় নান্দীভাগের দুইটি শ্লোকের উল্লেখ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, 'সমুদায় নাটকটিতেই ঐ দুই কথা। এক কথা, নায়কের দরিদ্রতা, অকিঞ্চনতা, সর্বশূন্যত্ব; দ্বিতীয় কথা, তাঁহার প্রেমিকা প্রেয়সী লাভ, এবং তৎসহ সমুদায় সাংসারিক সুখ প্রাপ্তি।' নাটকের অন্তর্ভুক্ত গীতের—'সর্ব শূন্যং দরিদ্রস্য' পঙ্‌ক্তিটি বেছে নিয়ে লিখেছেন; 'সমাজচিত্রণে যে দারিদ্রবস্থার চিত্রণ আবশ্যক তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ সকল সমাজেই দারিদ্রের অতি বিপুলতা দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং কোন বস্তুর বৃহত্তম ভাগের অনুরূপ চিত্র না হইলে, সে চিত্র সে বস্তুরই হইতে পারে না।' অতঃপর ভূদেব নায়ক চারুদত্ত ও শার্বলিক চরিত্রের তুলনা-মূলক পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, 'মৃচ্ছকটিক নাটক ভারতবর্ষীয়দিগের সাত্ত্বিক ঐতিহাসিক লক্ষণও বুঝিতে পারা যায়।…এদেশে মতভেদ হইলেই ইউরোপের ন্যায়

পরস্পর পীড়ন, নির্যাতন, মারামারি, কাটাকাটি প্রভৃতি নৃশংস ব্যাপারের সূচনা।' ভূদেবের আলোচনায় বড়ো হয়ে উঠেছে হিন্দু আদর্শ ও আচরণের শ্রেষ্ঠত্ব।

ভূদেবের আলোচনার পর একশো ছয় বছরের মধ্যে 'মৃচ্ছকটিক' নিয়ে বাংলায় খুব বেশি আলোচনা হয়েছে, এমন নিদর্শন আমাদের হাতে নেই। বিজয়া মুখোপাধ্যায় 'মৃচ্ছকটিকে'র যে আলোচনায় মনোসংযোগ করেছেন সেখানে নাটকের আভ্যন্তরীণ বিষয়ের ভালোমন্দ বিচার, সৌন্দর্য সম্ভোগ, নাট্যকারের প্রতিভা বিশ্লেষণ প্রভৃতি স্থান পায় নি। 'মৃচ্ছকটিকে' উপস্থাপিত চরিত্র, তাদের জীবন যাত্রা, আচার-আচরণ, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, এবং সমাবেশিত উপকরণ সামগ্রী নিয়ে বিচার বিবেচনা করে প্রাচীন ভারতের সমাজে এসবের অবস্থানের যাথার্থ্য ও প্রামাণিকতা সম্পর্কে নিঃসংশয় করে তোলার কাজেই বিজয়া মুখোপাধ্যায় তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন।

বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের বইটির নাম 'সংস্কৃত নাটকে প্রাচীন ভারতের সমাজচিত্র শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক।' সত্তর পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের তিনটি পর্ব : ১. মুখবন্ধ, ২. সমাজচিত্র-মুখ্য ৩. সমাজচিত্র-গৌণ ৩. গ্রন্থ-নির্দেশ। মুখবন্ধ শীর্ষক পর্বের বারো পৃষ্ঠার আলোচনার মধ্যে স্থান পেয়েছে, রূপকভেদ ও কাহিনীসার, রচয়িতা ও উত্তরাধিকার এবং নামকরণের তাৎপর্য। এই অংশের রচয়িতা ও উত্তরাধিকার শীর্ষক আলোচনাটি খুবই মূল্যবান। নাট্যকার শূদ্রক, ভাসের চারুদত্ত ও মৃচ্ছকটিক কাহিনীর যোগাযোগ এবং মৃচ্ছকটিক নাটকের রচনাকাল নিয়ে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য পণ্ডিতগণ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। লেখিকা সেসব আলোচনার জটিল অরণ্যের হাতছানি এড়িয়ে আপন পর্যবেক্ষণ শক্তির সাহায্যেই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন স্বল্প কথায়। অধিক কথা বলে পাণ্ডিত্য প্রকাশে তিনি লোভ সংবরণ করেছেন। লেখিকার মূল লক্ষ্য ঐ সব সমস্যাগুলি নিয়ে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করায় নয়, 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে উপস্থাপিত প্রাচীন ভারতের সমাজচিত্রটি তুলে ধরা।

সমাজচিত্র-মুখ্য শীর্ষক পর্বের ৪০ পৃষ্ঠার অন্তর্গত আলোচনার বিষয় হল তেরটি। এদের মধ্যে উল্লেখ্য বর্ণবিভাগ, ক্রীতদাস প্রথা ও দাসত্ব, বিচারপদ্ধতি, প্রশাসন, রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতি। প্রত্যেকটি আলোচনায় উদ্ধৃতি সহযোগে লেখিকা দেখিয়েছেন বর্ণবিভাজন, দারিদ্র ও ঐশ্বর্যের সহবস্থান, গণিকা আসক্তি, বিচারের প্রহসন, প্রশাসনের শৈথিল্য, শাসক পরিবর্তন করে সামাজিক দুর্নীতি এবং অন্যায় প্রতিকারায় প্রজাগণের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি কথা।

সমাজচিত্র-গৌণ শীর্ষক পর্বের ১২ পৃষ্ঠার অন্তর্গত মুদ্রা, পরিবহন, জ্যোতিষ, কুসংস্কার, লোকালয় প্রভৃতি দশটি বিষয়। এসব ক্ষেত্রেও লেখিকার পর্যবেক্ষণ শক্তি সক্রিয় থেকেছে। 'মৃচ্ছকটিকে'র কালের ভারতের সমাজের জীবনযাত্রার আচার আচরণের একটি পরিচয় সামান্য অংশে সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

অনেক কথার ভিড় বাড়িয়ে লেখিকা মূল বিষয়কে হারাতে দেন নি। সংক্ষেপে খাঁটি কথাটুকু পাঠকের বোধের মধ্যে এঁকে দিতে সক্ষম হয়েছেন। সাহিত্যের ভুবনে বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের রয়েছে স্বচ্ছন্দ আনাগোনা। 'মৃচ্ছকটিক'-এর সমাজচিত্রের আলোচনায় এই সপ্রতিভ যোগ অনুভব করা গেল। তাঁর সাহিত্যপ্রাণতার যোগে গ্রন্থটি শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক সম্পর্কে নাটকের আগ্রহ বাড়িয়ে তুলবে বলেই মনে হয়। জ্ঞানবৃদ্ধি ও রসাস্বাদনের মাত্রাবৃদ্ধি পাঠকের কাছে বড়ো লাভ। শ্রীমতী বিজয়া মুখোপাধ্যায়কে সাধুবাদ দিতেই হয়।

সংস্কৃত নাটকে প্রাচীন ভারতের সমাজচিত্র শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক—বিজয়া মুখোপাধ্যায়/রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচার গোলপার্ক, কলিকাতা-৭০০ ০২৯/ পনের টাকা।

যাঁরা চোখ হারাতে পারেন তাঁদের জন্য

সৌমিত্র লাহিড়ী

'আমাদের পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে চোখকে প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে।...এমন বিস্ময়কর সৃষ্টি আর একটিও নেই'।

চোখ প্রকৃতির এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। পৃথিবীর দেশে দেশে শিল্পে সাহিত্যে কাব্যে সংগীতে কত বিচিত্রভাবে ও ভঙ্গিমায় 'চোখ' প্রতিবর্ণিত হয়েছে তার হিসাব কষা সম্ভব

না। মানুষের জীবনে চোখ অমূল্য সম্পদ, কিন্তু এই চোখ নিয়ে আমরা কতটুকু ভাবি, এর কতটুকুই বা যত্ন করি? অথচ সামান্য পরিচর্যা ও যত্ন নিঃসীম অন্ধকার থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারে। কলকাতা শহরের প্রথিতযশা চক্ষু বিশেষজ্ঞ ড. রণবীর মুখোপাধ্যায় এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক ও বিজ্ঞান-লেখক ড. রমেন মজুমদার 'চোখের সুখ অসুখ' গ্রন্থে চোখের নানা রোগ ও তার থেকে বাঁচার সম্ভাব্য পথ নিয়ে অসামান্য সরলতায় আলোচনা করেছেন।

বিজ্ঞানধর্মী রচনা সাধারণতঃ গুরু গম্ভীর হয়ে যায়। ভাষার সহজ স্বচ্ছন্দ গতি হারিয়ে যায় এবং এক ধরনের বাংরিজি সমাচ্ছন্ন খুঁড়িয়ে চলা রচনাপদ্ধতি পাঠককে ক্লান্ত বিমুখ করে তোলে। বর্তমান লেখকদ্বয় স্বক্ষেত্রে স্বনামধন্য এবং জনকল্যাণকামী বলেই সম্ভবত এমন চমৎকার সাচ্ছন্দ অর্জন করতে পেরেছেন। আমাদের মত চিকিৎসা বিজ্ঞানে অজ্ঞ সাধারণ পাঠক এই গ্রন্থ পাঠে শুধু আনন্দই অনুভব করবেন না, চোখ সম্পর্কে সতর্ক ও যত্নবানও হয়ে উঠবেন। সাধারণ মান্য নিয়ম পদ্ধতিগুলি অনুসরণেও হয়ত অভ্যাসী হবেন।

গ্রন্থকারদ্বয় বলেছেন : 'খবর লেখা হয় যে ভাষায় আমরা সেই ভাষায় এই গ্রন্থ লিখিনি : খবর বলা হয় যে ভাষায়, সেই ভাষায় আমরা এই গ্রন্থ লিখেছি'। তাঁরা আরও জানিয়েছেন, 'যাঁরা চোখের দৃষ্টি হারিয়েছেন তাঁদের জন্য এই গ্রন্থ নয়, যাঁরা হারাতে পারেন তাঁদের জন্য'।

গ্রন্থকারদের এই ঘোষণা অনুসরণ করলেই বোঝা যায় তাঁদের উদ্দেশ্য অগণিত সাধারণ মানুষের কাছে তাঁদের বক্তব্য পৌঁছে দেওয়া যাতে সামান্য ভুল ও অসতর্কতার জন্য মানুষ চোখের দৃষ্টি হারাতে আর বাধ্য না হন। যাঁরা দৃষ্টি হারিয়েছেন, তাঁদের এখন চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

'চোখের সুখ অসুখ' জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা। কুড়ি অধ্যায়ে বিন্যস্ত 'চোখের সুখ অসুখ'-এর প্রথম অধ্যায়ে আছে কিছু ভয়াবহ পরিসংখ্যান যা আমাদের সতর্ক হতে প্ররোচিত করে।

দ্য ইণ্টার ন্যাশনাল এজেন্সি ফর দি প্রিভেনশন অভ ব্লাইণ্ডনেস-এর হিসাব তুলে বলা হয়েছে, পৃথিবীতে অন্তত চার কোটি মানুষ অন্ধ (১৯৯০) যার ৮০ ভাগই নিবারণ সম্ভব চিকিৎসায়। আর বছর কুড়ি বাদে (২০১৫) পৃথিবীতে অন্ধ লোকের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাবে। লক্ষণীয়, উন্নয়নশীল দেশগুলিতেই অন্ধ মানুষের সংখ্যা বেশি। একই বছরে ভারত সরকার একটি রিপোর্টে জানিয়েছেন যে, সারা পৃথিবীতে সম্পূর্ণ অন্ধের সংখ্যা তিনকোটি এবং ২০০০ সালে সংখ্যাটি বেড়ে হবে চার কোটি। তিন কোটি অন্ধের দু কোটি মানুষের বাস এশিয়ায়, ৬০ লক্ষের আফ্রিকায় এবং ২০ লক্ষের লাতিন আমেরিকায়। অতি শিল্পোন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যার '১৫ শতাংশ থেকে '২৫ শতাংশ অন্ধ কিন্তু উন্নতিশীল দেশগুলিতে এই হার ১ শতাংশের ওপর। পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হয় না, আপাত নিরীক্ষণ-ই বলে দেয়, সামাজিক আর্থিক সফলতার ওপর মানুষের দৃষ্টি শক্তির হার কম-বেশি হওয়া নির্ভর করে। আলাদাভাবে ভারতের চিত্র দেখলে ভয়াবহ রূপ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর দি কণ্ট্রোল অভ ব্লাইণ্ডনেস এবং ওয়ার্ল্ড হেল্থ অর্গানাইজেশন-এর সমীক্ষা (১৯৮৬-৮৯) থেকে জানা যাচ্ছে ভারতে এক কোটি কুড়ি লক্ষ মানুষের দু চোখ অন্ধকার, ৮০ লক্ষ মানুষ দেখেন মাত্র একটি চোখে এবং চার থেকে পাঁচ কোটি মানুষ ক্ষীণ-দৃষ্টি।

মাত্র ছ' পৃষ্ঠার এই অধ্যায়ে এ রকম অজস্র তথ্য সমাবেশ ঘটেছে যা আমাদের চমকে দেয়, সচেতন করে তোলে, সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'মানুষের চোখ' প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায় একটু কষ্ট করে বোঝার চেষ্টা করলে পরবর্তী অধ্যায়গুলি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। রিফ্র্যাকটিভ এরার ও চশমা (তিন), কনট্যাক্ট লেন্স (চার) অধ্যায় দুটিতে আমাদের পরিচিত চোখের অসুখগুলির কারণ কী, কেমনভাবে মানুষ আক্রান্ত হন, চশমা এবং বিভিন্ন লেন্সের ব্যবহার উপযোগিতার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

খুব ধরা বাঁধা নিয়ম শৃংখলার পর্ব থেকে পর্বান্তরে যাওয়া হয়নি সঙ্গত কারণেই। তবে চোখ ও চোখের অসুখ নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে যত জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল সৃষ্টি হয় তার প্রায় প্রতিটিই আলোচিত হয়েছে এবং সম্ভাব্য সতর্কতার পদক্ষেপগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। টেরা চোখ, লাল চোখ, ক্যাটারাক্ট, রেটিনার অসুখ, চোখের পাতার অসুখ, রং কানা, বংশগত রাত কানা, বিষাক্ত মদের প্রতিক্রিয়া, চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়া, হঠাৎ চোখ লাল হওয়া, চোখে কালো ফুটকি দেখা, হঠাৎ কম দেখা, ইত্যাদি বহুল শ্রুত ও

দৃশ্য চোখের অসুখগুলি আলাদা ভাবে আলোচিত হয়েছে এবং এর কারণসমূহ দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতাও নির্দেশ করা হয়েছে।

'চোখের আঘাত' এবং 'চোখের স্ট্রেন' অধ্যায় দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যন্ত্র সভ্যতার যুগে চোখে আঘাত লাগার ঘটনা অস্বাভাবিক নয়। গ্রন্থকারদ্বয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিসংখ্যান উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, গড়ে সে দেশে প্রতি বছর দশ লক্ষ মানুষ চোখের আঘাতে ভোগেন—হাসপাতালে চোখের রুগীর বেশির ভাগই চোখের আঘাত-এর চিকিৎসার জন্য আসেন। আমাদের দেশেও 'চোখের আঘাত' প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। অজ্ঞতা, অসতর্কতা, পেশা গত পরিবেশের সীমাহীন অবহেলা ইত্যাদি নানা কারণে 'চোখের আঘাত' লাগতে পারে। সতর্কতা ও সাবধানতা প্রধান প্রতিষেধক, বিশেষত প্রাথমিক চিকিৎসার নিয়মকানুনগুলি জানা থাকলে অনেক দুর্ভাগ্য পরিহার করা সম্ভব তা জানিয়েছেন 'চোখের সুখ অসুখে'র গ্রন্থকারদ্বয়।

'চোখের স্ট্রেন' অধ্যায়ে চোখের কিসে আরাম হয়, আর কিসে যন্ত্রণা বাড়ে তা চমৎকার ভাবে আলোচিত হয়েছে। আলো ব্যবহারের পদ্ধতি, চোখের পলক ফেলার প্রয়োজনীয়তা, লেখাপড়া করার সময় কোনখানে বই ধরবেন, কোথায় রাখতে হবে আলোর উৎস, সেলাই ফোঁড়াই করার সময় চোখ কেমনভাবে ব্যবহার করবেন, সিনেমা বা দূরদর্শন কেমনভাবে দেখবেন, কতটা দূর থেকে কত ডিগ্রি কোণ থেকে দেখতে হবে প্রভৃতি প্রসঙ্গ প্রাঞ্জল ভাষায় বিশ্লেষিত হয়েছে। এই নিয়মগুলি অনুধাবন করে ব্যক্তিজীবনে অনুসরণ করা খুবই শক্ত ব্যাপার নয়। এর জন্য অর্থ যতটা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন কাণ্ডজ্ঞান ও বিজ্ঞান-মনস্কতা। চশমা ব্যবহার করার পদ্ধতি, সানগ্লাস ব্যবহার করা-না-করার সুফল-কুফল, কম্পিউটরে চোখ পরীক্ষা করা কতটা নিরাপদ প্রভৃতি গণ-আগ্রহসূচক কৌতূহলী প্রশ্নও এসেছে প্রাসঙ্গিকভাবে বিভিন্ন অধ্যায়ে। খালি চোখে সূর্য গ্রহণ দেখা, চোখে কাজল সুর্মা ব্যবহার জাতীয় অতি পরিচিত বিষয়গুলিও আলোচিত হয়েছে।

উনবিংশ অধ্যায়ে আই ব্যাঙ্ক প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়েছে। প্রসঙ্গটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সমস্ত মানুষের জানা প্রয়োজন। মৃত মানুষের কোন অঙ্গই তাঁর বা তাঁর পরিবারের প্রয়োজনে লাগে না। শেষকৃত্যের সময় সব কিছু চিরতরে শেষ হয়ে যায় বলেই না সেটা শেষকৃত্য। মৃত্যু এবং শেষকৃত্যের মধ্যবর্তী সময়ে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যেতে পারে মানুষ। নিজের চোখকে অন্যের ব্যবহারের জন্য দান করে যেতে পারেন। আই-ব্যাঙ্ক সেই দান গ্রহণের জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখে। মানুষের মৃত্যুর পর চার থেকে ছ' ঘণ্টার মধ্যে চোখ তুলে নিতে পারলেই সেই চোখ অন্য কোন মানুষের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে পারে। 'আমাদের দেশে এখন আনুমানিক পঁচিশ লক্ষ লোক কর্ণিয়ায় অসুস্থতার কারণে অন্ধ হয়ে আছেন। তাঁদের মধ্যে অন্তত দু লক্ষ লোক এখনই আবার পূর্ণ দৃষ্টি ফিরে পেতে পারেন যদি তাদের চোখের কর্ণিয়া বদলে দেওয়া যায়। ব্যাপারটা প্রায় ঘড়ির কাঁচ বদল করার মতো।' আই-ব্যাঙ্ক-কে সার্থকনামা করার জন্য ধর্মীয় সংস্কার, কু-সংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, অচেতন মানসিকতার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের বিভিন্ন মঞ্চ থেকে যেমন এই অভিযান সংগঠিত করা উচিত তেমনি সামাজিক বৌদ্ধিক অন্যান্য সংস্থা-সংগঠনের পক্ষ থেকেও নিরন্তর প্রচার তৎপরতা চালানো দরকার।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পশ্চিমবঙ্গে চোখের চিকিৎসার সুযোগ তুলনামূলক ভাবে কম।

তাই এই রাজ্যে চক্ষু চিকিৎসার আধুনিকতম সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর ঐকান্তিক প্রয়াসে কলকাতার কয়েকজন চক্ষু চিকিৎসক আর চিকিৎসাকর্মী ১৯৮৪ সালের ১লা জুলাই মধ্য কলকাতায় 'আই কেয়ার অ্যাণ্ড রিসার্চ সেণ্টার' নামে একটি চারাগাছ সম সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন, যেখানে 'বহু মানুষের অকাতর দান অনুদান সমর্থন সহযোগিতার জ্ঞান-বিজ্ঞান আর নিঃস্বার্থ যত্ন পরিচর্যায় সেই চারাগাছ আজ বৃক্ষে পরিণত' হয়েছে বলে গ্রন্থকারদ্বয় জানিয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থের রয়েলটিও এই সংগঠন পাবে। এই মহৎ প্রয়াস সার্থক হোক এই শুভ কামনা সকলেই জানাবেন।

চোখের সুখ অসুখ—ড. রণবীর মুখোপাধ্যায়, ড. রমেন মজুমদার, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী / ৭৯ মহাত্মাগান্ধী রোড কলকাতা-৯ / ৪০ টাকা।

আন্তর্জাতিক

ঠাণ্ডা যুদ্ধ আবার ফিরে আসছে?

তিমির বসু

ঠাণ্ডা যুদ্ধে বিজয় হল বলে মার্কিনরা আর আগের মত উৎসাহ দেখাচ্ছে না। অনেকের মতে নতুন ঠাণ্ডা যুদ্ধ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে—জার্মানী, জাপান আর আমেরিকা এই যুদ্ধে নতুনভাবে মেরুকরণের চেষ্টা করছে। 'বেলজিয়াম পার্টি অব লেবর' এই ধারণা পোষণ করে। প্রসঙ্গতঃ কলকাতায় অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক মার্কসবাদী আলোচনাচক্রে বেলজিয়াম পার্টির প্রতিনিধি এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে দৃঢ়ভাবে বক্তব্য রাখে। বেলজিয়াম পার্টি ছাড়াও বহু দেশী-বিদেশী বামপন্থীরা এখন তিন বৃহৎশক্তির মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে বলে প্রচার চালাচ্ছে—অর্থাৎ নতুন করে ঠাণ্ডা যুদ্ধের সূচনা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তি রুশ জাতীয়তাবাদের অবলুপ্তি নয়। প্রকৃতপক্ষে রুশ জাতীয়তাবাদ নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করছে। জার্মানরা নয়, আর জাপানীরা ত নয়ই। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙলেও রুশরা সামরিক দিক থেকে এখনও বৃহৎশক্তি—পারমাণবিক অস্ত্রসীমিতকরণ চুক্তি নিয়ে বর্তমানে যে রুশ মার্কিন মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে তার দ্বারা আদৌ রুশদের দুর্বলতা সূচিত হচ্ছে না। বরঞ্চ যতদিন যাচ্ছে, রুশদের মতিগতি নিয়ে পশ্চিম ইউরোপ তথা আমেরিকা নতুন করে ভাবতে বসছে। ওয়াশিংটনের ছক অনুযায়ী সবকিছু বিকশিত হচ্ছে না।

'বসনিয়া' নিয়ে খোদ আমেরিকাতেই মার্কিন প্রশাসন প্রচণ্ড সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছে। বারবার ধমক দেওয়া সত্ত্বেও মার্কিনরা সার্বদের নারকীয় তাণ্ডব বন্ধ করবার ব্যাপারে আজ পর্যন্ত কোন অর্থপূর্ণ সামরিক ব্যবস্থা নিতে পারে নি। কারণটা একমাত্র এই নয় বসনিয়া ইউরোপে অবস্থিত। কোন তৃতীয় বিশ্বের দেশে 'বসনিয়া পরিস্থিতি' সৃষ্টি হলে এতদিনে মার্কিন সামরিক অভিযান শুরু হয়ে যেত। সম্প্রতি আমেরিকার প্রখ্যাত বামপন্থী সাপ্তাহিক 'দি নেশন' এক চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছেন—বসনিয়ায় মার্কিন সামরিক অভিযান না চালানোর পেছনে রয়েছে রাশিয়া। মস্কো সরাসরি মার্কিন প্রশাসনকে এই মর্মে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে যে সার্বদের বিরুদ্ধে মার্কিনরা কোন সামরিক পদক্ষেপ নিতে পারবে না কারণ যে কোন অবস্থাতেই রাশিয়া বেলগ্রেডের পাশে দাঁড়াবে। সুতরাং নানা যুক্তি অথবা কুযুক্তি খাড়া করে মার্কিনরা বসনিয়া মারণযজ্ঞ দেখে যাচ্ছে। মজার ব্যাপার রাশিয়ার এই হুমকি মার্কিন পত্র-পত্রিকায় তেমন ফলাও করে প্রচার করা হয়নি। খুব সঙ্গত কারণেই। রাশিয়া যে এখনও বৃহৎশক্তি এই অবস্থাটা মার্কিনরা প্রকাশ্যে স্বীকার করতে চায় না। অন্য ভাবে বলতে গেলে নতুন ঠাণ্ডা যুদ্ধে রাশিয়ারও ভূমিকা থাকছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙেছে ঠিকই কিন্তু সদ্য স্বাধীন পূর্বতন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলো সম্পূর্ণ স্বাধীন এমন ধারণার বাস্তব ভিত্তি রীতিমত দুর্বল। স্বাধীন, অথচ মস্কোর উপর এক ধরনের নির্ভরশীলতা থেকেই যাচ্ছে। সত্তর বছরের বেশি সময় ধরে যে শ্রমবিভাজন দানা বেঁধেছে রাতারাতি তার সমূল উৎপাটন সম্ভব নয়। ফলে ইয়েলৎসিনের 'কমনওয়েলথ' শেষ পর্যন্ত বৃহত্তর রুশ সাম্রাজ্য হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা। ইতিমধ্যেই তার লক্ষণ স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। 'সোভিয়েত' জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট এমন সব উগ্র জাতীয়তাবাদী শ্লোগান দিতে শুরু করেছে যার মোকাবিলা করা ইয়েলৎসিনদের পক্ষে খুব একটা সহজ হচ্ছে না। হয়ত এই উগ্র রুশ জাতীয়তাবাদ ইয়েলৎসিনদেরও সমান কাম্য। অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সংকট যত তীব্রতর হচ্ছে ততই রুশ জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী হচ্ছে। পশ্চিম ইউরোপ এবং আমেরিকা চেষ্টা করছে কীভাবে ধনতান্ত্রিক রাশিয়াকে তৃতীয় বিশ্বের স্তরে রাখা যায়। যদি পঞ্চাশ বছর আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙত আর কোন ইয়েলৎসিন ক্ষমতায় আসত তাহলে হয়ত রাশিয়ায় ধনতান্ত্রিক বিকাশ কিছুটা ঠেকিয়ে রাখা যেত। কিন্তু আজ আর তা সম্ভব নয়। প্রযুক্তিগত উন্নতির ক্ষেত্রে রাশিয়া আমেরিকা থেকে পিছিয়ে আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু

পারমাণবিক অস্ত্র ও মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে খুব একটা পিছিয়ে নেই। শেয়ার বাজার, কাটকা, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সংস্থার বদলে রুশ বহুমাত্রিক সংস্থা তৈরি—এসবে অভ্যস্ত হতে সময় লাগবে। কিন্তু রুশরা শুরু করলে সহজে পিছু হটতে জানে না। মার্কিনরা মরতে ভয় পায়, রুশরা নয়। কম্যুনিস্ট বিরোধীরাও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রুশ জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণ করে থাকে। নতুন রুশ বুর্জোয়া শ্রেণীর সামনে বাধাবিপত্তি অসংখ্য কিন্তু এদের সামনে আবার সুবিধাও অপ্রতুল নয়। এমন একটা শিল্পী-পরিকাঠামো তৈরি হয়ে গেছে যার ফলে নতুন রুশ মালিকদের সরাসরি বিদেশের বাজারে নামা অনেকটাই সহজ।

রুশরা এখন আর ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র নিয়ে বিতর্ক করছে না। সাধারণ মানুষ প্রচণ্ড আর্থিক কষ্ট সত্ত্বেও গর্বাচভদের সোভিয়েত ইউনিয়ন ফেরৎ চাইছে না। মাঝে মাঝে লেনিন-স্তালিনের দাবি নিয়ে কমিউনিস্টরা অল্প-বিস্তর মিছিল ইত্যাদি করছে বটে কিন্তু তার ফলে ব্যাপক রুশ শ্রমজীবী জনতা উৎসাহিত বোধ করছে না। রুশদের সামনে এখন একটাই বড় প্রশ্ন :—যেকোন উপায়ে অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার অবসান এবং দ্রুত ইউরোপের খোলা বাজারে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা। এটা করতে গিয়ে রুশরা আত্ম-সম্ভ্রম ও সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দেবে একমাত্র রুশ ইতিহাসের ধারা-বাহিকতা যারা অস্বীকার করতে চায় তারাই এরকম ভাবতে পারে। পশ্চিমী সংবাদপত্রে আগে এক ধরনের সোভিয়েত বিরোধী প্রচার হত। আজ একটু ভিন্ন কায়দায় ভিন্ন পরিবেশে রুশ-বিরোধী প্রচার হয়ে থাকে। সেসব থেকে চোলাই হয়ে আমাদের এখানে যা এসে পৌঁছোয় তার সঙ্গে বাস্তব অবস্থার অনেক ফারাক। জাতীয়তাবোধ এতই তীব্র যে প্রয়োজনে অতি প্রয়োজনীয় বিদেশী লগ্নীও রুশরা অম্লান-বদনে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। ধনতান্ত্রিক রুশীরা কুরিল দ্বীপপুঞ্জের ব্যাপারে সাবেক কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন অপেক্ষা ভিন্নমত পোষণ করে না। বরং, ইয়েলৎসিন জাপানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করবার চাইতে কুরিল দ্বীপপুঞ্জ রুশ অধিকারে রাখাই শ্রেয় মনে করছেন। স্তালিন কিংবা স্তালিনবিরোধী স্তালিনের উত্তরসূরীরা কি ভিন্নমত পোষণ করত? ইতিহাস সবার হাতের কাছেই রয়েছে। এ ব্যাপারে রুশদের সঙ্গে চীনাদের অদ্ভুত মিল। ভারত-চীন সীমান্ত নিয়ে কমিউনিস্ট চৌ-এন লাই এবং কুওমিঙ্‌টাঙ্‌ একই ভাষায় কথা বলেছিল। জাপানীরা তাদের দুনিয়াজোড়া অর্থনৈতিক শক্তির দাপট দেখিয়ে কুরিল দ্বীপপুঞ্জ ফিরিয়ে নিতে চাইছে। কিন্তু রুশরা ভাঙবে তবু মচকাবে না। ঝাণ্ডার বদল হলেও রুশ মানসিকতায় জাতীয়তাবোধের বিন্দুমাত্র ঘাটতি পড়েনি।

এই কিছুদিন আগে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পঞ্চাশতম বিজয় বার্ষিকী উৎযাপিত হল রাশিয়ায়। কমিউনিস্ট আমলে যে ধরনের উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে স্তালিনগ্রাদের স্মৃতিচারণ করা হত বর্তমানে স্তালিনবিরোধী রুশ প্রজাতন্ত্রে সেই ঐতিহ্যের কোন বাতিক্রম দেখা গেল না, এমনকি স্তালিনগ্রাদের নাম ভল্গোগ্রাদ হওয়ার পরও স্বাদেশিকতার প্রশ্নে, রুশ গৌরবের প্রশ্নে, রাশিয়ার সীমানার বাইরে রুশ প্রভাবের প্রশ্নে রুশ মানসিকতায় ব্যাপক কোন পরিবর্তন আসেনি। বাজার অর্থনীতির দুর্বিসহ প্রভাব এবং প্রচণ্ড আর্থিক কষ্ট স্বীকার করে রুশরা কখনই একথা প্রমাণ করছে না যে তারা অদূর ভবিষ্যতে মার্কিন উপনিবেশ হতে যাচ্ছে। জার্মানী কিংবা জাপান যতই আস্ফালন করুক না কেন আজকের রাশিয়া জারের রাশিয়া নয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার প্রশ্নে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়া হচ্ছে রুশদের এক "পা" পিছিয়ে আসা। কিন্তু এর অর্থ কখনই এটা নয় রুশরা অদূর ভবিষ্যতে দু'পা এগিয়ে যাবার পরিকল্পনা থেকে বিরত থাকছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পর বছর না ঘুরতেই মার্কিনরা বুঝতে পারছে ক্ষতি তাদেরও কিছু কম হয় নি। ল্যাটো তার সামরিক গুরুত্ব হারিয়েছে। ফলে রুশদের লোকসান খুব একটা হয়নি কিন্তু মার্কিনরা ইউরোপে তাদের খবরদারি করবার ক্ষমতা হারাতে বসেছে। রুশদের প্রচেষ্টা হচ্ছে আমেরিকার সঙ্গে ইউরোপের স্বার্থের সংঘাতকে তীব্র করা এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক যুদ্ধে নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি ফুটিয়ে তোলা। আর ইউরোপ চেষ্টা করছে নিদেনপক্ষে ২০০০ সাল নাগাদ একটা আর্থিক বৃহৎশক্তি হিসেবে আত্ম-প্রকাশ করার জন্য।

রুশদের প্রাথমিক দুর্বলতা—তারা অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। ক্ষমতার লড়াইয়ের প্রশ্নে ইয়েলৎসিনই শেষ কথা নয়। প্রথমদিকে রুশিরা বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপরীত মেরুতে পৌছতে চাইছিল, কারণ বিশেষ ঝোঁকটাই ছিল কেবলমাত্র ইউরোপের উপর গুরুত্ব দেওয়া। কিন্তু ইউরোপ এখনও

রাশিয়াকে ঠিক ইউরোপীয় ভাবতে রাজি নয়। দেরিতে হলেও রুশরা তাদের তৃতীয় বিশ্ব নীতি বদলাতে শুরু করেছে। বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে দক্ষিণ কোরিয়া এবং চীন বিশেষ প্রাধান্য পাচ্ছে। ভারতের প্রয়োজন মস্কোর কাছে এখনও ফুরিয়ে যায়নি যদিও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাশিয়ার পররাষ্ট্র নীতিতে দিল্লী তার গুরুত্ব হারিয়েছে। ব্যবসার ক্ষেত্রে ভারতকে বিশেষ কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়া রাশিয়ার কাছে আগের মত জরুরি নয় যদিও ভারত এখনও রাশিয়ার একটা অস্ত্রের বাজার। ভারতকে ক্রায়োজেনিক প্রযুক্তি হস্তান্তরে রাশিয়ার পশ্চাদাপসরণ বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ ঘটনা।

সাবেক ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রে প্রায় ২৫ মিলিয়ন রুশ সংখ্যালঘু হিসেবে বাস করছে। এদের কী হবে? সোভিয়েত ইউনিয়ন নেই, কিন্তু পূর্বতন সোভিয়েত বাহিনীই বর্তমানে রুশ বাহিনী হিসেবে রাশিয়ার সীমানার বাইরে শান্তিশৃংখলা বজায় রাখছে। রুশ বাহিনী ইতিমধ্যেই মলডোভা, জর্জিয়া এবং আজারবাইজানের নগরনোবদরবাদে গৃহযুদ্ধ দমন করবার কাজে সরাসরি হস্তক্ষেপ করেছে। নতুন রাশিয়ার সাময়িক ভূমিকা কী হবে এ নিয়ে এখন চরম-পন্থীদের মতামত যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে। রুশ সংসদীয়-বৈদেশিক বিষয়ক কমিটির প্রধান ইয়েভমেনি এই সেদিনও ইয়েলৎসিনের প্রচণ্ড সমর্থক ছিল। কিন্তু এই ইয়েভমেনিও এখন একটা 'মনরো ডকট্রিন' ধরনের নীতি প্রয়োগের পক্ষপাতী। কারণ এর সাহায্যেই ভেঙে যাওয়া সোভিয়েত সাম্রাজ্যের উপর রুশ নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে।

মস্কোতে কম্যুনিস্ট বিরোধী সরকার থাকারও অর্থ মার্কিনরা পারমাণবিক অস্ত্রের একচ্ছত্র অধিপতি নয়। রুশ প্রতিরক্ষা বিভাগ এই অস্ত্র নির্মাণ একদিনের জন্যও বন্ধ করেনি। রাশিয়া ছাড়া ইউক্রেন, জর্জিয়া এবং কাজাকিস্তান এখনও পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী। কিন্তু এদের এই পারমাণবিক অস্ত্র থাকা না থাকা দুই সমান। কারণ নিয়ন্ত্রণ এখনও মস্কোর হাতে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ইতিহাসে এই প্রথম ইউরোপ চেষ্টা করছে 'মার্শাল প্লান'-এর প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে। ফলে রাশিয়াকে আমেরিকার দরকার নেহাৎ কম নয়। একমাত্র অস্ত্রের বাজার ছাড়া রাশিয়া কোথাও প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারছে না। অস্ত্রের বাজার ইউরোপে নেই, আছে তৃতীয় বিশ্বে। রাশিয়া প্রতি বছর আগে যা অস্ত্র বিক্রী করত তার একটা বিশাল অংশ চলে গেছে আমেরিকা ও চীনের হাতে। ইরাক যুদ্ধে লাভের সিংহ-ভাগটাই পেয়েছে আমেরিকা। এই যুদ্ধে রাশিয়ার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে সব থেকে বেশি। যতদিন যাচ্ছে রুশরা বুঝতে পারছে পুরানো অস্ত্রের বাজার ফিরে না পেলে কোন ধরনের বাজার অর্থ-নীতিই দানা বাঁধবে না।

বাজার অর্থনীতি নিয়ে হৈ চৈ যত হচ্ছে সেই তুলনায় রাশিয়ায় ধনতন্ত্র তেমন বিকশিত হচ্ছে না। 'রুশ কমন-ওয়েলথ্‌' একটা দুর্বল ফেডারেশন—যার আবার 'ইউনিয়ন' হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সব সাম্রাজ্যবাদী সংস্থায় রুশরা ঢুকতে শুরু করেছে, সাত অর্থ-নৈতিক শক্তির জোট G-7 রাশিয়াকে এখন পর্যবেক্ষক হিসেবে গণ্য করছে। রাশিয়ার কিছুটা রাজনৈতিক স্থিরতা আসার সঙ্গে সঙ্গে পুরানো সোভিয়েত ইউনিয়ন ফিরিয়ে আনার স্বপক্ষে জোরদার প্রচার শুরু হয়েছে। এই প্রচারে সামিল হয়েছে কম্যুনিস্টরা এবং কম্যুনিস্ট বিরোধীরাও। পুরানো ঢঙে সম্পূর্ণ পুরানো অবস্থায় অদূর ভবিষ্যতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পুনর্জন্ম সম্ভব নয়। কিন্তু নতুন ইউনিয়ন পরিকাঠামোও অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। আর নতুন ইউনিয়ন মানেই ঠাণ্ডাযুদ্ধের নতুন মোড়। দুই বৃহৎ শক্তির জায়গায় বহু বৃহৎশক্তির আবির্ভাব হচ্ছে বলে চীনাদের ধারণা। আর নতুন ব্যবস্থায় চীনারাও বৃহৎশক্তির দাবিদার! কিন্তু শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার একটা সীমা আছে, এই সীমা অতিক্রম করলে সংঘর্ষের পরিস্থিতি অনিবার্য। রুশরা এই পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধ শেষ বলে যারা বেশি সোচ্চার ছিল তারা এখন নতুন ঠাণ্ডা যুদ্ধের বাতাবরণ তৈরিতে ব্যস্ত।

মতামত

ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র বনাম সংঘ পরিবার

এই সেদিন কলকাতায় যা দেখা গেল তার চরিত্র এ পর্যন্ত কেউ ঠিকমত উদ্‌ঘাটন করেছেন বলে আমার জানা নেই, কিন্তু একটা জিনিস সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়। নরঘাতী হিংসায় মানুষ মানুষকে ছেড়ে তার ঘরবাড়ির ওপর মশালহাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে না, রক্তলোলুপ হিংস্রতা রক্তেরই স্বাদ পেতে চায়। লোভ আর হিংসা, দুটোই খুব খারাপ, কিন্তু দুটো ঠিক এক জিনিস নয়।

হাজার চেষ্টা করেও সংঘ পরিবার ইসলামবিরোধী ধর্মযুদ্ধে হিন্দুদের সংঘবদ্ধ করতে পারবে, তার আশা কম। "ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র বনাম সংঘ পরিবার" প্রবন্ধে (চতুরঙ্গ, মার্চ ১৯৯৩) গৌরকিশোর ঘোষ তাদের উদ্দেশ্য এবং কর্মপন্থার বিবরণ ঠিকই দিয়েছেন, তারা কী "বোঝাতে চাইছে" সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গে দ্বিমতের অবকাশ বিশেষ নেই। কিন্তু "তারা আপাততঃ বুঝিয়ে দিয়েছে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র আত্মরক্ষায় অক্ষম, তাই ভারতীয় মুসলমানের এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জানমান ইজ্জৎ রক্ষা করার সামর্থ্য তার নেই", এই সিদ্ধান্তটা তাঁকে পুনর্বিবেচনা করতে অনুরোধ করি। আমাদের গণতন্ত্র যদিওবা তখনকার মত "ডাউন" হয়ে থাকে, "আউট" হয়নি। রুগ পুতুল "ভাংকা ভাশতাংকা" দেখেছেন কি? ঘুষি মারলে সে ধরাশায়ী হয় আবার পরমুহূর্তেই উঠে দাঁড়ায়। আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র অযোধ্যার সেই ইমারৎটি নয় যে "আর এক ধাক্কা"-তেই চিরতরে ধরাশায়ী হবে। "আপাততঃ" ওরা যাই বুঝিয়ে থাক, কিংবা বুঝিয়ে দিয়েছে মনে করে থাক, আমাদের সমাজ এমন একমুখী হয়ে গড়ে ওঠেনি (টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় যেমন দেখা যায়) যে কোনও এক ধর্মের নামে, কোনও এক মতবাদের নামে কেউ এর শুদ্ধিকরণ করবে। "সংঘপরিবারের হিন্দু-রাষ্ট্রস্থাপনের স্বপ্নে" যে দুর্বলতার কথা গৌরকিশোর বলেছেন, অর্থাৎ "জাতপাতের ভেদনীতি", আর কিছু না হোক, সেটাই দিনে দিনে মাটি কেটে নেবে তাদের পায়ের তলা থেকে। তা ছাড়া আরও নানা পরস্পর-বিরোধী স্বার্থ, মনোভাব, প্রবণতা, এবং সরাসরি সংঘাতশীল না হলেও, নানামুখী অজস্র সাংস্কৃতিক ধারা, শিক্ষা-দীক্ষা ঐতিহ্য ইত্যাদি (ভাষার কথা ছেড়েই দিলাম) ব্যাহত করতে থাকবে অর্ধেক ভারতবাসীকে বাকি অর্ধেকের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে নিয়োযিত করবার সব প্রচেষ্টা, ধর্মের নামে হিংস্রতার ঢেউ কখনও কোথাও যে উত্তাল হয়ে উঠবে না তা নয়, কিন্তু আমাদের এই জনসমুদ্রে বিভিন্নমুখী এত স্রোত বহমান যে তার ক্ষমতা হবে না গোটা দেশকে রসাতলে পাঠায়।

রাজনৈতিক স্বার্থ সব সময়েই সৃষ্টি করতে চাইবে একমুখী গণআবেগ, তা সে ধর্মের নামেই হোক আর অন্যকোনও গোষ্ঠী-আনুগত্য, গোষ্ঠী-স্বার্থের নামেই হোক। ঠিক সেই কারণেই, রাজনীতিকে খণ্ডিত এবং খর্ব করার জন্যে আমাদের দেশে এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন রাজনীতির বাইরে মানুষের মেলা-মেশা, আমোদ-প্রমোদ, সামাজিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্র প্রসারিত করে চলা। বহুবিচিত্র কর্মধারায় সমাজ যত কানায়-কানায় ভরে উঠবে তত কঠিন হবে মানুষকে হিংস্রতার, ধ্বংসের আহ্বানে ঐক্যবদ্ধ করা।

অন্যসব মতান্ধতার মত ধর্মান্ধতাও অতিশয় তৃপ্তিলাভ করে কোনও প্রতিপক্ষের ওপর হিংস্র আক্রমণ চালাতে পারলে, "এর ভিটে-মাটি উচ্ছেদ করো, তাকে খতম করো," এই তার মুখের বুলি, একে ত প্রতিরোধ করতেই হবে। কিন্তু সরাসরি জাতীয়তাবোধের বিরুদ্ধে, ধর্মীয় আনুগত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ফলে উল্টো-উৎপত্তির সম্ভাবনাই বেশি। জনমনে "কসমোপলিটান বা বিশ্বমানবিক চেতনার উন্মেষ" কবে ঘটবে বলা কঠিন। ততদিন যদি আমাদের এই সেকুলার গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে না পারা যায়, তবে, বলতেই হয় এর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এখনই যা করা দরকার তা হল, বিচিত্র কর্মাণ্ডের মধ্যে দিয়ে মানুষকে ছোটবড় নানাবিধ চরিতার্থতার সন্ধান দেওয়া।

"সেকুলার গণতন্ত্রবাদী শিবিরের বন্ধুগণ"-এর উদ্দেশে গৌরকিশোর রক্ত উদ্বেলকারী আহ্বান জানিয়েছেন, "আপনারা কি আত্মবলিদানে প্রস্তুত?" আত্মবলিদানের ওপর বেশি ভরসা না করাই ভাল। আত্মবলিদানের যে নমুনা আমরা কিছুদিন ধরে দেখছি, তাতে মনে হয়, এ নিয়ে একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেলে তাতে আমাদের সমূহ অমঙ্গল, কেননা আত্মবলিদান এখন হিংসা এবং হত্যাকাণ্ডের সঙ্গেই অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে।

বরং এখন চেষ্টা করা উচিত যাতে ধর্মীয় ভেদবুদ্ধির উর্ধে মানুষের স্বাভাবিক সামাজিক প্রবৃত্তি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তার স্বাভাবিক জীবনচর্যার মধ্যে। ইতি।

সনাতন মিত্র
৫৬ এফ, ব্লক ডি নিউ আলিপুর কলকাতা ৫৩

চির কোমল
চির শ্যামল

বোরোলীন

সুরভিত
অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড
কলকাতা—৭০০ ০৫৩

বোরোলীন প্রসাধন সামগ্রী নয়